ধর্মের ব্যবসা

কুম্ভমেলা থেকে কলকাতা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ দেব রঞ্জন বিশ্বাস

স্ক্যান ঃ সুমন বিশ্বাস

এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Detach yourself from living-room audio!

Now, you can have all those wild, wonderful outdoor flings you love . . . to the beat of your favourite music. Treat yourself to a complete stereo system—MW/SW Tuner/Stereo Tape Recorder, PC24 with separate micro speakers, all with the latest hi-tech features.

Have it your way

Position the speakers well apart, so you get true stereo separation, as well as full-blooded, dynamic sound—24 watts PMPO of pure hi-fi power.

Carry the action along

The speakers can be carried along by a locking arrangement and you get a system that simply refuses to be left behind at home.

The Stereoport

It's the shape of today's sound!

SONODYNE
STEREOPORT PC24

Fashionable • Arrangeable • Portable.

Dattaram-SE 53/84

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
ফটো : কুশল গঙ্গোপাধ্যায়

১২ পৃষ্ঠার [illegible] এবং ১৩ পৃষ্ঠার স্নানের ছবি তুলেছেন কুশল গঙ্গোপাধ্যায়।
[illegible] ছবিগুলো আর এন সাবিনের তোলা

ধর্মের ব্যবসা : কুম্ভমেলা থেকে কলকাতা
কুম্ভের মৃত্যু যেন প্রত্যাশিতই ছিল। কেবল সংখ্যাটি জানা ছিল না। শুধু কুম্ভেই নয়, গত কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা দেবদেবী, 'বাবা', 'মা'-দের ঘিরে জমে উঠেছে লাভজনক ধর্মের ব্যবসা। রাজনীতি ধর্মকে ব্যবহার করে। সরকার সুবিধে মতো ধর্মকে কাজে লাগায়। আর আমরা নিজেদের কুসংস্কারে এই অনৈতিক ক্ষতিকর ব্যবসায় মদত যোগাই। পৃ ১২
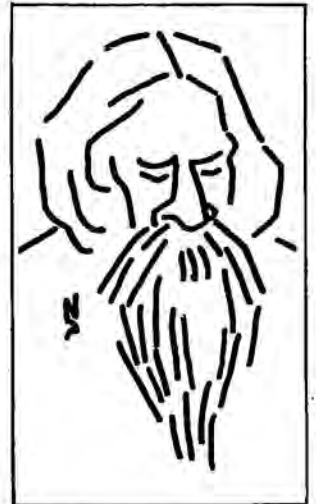
মদ্যপানে মৃত্যু বেড়েই চলেছে
গত কয়েকমাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে বিষাক্ত মদ পান করে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। এদের বেশিরভাগই দেশী মদ খেয়েই মারা গেছেন। রাজ্য জুড়ে বিষাক্ত মদের এই যে অভিযান, এর সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকটি চক্র। পৃ ২৫

রবীন্দ্র-ক্রোড়পত্র
রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫ বছর উপলক্ষে তাঁর কিছু ভাবনা, তাঁর ছবি ও গান, তাঁর চকিত মূল্যায়ন, কিংবা তাঁর জীবনের নানা টুকরো ঘটনা : সব মিলিয়ে নিবন্ধ ও টিপ্পনী, গম্ভীর ও হালকা রবীন্দ্র-কণিকার সমাবেশ এই ক্রোড়পত্রে। পৃ ৩৭

Sun Advertising

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible] সর্বভারতীয় পাক্ষিক
তৃতীয় বর্ষ একবিংশ সংখ্যা
২ মে ১৯৮৬

সম্পাদক
স্বপ্না দেব
সহযোগী সম্পাদক
মিলন দত্ত
কিন্নর রায়
শিল্প-নির্দেশক
পূর্ণেন্দু পত্রী
শিল্প-বিভাগ
সুব্রত চৌধুরী
সোমনাথ ঘোষ
ভক্তিময় লাহিড়ী
মার্কেটিং এ্যাডভাইসার
তারাশংকর রায়
বিজ্ঞাপন
সিদ্ধার্থ ঘোষ
শম্পা মুখার্জি
দিলীপ চক্রবর্তী
সারকুলেশান
দেবতোষ চৌধুরী
আশীষলাল সিং

প্রতিক্ষণ পার্বালকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত দেব কর্তৃক ৭ জওহরলাল নেহরু রোড়, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোন ২৩ ০৫৯০ থেকে প্রকাশিত ও হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কোম্পানি পি-২৫৩ সি· আই· টি স্কিম·৬-এম কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ তিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ।

দাম : তিন টাকা
বিমানে অতিরিক্ত ২৫ পয়সা

'আজকে মে-দিন, তোমার মাঠে যে বৈশাখী'

আমাদের ভাষার এক কবি মে-দিন এবং পঁচিশে বৈশাখের অনুষঙ্গকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক কবিতায়। আমাদেরও মনে হয়েছে এর চেয়ে অনিবার্য আর কী হতে পারে! মে দিনের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের বেদনা ও প্রতিবাদ মিশে আছে, শুধু একটি দেশে নয় একটি কালে নয়, দেশ ও কালের বেড়া ডিঙিয়ে, বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিকোণের স্থূল ও সূক্ষ্ম তফাৎকে তুচ্ছ করে। মে দিনের গান হয়ে উঠেছে দেশ-দেশান্তরের কর্মী মানুষের সংহতি ও প্রত্যয়ের উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথও তো স্বদেশের, শুধু স্বদেশের কেন, বিশ্বজগতের বেদনার্ত ও প্রতিবাদী মানসের মূর্ত প্রতীক। আমাদের সুখে ও দুঃখে, জীবনযাপনের লড়াইয়ে ও সংকটে তাঁকে আমরা আশ্রয় হিশেবে পাই। তিনি আমাদের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকেন সবসময়। তাই অন্তত বাঙালির কাছে পয়লা মে ও পঁচিশে বৈশাখ একই সুরে বাঁধা পড়ে যেতে চায় যেন।

এ বছর কথাটা আরো বেশি করে মনে এল। কারণ এ বছরই সেই পয়লা মে-র পুণ্য দিনটির একশ বছর পূর্তি। ঠিক একশ বছর আগে, ১৮৮৬-র পয়লা মে সারা আমেরিকায় আট ঘন্টা কাজের দাবিতে শুরু হয়েছিল ধর্মঘট। তারপরের নির্যাতনের, বিশ্বপ্লাবী প্রতিবাদের ও বিজয়ের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। আকস্মিক ব্যাপারও নয় তা ইতিহাসে, তারও পেছনে ছিল পারী কমিউনের, চার্টিস্ট আন্দোলনের, ইতিহাসের নানা পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ লড়াই। সে লড়াই সে বছরের পয়লা মে-তেও থেমে থাকে নি—পয়লা মে-র বাণী ছড়িয়ে গেছে প্রত্যেকটি দেশে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী প্রেরণায়, তার নানা রূপে ও রূপান্তরে। পয়লা মে তাই বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রাণে অক্ষয়। ১৮৮৮ সালে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার যখন প্রতি বছর পয়লা মে-কে শ্রমিক শ্রেণীর দাবির ও আত্মঘোষণার দিন বলে গ্রহণ করেছিল, তখন তারা কি জানত না সে-সিদ্ধান্ত শুধু আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে আটকে থাকবে না, সে দিনটি অচিরেই হয়ে উঠবে বিশ্বের প্রতিটি কোণে শ্রমজীবী মানুষের মিলনের ও শপথ গ্রহণের দিন? প্রথম পয়লা মে-র লড়াইয়ে যাঁরা ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছিলেন—সেই অ্যালবার্ট পার্সনস, জর্জ এঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিশার, অগাস্ট স্পাইজ—তাঁদের সাহসিকতার ও বীরত্বের কাহিনী আজ স্পন্দিত মানবসমাজের হৃদয়ে।

আর সেই সঙ্গে এবারই রবীন্দ্রজন্মের একশ পঁচিশ বছর। এক কবির কথা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম—তারও আগে আরেক আধুনিক কবি প্রশ্ন তুলেছিলেন 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ?' রবীন্দ্রনাথ কি শুধু পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপনেই নিঃশেষ? শুধুই স্মৃতি, শুধুই উপলক্ষ? প্রত্যেকটি বাঙালি বুকে হাত দিয়ে বলবে, না, তা নয়। এ অনুভব কোনো তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করার নয়। আমাদের দৈনন্দিনে, পারস্পরিক মৈত্রী ও অনুরাগে, লড়াই ও শপথ গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ নিত্যসঙ্গী। তাঁর সৃজনকর্ম, তাঁর ভাবনা, তাঁর কর্মোদ্যোগ, এককথায় গোটা রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে খনির মতো—আমরা যখনই প্রয়োজন তা থেকে সম্পদ আহরণ করে নিতে পারি। আমাদের সক্রিয়তারই তিনি বড় অবলম্বন, তা-ই শুধু নয়—যখন সেই উদ্যম অনেকটাই অবসিত বা দিগভ্রান্ত, যখন অসুস্থতা ও ক্ষয় আমাদের শারীরিক ও মানসিক অস্তিত্বকেও স্পর্শ করে, সহজ অভ্যাস বা নিরাপদ আত্মসংকোচনে আমরা নিজেদের বিড়ম্বিত করি, যখন মনে হয় রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্য ও চৈতন্যের রূপ আমাদের কাছে অবাস্তব হয়ে উঠছে, তখনও রবীন্দ্রনাথই আমাদের সহায়—তা থেকে উঠে আসার, আমাদের পরিবেশ ও সত্তার বিপরীতকে নিজের মানসে টিকিয়ে রাখার।

যেমন ধরা যাক এই কলকাতারই কথা। কোলাহলে, অশ্লীলতায়, কর্মহীনতায় দীর্ণ এই শহর। তবু কলকাতা তো রবীন্দ্রনাথেরই শহর। এখানেই তাঁর জন্ম, এখানেই তাঁর মৃত্যু। এখানেই তাঁর শৈশব ও যৌবনের দিনগুলি কেটেছে। পরে যখন তিনি শিলাইদহ বা শান্তিনিকেতনে থেকেছেন, তখনো বারবার ফিরে এসেছেন তাঁর এই জন্মের শহরে। তাঁরই গানের মন্ত্র গলায় নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তাল দিন। স্বদেশী চেতনার একেক উপলক্ষে কলকাতারই টাউন হলে, কিংবা হিজলি বন্দী হত্যার প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে তাঁর ভাষণ। কিন্তু আজকের কলকাতায়, এই দুঃখের কলকাতায়, মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কোথায় এবং কতটুকু বেঁচে আছেন? কলকাতারই একেক সময়ের রাগী ঝড়ো মেজাজে তার উত্তর পেয়ে যাই। তখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের নাটক, রবীন্দ্রনাথের গানই নিয়ে যায় স্বপ্ন ও শপথের অন্য জগতে? রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণ দিয়েই আমরা চিনে নিই আমাদের আজকের অভিজ্ঞতারও ছবি ও গান। রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত এই সমকালীনতায়, এই উত্তরাধিকারে। □
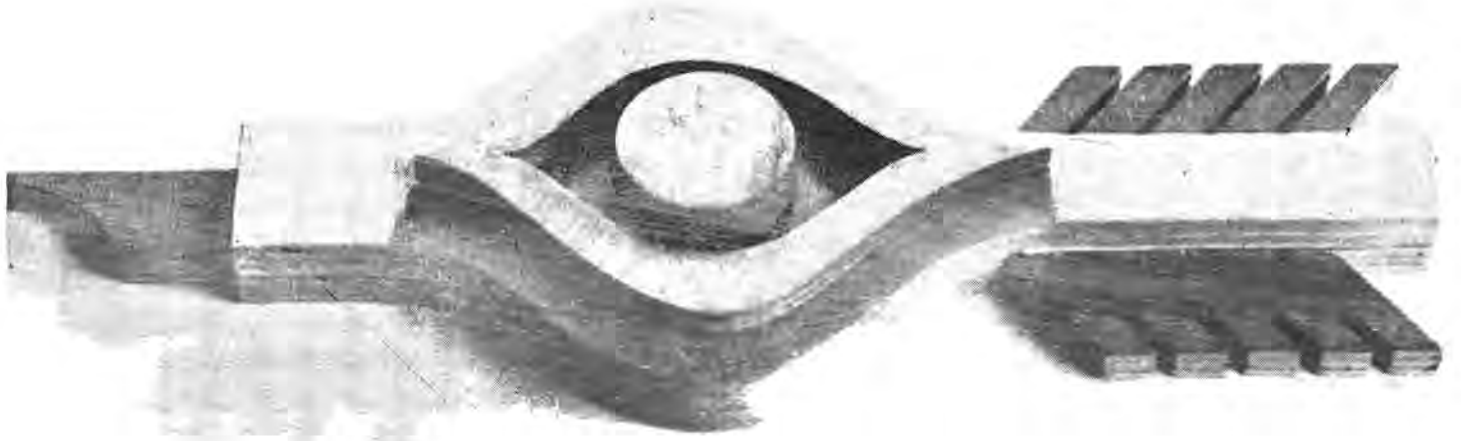
আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধের বই

দৃষ্টিকোণ ভবতোষ দত্ত

অর্থনীতির বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকের সেইসব প্রবন্ধের সংকলন, যাকে বলা যেতে পারে গত এক দশকের যাবতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যার বিশ্লেষণ। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হচ্ছে আরও কয়েকটি নতুন রচনা। ১৫ টাকা।

কবিতার দায় কবিতার মুক্তি অরুণ সেন

'নির্জনতম' বলায় আপত্তি জানিয়েছিলেন জীবনানন্দ নিজেই। এখন, নিজেরই রাজনীতির কবিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এইসব টানাপোড়েন নিয়েই বাংলা কবিতার আধুনিকতার যাত্রা। কবিতার দায় কার কাছে, কার কাছেই বা তার মুক্তি—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতার অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে জিজ্ঞাসু এক ভ্রমণ। ১৫ টাকা।

ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম শঙ্খ ঘোষ

প্রায় সতেরো বছর আগে আয়ওয়া শহরে পৃথিবীর নানা কোণ থেকে একদল তরুণ কবি আর ঔপন্যাসিক কিছুদিনের জন্যে মিলেছিলেন যেন এক পারিবারিক আবহাওয়ায়। প্রায় বছর জোড়া সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের নানা স্মৃতির টুকরো জুড়ে এই অ্যালবাম। অজস্র ছবিতে সাজানো। ফটো অফসেটে ছাপা। ৩০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ, না-রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

তিরিশের যুগ থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের ভিন্ন বিষয়ের রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিপক্ষে যত কথা। তার নির্বাচিত সংকলন। ১০ টাকা।

মোনালিসা পূর্ণেন্দু পত্রী

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির পিছনকার নানা কাহিনীর সঙ্গেই, এই ছবিকে কেন্দ্র করে নানা আলোড়িত ঘটনাও আলো ফেলেছে গবেষনাধর্মী এই বইটিতে। ছবিতে ফটো অফেসেটে ছাপা। ১০ টাকা।

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড

৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা—১৩

আমাদের সমস্ত বইয়ের পরিবেশক

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

বিবলিওম্যানিয়াক অর্থাৎ বইপাগল

শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'বিবলিওম্যানিয়াক অর্থাৎ বইপাগল' ('প্রতিক্ষণ', ২-১৬ ফেব্রুয়ারি) প্রবন্ধটি সুলিখিত ও তথ্যবহুল। কিন্তু প্রবন্ধটিতে কিছু তথ্যগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

গুপ্তমহাশয় লিখেছেন "...১৪৭৭ সনে বিলেতে ক্যাকস্টন ছাপা শুরু করার পর থেকে..." ইত্যাদি। কিন্তু আমরা পড়েছি, উইলিয়াম ক্যাকস্টন ১৪৭৩ সালের শেষ দিক থেকে ১৪৭৪ সালের বসন্ত কালের মধ্যে (সঠিক তারিখ জানা যায় না) তাঁর মুদ্রণযন্ত্র থেকে 'The Recuyel of the Histories of Troye' বইটি ছেপে বের করেন। সেটাই বিলেতের প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক।

গুপ্তমহাশয় লিখেছেন "১৪৫৬ সনে ইয়োহানিস গুটেনবার্গ জার্মানির মেনজ শহরে ছাপার উদ্ভাবন করার তিরিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে ইতালি ও অন্যান্য জায়গায় ছাপা শিল্প ছড়িয়ে পড়ে।" আসলে জোহান গুটেনবার্গ (সম্পূর্ণ নাম Johann Henne Zum Gensfleisch Zur Laden, called zu Gutenberg)-এর '৪২-সারি গুটেনবার্গ বাইবেল' ১৪৫৪ সালে জার্মানির মেনজ শহরে মুদ্রিত হয়। '42-line Gutenberg Bible' হল কারিগরি দিক থেকে অর্থাৎ যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত প্রাচীনতম সম্পূর্ণ বই। সঠিক তারিখযুক্ত প্রাচীনতম বই হল 'সল্টার' (Psalter)। এই বইটি ১৪৫৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে জোহানফস্ট এবং গুটেনবার্গ-এর মুখ্য সহকারী পেটার সোফার সম্পূর্ণ করেন।

প্রবন্ধকার লিখেছেন "...যে বই দিয়ে ইয়োহানিস গুটেনবার্গ ১৪৫৬ সনে পৃথিবীতে ছাপার পত্তন করেন তা হল গুটেনবার্গ বাইবেল। লোকে পৃথিবীর এই প্রথম ছাপা বই আজও ছাপার উৎকর্ষের একটি সর্বকালের সর্বোত্তম নজির হিশেবে স্বীকার করেন।"

ছাপা পদ্ধতি সর্বপ্রথম কে, কবে, কোথায় এবং কীভাবে আবিষ্কার করেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। ছাপাশিল্পের ক্রমবিকাশের কাহিনী অতি চমকপ্রদ। 'লা মিজারেবল' প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের রচয়িতা উগো-র ভাষায় ছাপাখানার জন্ম বিশ্বইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখনীয় বিপ্লব।

৯ম শতাব্দীতে কাঠের সাঁচ কেটে প্রতিলিপি উৎপাদন করা পদ্ধতির বহুল প্রচলন চীনদেশে হয় বলে জানা যায়। ছাপার কাজ বিশ্বে প্রথম চীনদেশেই শুরু হয়। অর্থাৎ ছাপা পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন হয় প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে নয়। বিশ্বের প্রথম ছাপা বই 'হীরক সূত্র'। এই বইটি ১৯০০ সালে মঙ্গোলিয়ার একটি বন্ধ-গুহায় পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ছাপার তারিখ ছিল ৮৬৮ খৃস্টাব্দের ১১ মে। বইটির লেখক ওয়াং চিচ (Wang Chich)। এটাকেই বিশ্বের প্রাচীনতম মুদ্রণের নিদর্শন হিশেবে গণ্য করা হয়। ১০৪১-৪৯ খৃস্টাব্দে পাই সেং (পী-চিং) নামক একজন চীনা কারিগর চীনামাটি পুড়িয়ে টাইপ তৈরি করা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৩শ শতাব্দীতে চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ধাতুদ্বারা তৈরি টাইপ ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই প্রকারের টাইপ সুদূর প্রাচ্যদেশে প্রচলিত বর্ণমালা ছাপা করার অনুপযোগী হওয়ার দরুন এই প্রকারের টাইপের প্রচলন কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার কয়েকশ বছর পর ইউরোপে প্রথম ছাপার কাজ শুরু হয়। তাস এবং ছবির বই প্রথম ছাপা হয়।

সুদূর প্রাচ্যে প্রচলিত ধাতুদ্বারা তৈরি টাইপ-এর বিষয় গুটেনবার্গ জানতেন কিনা তা বলা মুশকিল। কিন্তু আধুনিক ছাপার ক্ষেত্রে তিনিই পথপ্রদর্শক। তিনিই প্রথম আলাদা আলাদা অক্ষর (moveable type) সাজিয়ে ছাপার কাজ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অতএব, সন-তারিখের দিক থেকে পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই হল 'হীরক সূত্র', যার লেখক ওয়াং চিচ। তাছাড়া ১১৬০ সালে ধাতু টাইপ (metal type)-এ মুদ্রিত একটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইটি হল 'কোরিয়ান স্ক্রোল বা সূত্র' (Korean Scroll or Sutra)। কোরিয়ার ইউনসেই বিশ্ববিদ্যালয় (Yonsei University, Korea) ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে দাবি করেছে যে উক্ত ২৮ পৃষ্ঠার টাং রাজত্বের কবিতা বইটি মেটাল টাইপে মুদ্রিত। সুতরাং জোহান গুটেনবার্গ-এর

আপনার যাত্রা শুভ হোক

হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া প্রধান প্রধান ট্রেনের সময় তালিকা

ট্রেনের নাম		ছাড়িবার সময়	প্লাটফর্ম নং
১৭৩ আপ	হিমগিরি এক্সপ্রেস	২৩-০০	৮
৫৭ আপ	কাঞ্চন জঙ্ঘা এক্সপ্রেস (রবিবার ব্যতিত)	৬-০০	৯
৩০৭ আপ	ব্লাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেস	৬-১০	৮
১১ আপ	ইস্পাত এক্সপ্রেস	৬-১৫	১২
৮১ আপ	ত্রি-সাপ্তাহিক এয়ার-কণ্ডিঃ এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ ও শনি)	৯-১৫	৯
১০৩ আপ	দ্বি-সাপ্তাহিক এয়ার-কণ্ডিঃ এক্সপ্রেস (রবি ও বৃহস্পতি)	৯-১৫	৯
৭ আপ	তুফান এক্সপ্রেস	৯-৪৫	১০
৪৫ আপ	ইষ্ট-কোষ্ট এক্সপ্রেস	১৩-০০	১১
৬৭ আপ	বোম্বে-জনতা এক্সপ্রেস	১০-৫৫	১০
১৬৫ আপ	নিউ বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেস	১২-৩০	৯
৩০ আপ	বোম্বে এক্সপ্রেস (ভায়া নাগপুর)	১১-৫০	১০
৯০১ আপ	ত্রিবান্দ্রম-গৌহাটি—সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (কেবলমাত্র শনিবার)	১৪-০৫	১০
৬০ আপ	গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস (বৃহঃ ব্যতিত)	১৩-৫০	১১
৪৯ আপ	অমৃতশর এক্সপ্রেস	১৩-০৫	৯
১৪১ আপ	করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১৬-০০	১২
২১ আপ	মিথিলা এক্সপ্রেস	১৬-৫	৮
১০১ আপ	রাজধানী এক্সপ্রেস (রবি, সোম, বৃহঃ, শুক্র)	১৬-৩৫	৯
৩০৯ আপ	কোলফিল্ড এক্সপ্রেস	১৭-১৫	৮
১৩ আপ	ষ্টিল এক্সপ্রেস	১৭-৩০	১২
৩০৫ আপ	আসানসোল এক্সপ্রেস	১৮-২৫	৯
৯ আপ	পুরী-জগন্নাথ এক্সপ্রেস	১৮-৪৫	১০
৫৯ আপ	কামরূপ এক্সপ্রেস (ভায়া ফরাক্কা)	১৭-৫৫	৮
৩ আপ	মাদ্রাজ মেল	২০-০০	১০
৫ আপ	অমৃতশর মেল	১৯-২০	৮
৩ আপ	বোম্বে মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	২০-১৫	৯
৭ আপ	পুরী এক্সপ্রেস	২২-৪৫	১২
১ আপ	দিল্লি-কালকা মেল	১৯-১০	৯
২ আপ	বোম্বে মেল (ভায়া নাগপুর)	১৯-৪৫	১২
১১ আপ	দিল্লি এক্সপ্রেস	২০-৫০	৮
৩৯ আপ	দিল্লি-জনতা এক্সপ্রেস	২১-৩৫	৯
১৩৪ আপ	আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	২০-১৫	১৪
৯ আপ	দুন এক্সপ্রেস	২১-১০	১০
৩১৭ আপ	পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১৬-২৫	১১
৬১ আপ	দেরাদুন-জনতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (কেবলমাত্র রবিবার)	২৩-০০	৯
৩৭ আপ	মাদ্রাজ-জনতা এক্সপ্রেস	২৩-১০	১৪
৩৩৫ আপ	বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	১৬-২৮	৭

স্বগৃহে বা প্রবাসে যেখানেই থাকুন
'ওভারল্যাণ্ড'-কে সাথী করুন

ওভারল্যাণ্ড

ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

রেজিঃ ও হেড অফিস : ১এ/১এ, গুরুচরণ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪
রিজিওন্যাল অফিস : ৪৯, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
॥ আমাদের বিনিয়োগ কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও সরকারী সংস্থায় ॥
CAC

❝দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?❞

❝কেন রে ছোটন কি করেছে ?❞

❝দেখ না ! লক্ষ্মী ছেলের মত খাচ্ছে না।❞

❝পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।❞

❝কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না— আর কালকে বেরোবে কি করে ?❞

❝তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি ? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও !❞

❝জানি ! রবিনসনস্ বার্লি।❞

❝ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসনস্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসনস্ বার্লি খেতে বলেন।❞

❝আচ্ছা দিদা...❞

❝আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি ?❞

❝বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসনস্ বার্লি।❞

রবিনসনস্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

LINTAS:C. ROB 4 416 BC

'৪২ সারি গুটেনবার্গ বাইবেল' হল [illegible] দিক থেকে অর্থাৎ যন্ত্রদ্বারা [illegible] বই [illegible] গুপ্ত মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ (জন্ম ২০ জুলাই ১৮৯৮ মৃত্যু ৭ জুন ১৯৮২) নামটি সংযোজন করতে চাই। অধ্যাপক সন্ধিকৈ-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০, যার মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য রুশ ক্লাসিক থেকে হিব্রু সাহিত্য। উক্ত বইয়ের আর্থিক মূল্য ৩ লাখ টাকার অধিক। তিনি মৃত্যুর পূর্বে উক্ত বইসমূহ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি উক্ত গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৪ সালে ২০ জুলাই তারিখে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নাম 'কে কে সন্ধিকৈ গ্রন্থাগার' নামকরণ করা হয়। তিনি সংস্কৃত-এ সম্মানসহ বি-এ- পাশ করে সংস্কৃত-র বৈদিক গ্রুপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ- পাশ করেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোনো ভারতীয় ছাত্র সংস্কৃত-র বৈদিক গ্রুপে এম-এ- অধ্যয়ন করেন নি। অতঃপর পি-এইচ-ডি- করার জন্য ইংল্যান্ডে যান। অবশেষে আধুনিক ইতিহাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম-এ- পাশ করেন। তিনি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, ল্যাটিন, রুশ প্রভৃতি ভাষায় অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ১১/১২টি বিদেশী ভাষা জানতেন। তিনি যথাক্রমে জোড়হাটের জে-বি- মহাবিদ্যালয় এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৮-১৯৫৭)-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও উপাচার্য ছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো অসমীয়া 'উপাচার্য' হন নি। অধ্যাপক সন্ধিকৈ ছিলেন 'ভোরেসাস রিডার'। অধ্যয়নই ছিল তাঁর মানসিক খাদ্য। সময়নিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, অমায়িক এবং প্রকৃত সাত্ত্বিক ঋষি। এই জ্ঞান তপস্বীর হাতে গড়া গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছে বলে আমি গর্বিত।

সমীরকুমার সূত্রধর
নিউ কলোনি, বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া
আসাম

জীবন দলুই

'প্রতিক্ষণ' ১৭ মার্চ-১ এপ্রিল সংখ্যার ৮৬ পৃষ্ঠার প্রকাশিত জীবন দলুই পরিচিতি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন মনে করছি।

'পরিব্রাজক মণ্ডলী' (গ্রাম ও শহরের শিক্ষা ও সৃজনী শক্তির ভাব আদান প্রদান পরিষদ) থেকে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে ভুবনডাঙ্গার জনমজুর জীবন দলুই-এর পোড়ামাটির ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে জীবন দলুইয়ের নিজের বলা কথা (পূর্ণিমা সিংহ সংকলিত) একটি পুস্তিকা আকারে পরিব্রাজক মণ্ডলী থেকে প্রকাশিত হয় এবং তার পরবর্তী আরও কথা 'জীবন দলুইয়ের পরিবেশ' নামে পূর্ণিমা সিংহর প্রবন্ধ 'বারোমাস' শারদীয় ৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরিব্রাজক মণ্ডলীতে আমরা, জীবন এবং গ্রাম ও শহরের আরও অনেকে সভ্য আছেন। সকলেই সাধ্যমতো অর্থ ও শ্রমদান করে জীবনের প্রথম প্রদর্শনী সম্ভব করেছিলেন যৌথ প্রচেষ্টায়। কলকাতার বিদগ্ধ ও সাধারণ মানুষ অনেকে প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন এবং নানা পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজারের পার্থ বসু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে বিশদ বিবরণ লিখেছিলেন। 'প্রতিক্ষণ' অন্যতম পত্রিকা যাতে অনেক ছবিসহ বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ সজাগ রেখে 'প্রতিক্ষণ' আবার তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দু-একটি কথায় জনসাধারণের কিছু ভুল বোঝার অবকাশ আছে বলে মনে করি তাই নিম্নলিখিত সংযোজন প্রয়োজন।

১) প্রথম প্রদর্শনীর সময় সিগাল প্রকাশনের শ্রীনবীন কিশোর ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়ে অনেক ভাস্কর্য ক্রয় করেন, ছবি তোলেন। তারপর পূর্ণিমা সিংহ-র বাংলায় সংকলিত ও সম্পাদিত পরিব্রাজক মণ্ডলীর চারজন গ্রামীণ কুম্ভকার ও জীবন দলুই-এর আত্মকথা ইংরিজি অনুবাদ করে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং আগামী ১ মে থেকে ৯ মে পর্যন্ত পরিব্রাজক মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। জীবনের ভাস্কর্য পোড়াবার, প্যাক করে কলকাতায় আনার, জীবনের কলকাতায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রদর্শনীর আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার সিগাল বহন করছেন।

২) জীবন আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করার সময় নিজের মনের তাগিদে ভাস্কর্য শুরু করে। সে সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত। এখনও নিজের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে অনুপ্রেরণার উপাদান সংগ্রহ করে মাটি মেখে তার ভেতর থেকে গঠন দেখতে পেয়ে মূর্তি গড়ে। জীবনের ভাষায় "মাটিই আমাকে শিখিয়েছে মূর্তি গড়তে।" পরিব্রাজক মণ্ডলীর সভ্য কুম্ভকার শ্রীরামেশ্বর দয়াল প্রজাপতির নির্দেশে জীবন চুল্লি

॥ কবি প্রণাম ॥

অমল হোম সম্পাদিত দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-
বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যার পুনঃপ্রকাশ

কবির জীবনের অবিস্মরণীয় মুহূর্তের তিন শতাধিক চিত্র ও
বিদগ্ধজনের রচনা সমৃদ্ধ অফসেটে ছাপা সুন্দর জ্যাকেটসহ
এক দুর্লভ সংস্করণ

প্রচ্ছদ / পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম ৩৫ টাকা

৯মে ১৯৮৬ টাউন হলে আনুষ্ঠানিক পুনঃপ্রকাশ করবেন
মেয়র, কমলকুমার বসু

বিশেষ সুযোগ ॥ ৮মে ১৯৮৬ তারিখের মধ্যে নিজে বা ডাকযোগে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে মাত্র ত্রিশ টাকা জমা দিলে যে মাসের মাঝামাঝি বইটি পাওয়া যাবে(ডাকমাশুল অতিরিক্ত)।

দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
১-বগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল)
কলিকাতা-৭০০০১৩

ARYADAYA/CMC/1/86

Only through fresh ideas can an old business be constantly renewed

The multifaceted Caparo Group, known for its involvement in industry and trade, has now planted its roots firmly in the agricultural sector.

Our tea estates, situated in the middle of Assam's rich quality tea belt, cover approximately 10,000 hectares and produce about 18 million kgs of tea annually. And we're extending new areas under best quality clones, fertilising through fresh ideas, a traditional business.

Assam Frontier Tea Limited
Empire Plantations (India) Limited
Singlo (India) Tea Company Limited

Apeejay House, 15 Park Street, Calcutta 70[illegible]

তৈরি করতে ও প্লেক্স পটারি করতে শিখেছে। আমরা জীবনের সৃজনী প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়েছি এবং তাকে উৎসাহিত করেছি কিন্তু শিক্ষা দিই নি।

৩) জীবন চাষের কাজ ও অন্যান্য নানারকম জনমজুরি করে, কঠিন কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে শত দারিদ্রতেও নিজেকে স্বনির্ভর মনে করে। সে দারিদ্রের জন্য কারো সাহায্যপ্রার্থী নয়। পরিব্রাজক মণ্ডলীর সভ্য দীপ্তিত সিংহ, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, ওঙ্কার প্রসাদ, অসীম অধিকারী, পূর্ণিমা ও সুরজিৎ সিংহ সাধ্যমতো অর্থ জড়ো করে জীবনকে মাটির কাজের জন্য কিছুটা অবসর দেবার কথা ভেবে সামান্য মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। অসুস্থতা বা কোনো আকস্মিক বিপদ-আপদেও আমরা কিছু দেবার চেষ্টা করি। অন্যান্য কয়েকজনও এইসব কারণে নিজের তাগিদে অর্থ দেন। জীবন যে কোনো কাজ করে, পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে প্রস্তুত। কিছুদিন হল অন্যান্য কাজের ফাঁকে উত্তরায়ণের প্রবেশদ্বারে দর্শকদের উত্তরায়ণ বিষয়ক একটি পুস্তিকা বিক্রি করে জীবনের দৈনিক ভিত্তিতে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায়।

৪) জীবন ছেলেবেলায় ভুবনডাঙ্গায় বাবা মার সঙ্গে থাকত। বিয়ের পর রেল লাইনের ধারে ঘর বানিয়ে কিছুকাল থেকে, পরে শ্বশুরবাড়ি আদিত্যপুরে থেকে এখন পারুলডাঙা মোড়ে নিজের মত মাটির ঘর বানিয়ে থাকে। আঁকুড়ে কোনো জায়গা নয়। আঁকুড়ে ডোমদের একটি শ্রেণী। জীবন জাতে আঁকুড়ে ডোম।

পূর্ণিমা সিংহ
সুরজিৎ সিংহ
কলকাতা-২৯

বিহারে মাথার খুলির ব্যবসা

১৭ই মার্চ 'প্রতিক্ষণে' প্রকাশিত 'বিহারে মাথার খুলির ব্যবসা' মনকে নাড়া দেয়। অত্যন্ত অমানবিক জঘন্য চাঞ্চল্যকর একটি লেখা ছাপা হয়েছে। বর্তমান সভ্য জগতে এখনও এ জাতীয় ব্যবসা অব্যাহত আছে ভাবতে অবাক লাগে। দেশের মধ্যে এখনও এ ধরনের চক্রান্ত বিরাজ করছে চিন্তা করতে ভয় পাই। সবচেয়ে খারাপ লাগছে কোনো বিদেশীর চোখে ছবিসহ এই লেখাটি পড়লে, ভারত সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা আসবে! ফটোগ্রাফার অমরেন্দ্র দুবের কি ছবিগুলো তুলতে কোনো রকম কষ্ট হয় নি? এ ধরনের দৃশ্য ক্যামেরাতে ধরে রাখা কি প্রকৃত মানবিক কাজ? এই ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। আর সেই সঙ্গে উক্ত ডোম, যে বাচ্চা ছেলেগুলোর ধড় থেকে মাথা আলাদা করতো তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার অনুরোধ করছি। সবচেয়ে কষ্ট লাগে মাথা কাটা ধড় এবং শুধু মাথাগুলি একসঙ্গে সাজানো অবস্থায় ছবিটি ঐ বাচ্চাদের পরিবারের কোনো লোক দেখলে কি রকম অবস্থা হবে? চিন্তা করতে গা শিউরে উঠে। সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ রাখছি।

জামিলা বুলান্দ আখতারি
সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ,
বীরভূম

দুই

'বিহারে মাথার খুলির ব্যবসা' শীর্ষক প্রতিবেদনে (প্রতিক্ষণ, ১৭ই মার্চ) সুস্থ মানুষের বিচলিত হওয়ার যথেষ্ট উপকরণ আছে। এধরনের ব্যবসার বিরুদ্ধে সরকার বা কোনো রাজনৈতিক দল নিশ্চুপ, গণচেতনাও যথেষ্ট জাগরূক নয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব কিছুটা পালনের চেষ্টা করেছেন। তবে এক জায়গায় প্রতিবেদক জানিয়েছেন কোনো বন্যা বা মহামারির দৃশ্যে ফটোগ্রাফারদের তাদের পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটাই একমাত্র কাজ। ওই প্রতিবেদনে এই প্রসঙ্গ অবান্তর। নিজ নিজ পেশার প্রতি অবহেলা না করেও আর্তদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এমন সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফার তো অপ্রতুল নন। মনে পড়ে, বছর দুয়েক আগে কলকাতার এক সাংবাদিক পুলিশের আক্রমণ থেকে এক যুবককে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। শিশুহত্যার মতো জঘন্য কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ (যেখানে প্রতিপক্ষ প্রবলতর নয়) সবার কাছেই কাম্য। মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই আচরণ প্রত্যাশিত। মানবিক বোধহীন সাংবাদিকতা ও ফটোগ্রাফি কে চায়?

অনিন্দ্য সেন
কলকাতা ১৭

বিবাহ বিচ্ছেদ বিল

১৭ মার্চ-১ এপ্রিল সংখ্যা প্রতিক্ষণ-এ 'বিবাহ বিচ্ছেদ বিল/মুসলমান সমাজ আলোড়িত' শীর্ষক প্রচ্ছদ কথায় এক গুচ্ছ সময়োপযোগী বলিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য প্রগতিকামী সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে অজস্র আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর জানাই: মুসলিম সমাজের আলোড়ন আজ সংগত কারণেই ছড়িয়ে পড়েছে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজেই। এ আলোড়ন একদিকে আশঙ্কার অন্যদিকে আশ্বাসের। আশঙ্কার হল, বিলের সমর্থক উগ্রধর্মান্ধ মুসলমানদের। জয় অন্য সম্প্রদায়ের উগ্র ধর্মান্ধদের প্ররোচিত করবে—উদ্দীপ্ত করবে। তারাও অনেক মধ্যযুগীয় জঞ্জালে প্রথার পুনরুজ্জীবন চাইবে। আইনগত স্বীকৃতির দাবি তুলে আন্দোলন পাকাবে। ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে না-পারা উগ্র হিন্দুবাদীরাও পিছিয়ে থাকবে না। তারা চাইবে হিন্দুরাষ্ট্র কায়েম করতে (ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তৎপরতা লক্ষ করাও যাচ্ছে।) রাজীবজীর মতো সহজ সরল কর্ণধারের পক্ষে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি দেখিয়ে হিন্দুবাদীদের আপ্যায়ন করাও অসম্ভব নয় (আসাম প্রশ্নে, শরিয়ত প্রশ্নে নিছক সংকীর্ণ ভোটের স্বার্থে তার পিছু হটা থেকে আমাদের এই ধারণাই হচ্ছে। অবশ্য গভীরতর ষড়যন্ত্রমূলক অন্য কারণও থাকতে পারে!)। অর্থাৎ আপেক্ষিক অর্থে যে ধর্মনিরপেক্ষতাটুকু রয়েছে সেটাও আজ ধর্ষিত হতে চলেছে।

আর আশ্বাসের দিক হল, মানবিক অধিকার খর্বকারী জঘন্য বিলটির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ সক্রিয় হচ্ছেন, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। দেশব্যাপী ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সারা দেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রতিষ্ঠার দাবি আদায়ের উপযুক্ত সময় এটা। এই আন্দোলনের আরও অনেক সম্ভাবনার দিক আছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল, মুসলিম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত এই সমাজে সামগ্রিকভাবে নারী অধিকার-নারীপ্রগতি-নারীমুক্তির পথ সুগম হবে।

চন্দ্রপ্রকাশ সরকার
বহড়ান, নিশ্চিন্তপুর
মুর্শিদাবাদ

দুই

'প্রতিক্ষণ'-এর ২ মার্চ-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও ১৭ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবাহ বিচ্ছেদ বিল: আলোড়িত মুসলমান সমাজ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়লাম। ২ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত মুসলিম নারী বিল সম্পর্কে 'আত্মসমর্পণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি সময়োপযোগী ও প্রশংসাযোগ্য।

শাহবানু মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে রায়ের সপক্ষে-বিপক্ষে প্রচণ্ড বিতর্কের অবসানকল্পে ও প্রগতি বিরোধী ধর্মান্ধদের চাপে পড়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী সংসদে বিবাহ বিচ্ছেদ বিল পেশ করায় স্বভাবতই মুসলিম মহিলা বিরোধী এই বিলের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআরিফ মহম্মদ খান-এর পদত্যাগ সত্যিই প্রগতিবাদী, গণতন্ত্রসম্মত ও মানবতাবাদী মনোভাবের পরিচয় ও তার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় শাসকদল কংগ্রেসসহ দু-একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিলটির উপকারিতার জয়গান গেয়ে জনমত আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে এবং বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেমন দানা বাঁধছে বিলটির উত্থাপনে তেমনি কট্টর শরিয়তপন্থীদের উল্লাস মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সবসময়ই ছিল অবহেলিত, নিষ্পেশিত ও নির্যাতিত। রাজীব গান্ধীর এই মুসলিম নারী বিল নারীদের বিশেষ করে মুসলিম নারীদের সমানাধিকার ও স্বাধীনতার আশার আলো দেখানো তো দূরের কথা তাঁদেরকে আরো অবহেলাও নির্যাতনের গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে। তা শ্রীআরিফ মহম্মদ খান-এর স্ত্রী শ্রীমতী সৈয়দা রেশমার কথায়: "....Talaq has now become a much easier job. There will be more divorces, more deprevition of Muslim women and more destitutes."

কানুলাল সরকার
তেজপুর, আসাম

রবীন্দ্রসংগীতের সমালোচনা

আপনার কাগজের ২-১৬ এপ্রিল সংখ্যায় আমার বইটির 'রিভিউ' প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সমালোচককেও ধন্যবাদ, যদিও তাঁর মতামতের সঙ্গে সর্বত্র একমত হওয়া গেল না বলে দুঃখিত। কিন্তু আমার গভীর পরিতাপ সমালোচকের একটি বিশেষ বাক্যের জন্য। তিনি লিখছেন "লেখক ১১৮ পৃষ্ঠাতে 'কোথা যে উধাও'-কে ধ্রুপদাঙ্গ এবং ১২৮ পৃষ্ঠাতে তাকে খেয়ালাঙ্গ বলেছেন। মনে হয় দ্বিতীয় বিচারটিই ঠিক।" কিন্তু ১১৮ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে তা হলো: "অন্যান্য কিছু খেয়াল ও টপ্পারীতির গান, এমন কি কিছু ধ্রুপদাঙ্গ গানও যেমন যথাক্রমে—

১. কোথা যে উধাও
২. এ পরবাসে রবে কে হায়
৩. জয় তব বিচিত্র আনন্দ"...

যথাক্রমের অর্থ নিশ্চয়ই প্রথমটি খেয়াল, দ্বিতীয়টি টপ্পা, তৃতীয়টি ধ্রুপদ। এর ভিতর ভুল কোথায়, স্ববিরোধই বা কোথায়? সমালোচক কি খুব সতর্ক মন্তব্য করেছেন?

অনন্তকুমার চক্রবর্তী
নৈহাটি, ২৪ পরগণা
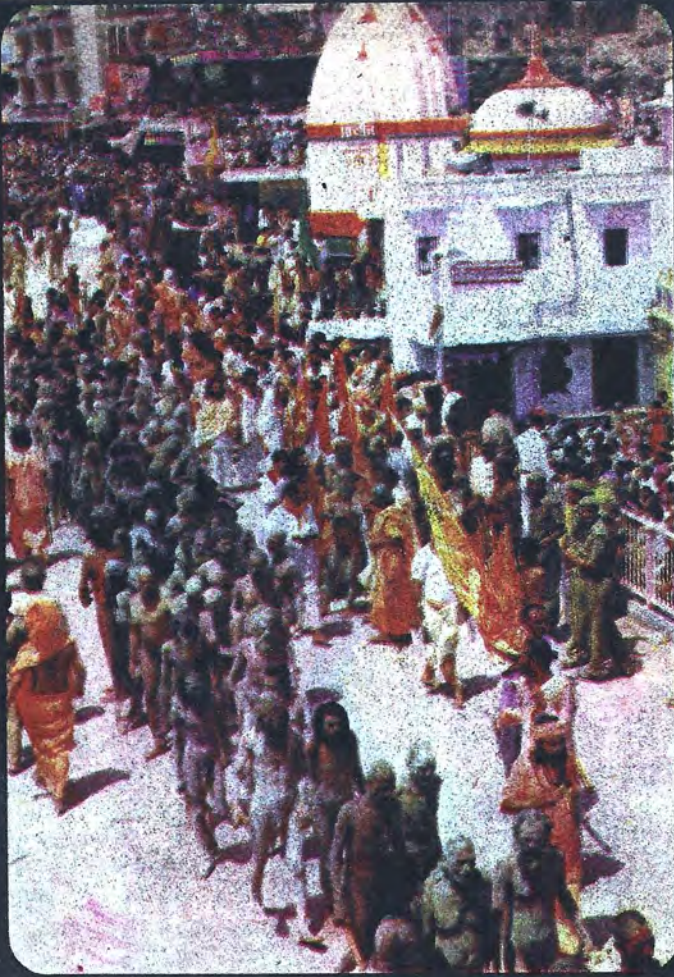
এই নগ্নতা কেবল মেলা স্পেশাল । এঁরা জামাকাপড় পরেন, টু-ইন-ওয়ান শোনেন (ওপরে বাঁপাশের ছবি) ॥ রথ সবাই ছুঁতে পারে না. তার জন্য প্রচুর টাকা দিতে হয় (ওপরে ডানদিকের ছবি) ॥ কিছু লোক চিরকাল বোকা বনে থাকবে ধর্মের সম্মোহনে (নীচের ছবি) ॥ ধর্মভীরু মানুষের অর্থহীন. অযৌক্তিক স্নান (ডানপাতার ওপরে) ॥ নতুন গজিয়ে-ওঠা সুদর্শনী ম্যাক্সি-পরা 'মা' (ডানপাতারর নীচে) ॥

ধর্মের ব্যবসা কলকাতা থেকে কুম্ভমেলা

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন ৫০ জন মানুষ। এই ধরনের ধর্মান্ধ-অনুষ্ঠানের প্রচারে যথেষ্ট সরব এবং সজাগ ছিল আকাশবাণী, রেডিও, কাগজ। এই মৃত্যুর বিবরণও রঙিন এবং সাদাকালো প্রদর্শনী হিশেবে আমাদের সামনে এসেছে। শুধু কুম্ভই নয়, এরকম কার্যকারণহীন ধর্ম-আতুরতায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিপন্ন এক জনসমষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাঁচার ও বেঁচে থাকার এক অনির্দিষ্ট তাড়নায়। এই নিয়তি-নির্ভরতা থেকেই গড়ে উঠেছে জ্যোতিষ-ব্যবসা, গ্রহরত্নের ফলাও কারবার, বাবা-মা-দের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। দৈনিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিকের পাতায় ঢালাও ব্যবসা জমায় এই সপ্তাহ, এই মাস, আজকের এবং আগামীকালের জন্যে ভবিষ্যদ্বাণী। ধর্মের এই ঢালাও দেশজোড়া ব্যবসা, তার শিকড় অন্বেষণে আমাদের প্রতিনিধি **বিশ্বদেব ভট্টাচার্য** এবং **অরুণোদয় ভট্টাচার্য** কুম্ভ মেলা থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট তৈরি করেছেন। বাকি লেখাগুলি **অন্বয় রায়** এবং **সিদ্ধার্থ রায়ের**।

যেন জানাই ছিল, সংখ্যাটিই শুধু জানা ছিল না। কাগজে-টিভিতে-রেডিওতে যে-ভাবে কুম্ভমেলার ঢাক পেটানো হচ্ছিল—তাতে যে মাত্র ৫০ জনের মৃত্যুর ওপর দিয়েই এ মেলা শেষ হবে তা মনে হয় নি। ৫০ যদি, ৫০০ হত, ৫০০০ হত—তা হলেও আমরা একই প্রত্যাশিত শোকে স্তব্ধ হয়ে থাকতাম, নিরুপায় মৃত্যুর সামনে মূক হয়ে থাকতাম।

কিন্তু কুম্ভই ত শুধু নয়। গত কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা রকম দেবদেবী ও তাঁদের ঘিরে নানা রকম মেলার প্রসার বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো মেলা হয়ত বেশ প্রাচীন। কিন্তু সেই সব মন্দিরের চত্বর বা শহরের পক্ষে জনসংখ্যার আকস্মিক বিস্ফোরণ সামলানো সম্ভব নয়।

এরই সঙ্গে আছে তিরুপতির মত প্রাচীন ধর্মীয় শহরে সারা বছর ধরে চলা মেলা বা পুত্তাপুত্তির মত একজন মোহান্তকেন্দ্রিক শহরের মেলা।

একে কী বলব ? ধর্মোন্মাদনা এ নয়, ধর্মমত্ততাও নয়। এ ত এক ধর্ম-আতুরতা। কার্যকারণহীন এক আচ্ছন্নতায়, বিপন্ন এক জনসমষ্টি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাঁচার ও বেঁচে থাকার এক অনির্দিষ্ট তাড়নায় যা কার্যত হয়ে দাঁড়াচ্ছে মৃত্যুরই পেছনে ছোটা।

মানুষের ভিতর এই নিয়তিনির্ভরতা গড়ে তোলায় একদিকে জ্যোতিষ ব্যবসা, আর একদিকে গ্রহরত্নের ব্যবসা জমজমাট। কলকাতা বোধহয় এদিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র। তার সঙ্গে মাস্তানদের বারোয়ারি পুজো, আন্তর্জাতিক সীমান্তে চোরাই চালানকারীদের পুজো। দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক কাগজে ইংরেজিতে বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য ভাষায় প্রতিদিন বেরয়—এই সপ্তাহ, এই মাস, আগামীকালের জ্যোতিষসম্মত ভবিষ্যৎবাণী। প্রেস কাউন্সিল এই বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাব প্রচারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। আমাদের এই সংখ্যার প্রধান রচনায় কুম্ভমেলার দুর্ঘটনার সূত্রে—ধর্ম ব্যবসার এই আধুনিক নানা সংস্করণের বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হল।

ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ধর্মের জিগির তুলে কোটি টাকার অপচয়ে ধর্মের বাজার বসে, কখনও তারকেশ্বরে, কখনও অযোধ্যায়, কখনও সবরীমালা হিলসে, কখনও গঙ্গাসাগরে, কখনও কুম্ভমেলায়। অমুক ব্রাহ্মমুহূর্তে পূর্ণকুম্ভে স্নান করলে সারা জীবনের পাপস্খালন, তমুক ত্র্যহস্পর্শে গঙ্গাসাগরে ডুব দিলে পাপস্খালন, অমুক তিথিতে কাঁধে জল বয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হেঁটে গেলে ইচ্ছাপূরণ, এমন আজগুবি অন্ধ, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস থেকে আজ ভারতবর্ষের এমাথা ওমাথা জুড়ে ধর্মের যে বিপুল লাভজনক ব্যবসা ছড়ানো, তাতে সরকারি টাকার অপচয় তো আছেই, কালো টাকা ঢালবার প্রশস্ত চ্যানেল তৈরি হয়েছে, মানুষের কষ্টার্জিত উপার্জন বিপথে যাচ্ছে, রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়ছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়ছে, মানুষ অকারণ মরছে।

যেমন কুম্ভমেলাই ধরা যাক—ধর্মের এটাই শেষতম বাজার। বারো বছর বাদে এবার পূর্ণকুম্ভ ছিল। পরলোকে বিশ্বাসী, ধর্মভীরু ভারতীয়দের পাপস্খালনের ব্যাকুলতা খুব বেশি। আর পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য যদি গঙ্গার মতো এমন ২,৫৬০ কিমি দীর্ঘ তরল ডিটারজেন্ট রেডি থাকে, তাহলে একটু ডুব দিতে ক্ষতি কী দরকার শুধু শাস্ত্রের উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ উদ্ধৃত করে পণ্ডিতরা বলে দেন, কুম্ভে স্নান করলে সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। এক হাজার কার্তিক স্নান, একশো মাঘী স্নানের পুণ্য নাকি এক কুম্ভস্নানেই মেলে। এক হাজার অশ্বমেধযজ্ঞ, একশো বাজপাখি বধ করলে যে ফল হয়, এক কুম্ভ স্নানেই সেই ফল।

ব্যাস, সরলমনা ভারতীয় জনসাধারণের কিছু অংশ, অর্থাৎ আমরাই, এমন লোভনীয় টোপ গিলি। আর এক এক টানে সোজা হরিদ্বারে গিয়ে খাবি খাওয়া। যত বেশি লোক, ব্যবসার তত বোল বোলাও ; যত লোক, তত টাকা, তত দুর্নীতি, তত মৃত্যু।

কুম্ভমেলায় যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে, ১৪ এপ্রিল, সেদিন ওখানে মোটামুটি লাখ চল্লিশ লোক ছিল। ভারতের ৭০ কোটি জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমাবেশ ·৫৭ শতাংশও নয়। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ মানুষ হরিদ্বারের মতো ঐরকম ছোট জায়গায় কম কিছু না। এরই মধ্যে ভারতের তিনজন কংগ্রেস(ই) মুখ্যমন্ত্রী—বিহারের বিন্ধ্যেশ্বরী দুবে, হরিয়ানার ভজনলাল, উত্তরপ্রদেশের বীর বাহাদুর সিং—ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গায় নিজেদের পাপ ধোবার জন্য এলে রাস্তা বন্ধ হয়, পুলিশ তাদের দিকেই নজর দেয় বেশি। সাধারণ মানুষের ভিড় ক্রমাগত বিশৃঙ্খল হতে হতে ফেটে পড়ে আর ছত্রভঙ্গ পুণ্যবান সেই জনতার পায়ে দলে পিশে দম বন্ধ হয়ে মারা যান ৪৯ জন নিরপরাধ মানুষ।

কুম্ভমেলায় মরে। গঙ্গাসাগরে মরে। এসব মেলার শুরুতেই সবাই হিশেব কষে, এবার কতজনের মৃত্যু হবে। প্রাণহানি হয়। তারপরই আগের বছরগুলোর মৃত্যুর পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে ট্র্যাজিডির গুরুত্ব মাপা চলে।

অথচ পৃথিবীর বৃহত্তম মেলাগুলোর অন্যতম শোনপুরের মেলায় এমন মৃত্যু হয় না কেন

আশীর্বাদ বিক্রয় কেন্দ্র

ফটো কুশল গঙ্গোপাধ্যায়

হাতি-ঘোড়া-ছাগল-গরু থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই কেনাবেচা হয় এই মেলায়। কিন্তু শোনপুরের মেলা শুরু হলে কেউ হিশেব কষতে বসেন না কত লোক মরবে। মরে না, কারণ শোনপুরের মেলার উপলক্ষ তো ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করে পুণ্য অর্জনে পরলোকে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে মি. ক্লিন সার্টিফিকেট পাবার অযৌক্তিক উন্মাদনা নয়, শোনপুরের মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যান তাঁদের জীবিকার জন্য, বেঁচে থাকার অর্থোপার্জনের ইহলৌকিক তাগিদে। সেখানে আমার বেঁচে থাকার জন্যেই অন্যের বেঁচে থাকাটা অপরিহার্য, বেঁচে থাকাটাই সেখানে প্রত্যেকের দায়। অর্থনীতির নিয়মেই কেবল মানুষ নয়, ছাগল-গরু-হাতি-ঘোড়ার জীবনরক্ষাও সেই দায়েরই অংশ। বেঁচে থাকাটাই সেখানে সমষ্টির দায়িত্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু কুম্ভমেলায় তো তেমন কোনো দায় নেই। সেখানে রুজি রোজগারের প্রশ্ন নেই। কেবল ব্যক্তিগত পাপস্খালন আর পুণ্য অর্জনের মতো স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়েই এমন সব ধর্মের বাজার বসে। আমার পুণ্য পাওয়াটাই বড় কথা, পাশের লোকটি তাতে দলে পিষে মরলেও কিছু যায় আসে না। মানুষের সমষ্টিগত কোনো দায় সেখানে অনুপস্থিত।

তথ্যেই এই দায়হীনতার প্রমাণ মেলে। কুম্ভমেলার সরকারি হিশেব অনুসারে ৪৯ জনের (পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা রাজেশ খৈতান প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক আবেদনে ৫০০ জনের মৃত্যুর কথা বলেছেন শ্রীখৈতানের বৃদ্ধা মা ও মাসি পদদলিত হয়ে মারা যান) মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে ঐ তিন মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করা হয়েছে। যদিও দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস(ই)-র সভাপতি রাজীব গান্ধী গত ২ এপ্রিল হরিদ্বারের হর-কি-পৌরিতে নতুন স্নানের ঘাট উদ্বোধনের সময় বলে এসেছিলেন, ১৪ এপ্রিল পূর্ণকুম্ভের দিন কোনো ভি. আই. পি. স্নান করতে যাবেন না, তারই দলের এই তিন মুখ্যমন্ত্রী সে নির্দেশ মানেন নি। মানেন নি, কারণ স্বভাবতই ধর্মভীরু, পদাধিকার আঁকড়ে থাকায় লোভাতুর এই মুখ্যমন্ত্রীদের সকলেই ব্যক্তিগত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। বিন্ধ্যেশ্বরী দুবে আর ভজনলাল বিহার ও হরিয়ানায় নিজের দলেরই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর আক্রমণে দিশেহারা। আর বীর বাহাদুর সিং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণ নেহরু লবির মুখ্য প্রবক্তা হয়ে অযোধ্যার রাম মন্দির হিন্দুদের জন্য খুলে দিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চ্যাম্পিয়ন নেতা এখন উত্তরপ্রদেশে। ফলে তিন জনেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল গঙ্গায় স্নান করে পাপস্খালনের, যাতে অর্জিত পুণ্যে সিংহাসনে টিকে থাকা যায়। সমষ্টির প্রতি দায়িত্ব থাকলে কখনোই তাঁরা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে, পদাধিকারবলে প্রাপ্য ভি. আই. পি. সুযোগ সুবিধে নিতেন না লক্ষ্য রাখতেন, সাধারণ মানুষের কোনো পথ যাতে বন্ধ না হয়। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের কথা মনে রাখেন নি। ফলে, স্নানের ঘাটে যাবার ১২টি পথের ভেতর ৯টি বন্ধ করে দেওয়া হয় পুলিশ চলে যায় ভি. আই. পি. পুণ্য অর্জনের নিরাপত্তা দেখতে। ভীড় বাড়তে বাড়তে একসময় চাপ এত বেশি ছিল, মানুষ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। আর সেই নিঃসহায় মানুষগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কয়েক লক্ষ মানুষ, দলে পিষে শেষ করে। মৃতদের গা থেকে অলঙ্কার খুলে নেয় পুলিশ।

সমষ্টির প্রতি কোনো দায়বোধ নেই বলেই, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন পুলিশের ঘাড়ে। বলেছেন, পুলিশের লাঠি চালানোর জন্যই এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ১৪ এপ্রিল বিকেলে প্রেস ক্যাম্পে 'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বীর বাহাদুর সিং বলেন, তিন মুখ্যমন্ত্রী ভোরবেলা স্নান করেছেন ঠিকই, কিন্তু নিজেদের রক্ষী ছাড়া অন্য কোনো পুলিশ অফিসার তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। এদিকে পদস্থ পুলিশ অফিসারদের বিবৃতিতে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীরা সপরিবারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন, ফলে বেশির ভাগ পুলিশ ওঁদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিং অবশ্য 'প্রতিক্ষণ'-এর কাছে স্বীকার করেছেন, ১৪ এপ্রিল রাত তিনটে থেকে অধিকাংশ পায়ে-চলা পথ বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয়। একজন পুলিশ অফিসার জানালেন, "আমাদের তো চাকরি যাবে কিন্তু যাদের জন্য এই দুর্ঘটনা হলো, সেই তিন মুখ্যমন্ত্রীদের কী হবে?"

ধর্মের ভি. আই. পি.

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে 'প্রতিক্ষণ' ও কলকাতার 'আজকাল' পত্রিকার রিপোর্টার **প্রথম** হাসপাতালে পৌঁছন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। সেই হরমিলাপ মিশন রাজকীয় চিকিৎসালয়ে ততক্ষণে গোটা পাঁচেক পুণ্যার্থীর মৃতদেহ সেন্ট জন্স ও রেডক্রশের এমবুলেন্সে এসে পৌঁছেছে। ধীরে ধীরে আহত ও মৃতদের ঐ হাসপাতালে আনা হল। প্রধান ফটক পুলিশের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ভিড় সামলাতে পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে। একটি অস্থায়ী টেন্টে হাসপাতালের মধ্যেই যাদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন স্বামী সর্বানন্দজী। উত্তরপ্রদেশ গঙ্গাদূষণ বোর্ডের অফিসার আর. সি. গুপ্তা এবং কমলেশ গুপ্তা। শ্রীমতী গুপ্তা ভিড়ের মাঝে পড়ে যাবার পরেও পুলিশ এত লাঠি চালায় যে তার ডান হাতে রক্তের দাগ; বুকের হাড় ভেঙেছে বলে তাঁর স্বামী অভিযোগ করেন। কিন্তু কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল? সর্বানন্দজী বলেন হর-কি-পৌরি থেকে প্রায় তিন কি. মি. দূরে পন্থদ্বীপের ভীমগোড়া ব্রীজের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় এসে পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে আটকে পড়েছে। সকলেই চান ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে। তখন মেন টাওয়ার থেকে জয়দীপকুমার ঘোষণা করেন, হর-কি-পৌরি ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড়। এঁরা স্নান করে গেলে তারপরে ওদের ওদিকে যেতে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে জনতার চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায় এবং পুলিশ এলোপাথাড়ি লাঠি চালায়। ফলে হুড়োহুড়িতে কিছু পুণ্যার্থী মাটিতে পড়ে যান। সর্বানন্দজী নিজের বুক দিয়ে এদের আটকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর একের পর এক লোক এক একজন এক একজনের উপর পড়তে থাকে। এদিকে ঐ ঘটনার ২০ মিনিটের মধ্যে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ঘটনাস্থলে পুলিশ যেতে না দেওয়ায় এত লোক মারা যায় বলে অভিযোগ করেন সর্বভারতীয় সেবাসমিতির প্রধান কে. সি. বাঙ্গা। ১৯৫৪ সালে এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় এমনই পায়ের চাপে অন্তত ৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রধানকর্তা ডাঃ এস. এস. কুমার বলেন, প্রধানত শ্বাসবন্ধ হয়েই বেশির ভাগ পুণ্যার্থী মারা যান। ঐদিন ৪০ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নান করেন পাঁচটি প্রধান যোগে প্রায় দেড় কোটি মানুষ এবার স্নান করেছেন—মেলা অফিসার অরুণ কুমার মিশ্র তাই হিশেব।

শ্রীবাঙ্গা হাসপাতালেই এই রিপোর্টারকে জানান দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা পরে মৃতদের উপর কোনোক্রমে একটি

ধর্মোন্মাদনার গণহত্যা ফটো ক্রিয়েটিভ আই

ছাউনি দেওয়া গেছে। পুলিশী অব্যবস্থার প্রতিবাদে এখানে শাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে আহত ও নিহত পরিবার বর্গের লোকেরা ঘেরাও করেন এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। আহতদের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে পুলিশী লাঠিচালনার কথা। ১৫ এপ্রিল লোকসভায় বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ হয়।

এই ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, একজন এস. ডি.এম, একজন ডি. এস. পি এবং দুই প্লেটুন পুলিশকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে "পায়ে হেঁটে ঐ. হাসপাতালে এবং ঘটনাস্থলে" পরিদর্শনে যান এবং ঘোষণা করেন নিহতদের ২০,০০০ টাকা এবং আহতদের ৫,০০০ টাকা করে এককালীন সাহায্য দেওয়া হবে। একই সঙ্গে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাইকোর্টের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

ছবি : অভিজিৎ দাস

বকসন্ন্যাসী—এক পায়ের সাধনা না চমক ?

এই ঘটনার তদন্ত করবেন। প্রাথমিকভাবে মেলা অফিসেই ঐ ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় শাহারানপুরের এ. ডি. এম শ্রীএস. এন. মিশ্রকে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন। আমাদের সামনেই কমিশনারের অফিসে নিজের জামা খুলে পুলিশী লাঠি চার্জের ঘটনার কথা উল্লেখ করে অন্তত দুটি এফ. আই. আর. দায়ের করেন জম্মু-কাশ্মীরের এক্সিকিউটিভ অফিসার ডি. শর্মা। তিনি বলেন তাঁদের সঙ্গে অধ্যাপক ও. পি. বরু সহ ৬ জন নিখোঁজ।

ঐ দিন নিরঞ্জন আখড়া এবং জুনা আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্নান করতে যাবার সময় পাথর ছোঁড়াছুঁড়ির ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। তা না হলে হয়ত আরও কিছু লোক মারা যেত। নাগারা ফেরার পথে 'উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে যায়।

বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ, কিছু ক্ষতিপূরণ, কিছু পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করা—এতেই বীর বাহাদুর সিং-এর দায়িত্ব শেষ। কিন্তু কুম্ভমেলা তো শুধু ধর্মান্ধ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পাপস্খালনের স্বার্থপর মেলাই কেবল নয়, কুম্ভমেলার ভেতরেও নানা মেলা আছে, আমাদের দেশের প্রায় কোনো সংবাদপত্রই সেই অন্য কুম্ভমেলার কথা জানায় নি। হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারেই তারা ব্যস্ত ছিল। কুম্ভমেলা যেহেতু জীবিকা ও রুজি-রোজগারের দৈনন্দিন তাগিদ থেকে অনিবার্য সংগঠিত মেলা নয়, তাই ধর্মের অযৌক্তিক অপব্যাখ্যায় এই মেলা আসলে হয়ে ওঠে দুর্নীতির মেলা, ব্যবসার মেলা, চুরির মেলা ; কেবল ধর্মের একটা অলীক আবরণ সামনে রেখে সমস্ত দুরাচারকেই বৈধ করে তোলবার চেষ্টা থাকে।

কুম্ভমেলা নিয়ে আমাদের কলকাতার কাগজগুলোয়, বিশেষ করে বাংলা কাগজে, প্রথম পাতার সিংহভাগে ছাপা হয়েছিল কুম্ভমেলার মহিমা, হিন্দুধর্মের 'জয়গান'। ধর্মকে সমালোচনা না করে, তার গুণগান প্রচার, সংবাদপত্রের ভাষায়, পাঠক ভালো খায়। গড় হিশেবে দেখা যায় বাংলা দৈনিক কাগজ প্রথম ও কখনও পাঁচ, কখনও ছয়, কখনও এগারো পাতায় ৯ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কুম্ভ সংক্রান্ত 'সংবাদের' জন্য জায়গা দিয়েছে যথাক্রমে, ৯ এপ্রিল—৬২ ইঞ্চি ; ১০ এপ্রিল—৬৭ ইঞ্চি ; ১১ এপ্রিল—৬৮ ইঞ্চি ; ১২ এপ্রিল—৭৭ ইঞ্চি ; ১৩ এপ্রিল—৯৬ ইঞ্চি ; ১৪ এপ্রিল—৬৯ ইঞ্চি। লোকের মন থেকে ধর্মান্ধতা দূর করা নয়, তাকে ধর্মের নেশায় আরও ডুবিয়ে দিতে এই কাগজগুলোর 'নিরপেক্ষ' ভূমিকার কোনো তুলনা নেই। অথচ আমরা একবারও জানতে পারলাম না, ঐ কুম্ভমেলার উদ্যোগ পর্বে, ২৪ জানুয়ারি, হরিদ্বারের সেচ বিভাগের দক্ষ এঞ্জিনিয়ার শ্রীআর. কে. আগরওয়াল এবং তাঁর ছেলেকে জনৈক ঠিকাদারের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো। কুম্ভমেলার ঠিকাদারি পাবার জন্য এখানে গুণ্ডাবাজি, সশস্ত্র মাফিয়াবাজি চলেছে অব্যাহত। ধর্মের নামেই এসব হয়েছে।

দুর্নীতির ধর্ম

শ্রী আগরওয়াল ছিলেন অত্যন্ত সৎ এঞ্জিনিয়ার, তবু ঠিকাদারদের সন্তুষ্ট করতে না পারার জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তিনি ব্যারেজ কনস্ট্রাকসন ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার, গত জানুয়ারিতে হরিদ্বারের ড্যামের উপর কিছু কাজ করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। ঐ টেন্ডারে লোয়েস্ট রেট দিয়েছিলেন প্রেমবীর নামে জনৈক ঠিকাদার। দ্বিতীয় স্থানে ছিল সত্যেন্দ্র সিং। ২৪ জানুয়ারি, ঐ কাজ প্রেমবীরকে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সেদিন সরকারিভাবে ঘোষিত না হলেও সত্যেন্দ্র সিং-এর কাছে সেই খবর ছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রী আগরওয়ালের বাড়িতে সত্যেন্দ্র সিং যায় এবং গুলি করে তাকে ও তার পুত্রকে হত্যা করে বলে অভিযোগ। এই শোকে শ্রীমতী আগরওয়াল ঐ রাতেই আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনায় মেলা উপলক্ষে যে সব কাজ চলছিল, একযোগে তাঁর কর্মী ও অফিসাররা কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট শুরু করেন এবং ঐ ঘটনার তদন্তের দাবি জানান। শেষ পর্যন্ত, মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংকে ছুটে আসতে হয় হরিদ্বারে। তদানীন্তন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং অতিরিক্ত জেলা শাসককে বদলি করার পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। সত্যেন্দ্র সিং আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ধর্মের নামে দুর্নীতি কমে নি।

কুম্ভমেলার জন্য রাজ্য সরকার প্রায় ১৩ কোটি টাকা খরচের যে পরিকল্পনা নেন তা রূপায়ণে দুর্নীতি, অপচয়ের অভিযোগের শেষ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, কুম্ভ শেষ হলে আর লোটা যাবে না, তাই যে যা পারেন লুটে নিন। এটা যে কতদূর সত্যি কয়েকটি ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। তাঁবু-কানাতের ঠিকা দেওয়া হয়েছিল এলাহাবাদের লাল্লুজী অ্যান্ড সন্সকে। পুলিশ বিভাগও আর একটি ঠিকা দেন লাল্লুজী অ্যান্ড শিবগোবিন্দ ফার্মকে। ঐ দুটি ফার্ম একটি ছোট্ট সুইস কুটীরের ভাড়া ৮৪০ টাকা রেখেছিল শতকরা ৩০ ভাগ ছাড় দেবার পর। অভিজ্ঞ কর্মীদের মতে এর জন্য যে টাকা ব্যয় হয়েছিল তা দিয়ে কয়েকটি কুম্ভমেলার প্রয়োজনীয় তাঁবু কেনা যেত। শোনা যায়, এলাহাবাদে কিছুদিন আগে যে স্বতন্ত্রতা সেনানী সম্মেলন হয় সেখানে ঐ সংস্থা তাঁবু-কানাত কম মূল্যে দিয়েছিল। সেদিন উদ্যোক্তারা উক্ত মালিককে আশ্বাস দেয়, কুম্ভমেলায় পুষিয়ে দেব। লক্ষ্ণৌর চাপে সেই কথা রাখতেই ঐ ফার্মকে তাঁবু-কানাতের ঠিকা দেওয়া হলো। তেমনই ৫৫ টাকা করে দড়ির চারপায়া খাট কেনা, এবং ৩০ টাকা করে চেয়ারের ভাড়া দেওয়া নিয়েও লুঠ চলেছে বলে অনেকে মনে করেন।

লক্ষ্ণৌর মেসার্স তায়ল এন্ড কোম্পানি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকায় বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহের অর্ডার পায়। মাইকের ঠিকা দেওয়া হয়েছে আশারাম অ্যান্ড কোম্পানিটিকে (এলাহাবাদ) ৭৩ হাজার টাকায়। উল্লেখ্য, ৮০ সালে ঐ ঠিকা ৭৪ হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছিল। কম টাকায় কীভাবে দেওয়া হলো অনেকেই তা নিয়ে তদন্ত চান।

মেলা উপলক্ষে সরকারি পরিবহণের ভাড়াও যা খুশি ভাবে বাড়ানো হয়। হরিদ্বার থেকে দিল্লির বাস ভাড়া যেখানে ২২ টাকা ছিল মেলার সময় তা ৩৩ টাকা হয়। হরিদ্বার-হৃষীকেশের ভাড়াও দ্বিগুণ করা হয়। টেম্পো-ট্যাক্সির ভাড়া ৪ গুণ বাড়ে। আলুর দাম কেজি প্রতি ৫ টাকা হয়। কিছু লোক খুচরো পয়সা নিয়ে দারুণ ভাবে ব্যবসা করে যা চোখের সামনে দেখেছি। গঙ্গা জল নিয়ে যাবার জন্য প্লাস্টিকের কৌটোর দাম ৮/১০/১২ টাকা, যা অবিশ্বাস্য।

মেলা উপলক্ষে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করার কথা বললেও স্থানীয় বিধায়ক মহাবীর রাণা নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঐ ঘটনার তদন্তের জন্য বলেছেন। হরিদ্বার পৌরসভা ৪০ লক্ষ টাকা এ ব্যাপারে পেয়েছে, কিন্তু কীভাবে কোথায় ঐ টাকা খরচ হলো তা স্থানীয় মানুষেরাই জানেন না বলে অভিযোগ।

গত ৪ জানুয়ারি চুন, ঝাঁটা, ঝুড়ি সহ বেশ কিছু জিনিশের জন্য টেন্ডার খোলা হয়। কিন্তু ঐ বিভাগের প্রিয় ঠিকাদার ঐ ঠিকা না পাওয়ায় তা বাতিল করে টেন্ডার ছাড়াই সেই প্রিয় ঠিকাদারকেই ঐ সমস্ত মাল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে একদল ঠিকাদার তদন্ত দাবি করেছেন। জনৈক ঠিকা মজদুর স্বামীম জানান, তাঁদের প্রতিদিন ১৬ টাকা করে পাওয়ার কথা হলেও অনেকেই পান নি। যদিও টিপ ছাপ দিয়ে টাকা তুলেছে ঐ মজুরেরা। সেচ দপ্তরের প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কাজ সময় মত শেষ হয় নি এবং টাকা নিয়ে নয়-ছয়ের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। অনেকেই মনে করেন, রাজ্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনে কুম্ভমেলা উপলক্ষে ১৩ কোটি টাকা নিয়ে নয়-ছয়ের অভিযোগ দায়ের করবেন বিরোধী সদস্যরা এবং তাঁরা তদন্তেরও দাবি জানাবেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে ঐসব ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ করে বলা হয়েছে, প্রতিটি

ঠিকার সঙ্গেই 'কমিশনের' বিষয়টি জড়িত ছিল সাংবাদিকদের টেন্টটি বিনা টেন্ডারে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় ঠিকা দেওয়া হয়।

এখানকার দুধ সরবরাহ নিয়ে চরম অব্যবস্থা ছিল। মেলা কর্তৃপক্ষ যদিও ঢালাও দুধের ব্যবস্থার দাবি করেন, কিন্তু তা যে কতদূর মিথ্যে তার প্রমাণ মেলে ১৩ এপ্রিল, সেদিন দুধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ২০ টাকা লিটার দরে দুধ বিক্রি হয়। এখানে দুধ প্রধানত আসত তিনটি জায়গা থেকে—উত্তরপ্রদেশ কো-অপারেটিভ ডেয়ারি সংস্থা, রাজস্থান কো-অপারেটিভ ডেয়ারি ফার্ম ও মিরাটের একটি ব্যক্তিগত সংস্থা। ঐ দিন ২৫,০০০ লিটার দুধ এবং দুটি ট্রাক বোঝাই কয়েক হাজার লিটার প্যাকেটের দুধ সরকারি আমলারা শহরের ভেতরে আসতে দেয় নি। যদিও ঐ ট্রাকের পারমিট ছিল। কিন্তু কেন এমন হলো সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ তার কারণ দেখাতে পারেন নি। ফলে প্রায় আড়াই লাখ টাকার দুধ একদিনে নষ্ট হল। উপরন্তু কালোবাজার থেকে দুধ কিনে এনে কোনোমতে কাজ চালায় দোকানদাররা। এই ঘটনা প্রমাণ করে একদিকে যোগাযোগবিহীন ব্যবস্থার কথা, অন্যদিকে আই. এ. এস. এবং আই. পি. এস অফিসারদের লড়াই এই ব্যাপারেও। এই যোগাযোগের অভাব ছিল দুর্ঘটনার দিন যখন বেলা দুটো পর্যন্তও মেলাপ্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নি।

মেলাগামী প্রতিটি গাড়ি ও বাসের এবং স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের মালপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনে মেটাল ডিটেকটর দিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের দেহ তল্লাসী করতেও দেখেছি।

মেলার সময় এখানে খাবার জিনিসের দাম ছিল সবচেয়ে চড়া। ৫টি লুচি একটু ঝোল ৩ টাকা। মনোমত খাবারের অভাব ছিল একটি দোকান বসাতে ঘুস ছাড়া ১২,০০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়েছে বলে এক ছোট্ট হোটেল মালিক রুরীবেলওয়ালেতে আমাদের জানালেন। এখানে নিয়ম, নীতি শুধু যেন প্রেস রিলিজে আবদ্ধ ছিল।

প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি অস্থায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকলেও প্রতিদিন পাঁচ-ছ ঘণ্টা ধরে, বিশেষত সন্ধেবেলা, লোড শেডিং হতো। অথচ ১৮টি জেনারেটর ছিল। এই অন্ধকারে ছিনতাইয়ের সুবিধে হয়। গত ১৫ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে কথা ওঠে।

কুম্ভমেলায় মৃত্যু এই প্রথম নয় বরং ব্যাপারটা উল্টো, মৃত্যুই কুম্ভমেলাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। ১৭৬০ সালে নাগা সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সাধুদের ভেতর স্নান নিয়ে তুমুল লড়াই বাধে। ১৭৮৩-তে সাফাই ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য মারা যান ২,০০০ ব্যক্তি। প্রায় ১৮,০০০ লোক মারা যান—'এশিয়াটিক রিসার্চ'-এ এফ. জি. রোপর এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঐ সিরিজেরই ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি, ১৭৯৬ সালের ১০ এপ্রিল শিখ ঘোড়সওয়ার আর সন্ন্যাসীদের মারামারিতে প্রাণ দেন বহু মানুষ। ১৮১৯ সালে হর-কি-পৌরি-তে স্নানের সময় মৃত্যু হয় ৪৩০ জনের। ১৮৯৩ ও ১৮৯৭ সালে টাঙ্গা স্ট্যান্ডের কাছে কাঠের বেড়া ভেঙে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয়েছিল বহু মানুষের। ১৯৫০-এ ঐ জায়গায় লোহার বেড়া তৈরি হলেও অনেক ব্যক্তি প্রাণ হারান ভিড়ের চাপে। ১৯৩৮ সালে আগুন লেগে বহু মানুষ মারা যান। ১৯৫৪ সালে জওহরলাল নেহরু গিয়েছিলেন এলাহাবাদে। সেখানে নাগা সন্ন্যাসীদের পাশবিক তাণ্ডবে ৫০০ ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন। গণহত্যার সেই তাণ্ডব ১৯৮৬-তেও অব্যাহত। ধর্মেরই নামে।

কিন্তু সর্বত্যাগী যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী, 'বাবা,' 'মা'-র দল কুম্ভতে এসেছিলেন, তাঁরা কি ঠিক ছিলেন? না। এই ধর্ম বাজারের সবচাইতে বড় ব্যবসায়ী তাঁরাই। ভণ্ডামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেল এবার পূর্ণকুম্ভের মেলা জুড়ে। ধর্মের ব্যবসা বা ব্যবসার ধর্ম।

ব্যবসার 'বাবা', 'মা'

ইঁদুর ঢুকে কেটে দিল সাধুর কারখানা',—কুম্ভমেলায় এসে তখনও পর্যন্ত কোনো বাউল গান শোনা যায় নি। তাই হঠাৎ এতদূরে এসে একেবারে বিশুদ্ধ বাউল গান যে কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসীকে থামাবেই। কিন্তু এরকম গান কেন? এত বড় মেলা, এত মানুষ এই পাহাড়, এই নদী এত সব সত্ত্বেও এ গান কেন? পরে বোঝা গেল। মেলার বড় বড় সাধুসন্তদের দেখে বাউলগায়ক কিছুটা আহত হয়েছেন। বাউলের ভাষায় ইঁদুরের অর্থ—যে ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তি বা পার্থিব লোভ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে অনেকের মতই বাউল গায়কের সাধু ধারণায় আঘাত লেগেছে।

অত্যন্ত কম মূলধনের 'বাবা' ব্যবসার মত এত ভাল ব্যবসা যে আর হয় না কুম্ভমেলায় না এলে তা বোঝা যায় না। তবে অন্য ব্যবসার মত এখন বাবা ব্যবসাতেও প্রযোজক এসেছেন। বাবার সব চিন্তা ভাবনা, টাকার প্রয়োজন মেটাবেন ওই

এই কৃচ্ছ্রসাধনেই একুশ শতকের দিকে যাত্রা

ফটো : দীপক ভট্টাচার্য

'গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর শুভ-অশুভ নির্ভর করে না'

ডঃ রমাতোষ সরকার বিড়লা তারামণ্ডলের কিউরেটর। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে। ডঃ সরকার রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটির সদস্য এবং 'মহাবিশ্ব' 'প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা' ইত্যাদি কয়েকটি মূল্যবান বই ইতিমধ্যেই লিখেছেন। এছাড়া 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' নামের তাঁর আকাশ ও তারা সম্বন্ধে নিয়মিত ফিচার কলকাতার একটি পাক্ষিক পত্রিকায় একসময় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

প্রতিক্ষণ : আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে গ্রহ-রত্ন-জন্ম-পত্রিকা জাতীয় কু-সংস্কার দ্রুত আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে ?

ডঃ সরকার সমস্ত দেশ জুড়ে এটা হচ্ছে কি না আমি বলতে পারব না। আমার নিজের মত পশ্চিমবঙ্গে যত বেশি এটা হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশে তা কিন্তু এত বেশি আমি দেখি নি। যেমন আমি মহারাষ্ট্রের কথা বলতে পারি। ওখানে অবস্থাটা এমন নয়।

প্রতিক্ষণ : কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর্থিকভাবে যাদের অবস্থা সাধারণের চেয়ে যথেষ্ট ভাল, তারাই এই কু-সংস্কারের দিকে বেশি ঝুঁকছেন।

ডঃ সরকার সেটাই স্বাভাবিক। এটা তো একটা সামাজিক অবস্থা। 'কালেকটিভ' ভাবে মানুষ যখন এর শিকার হয় তখন অনেকেই এই পরিবেশের বাইরে থাকতে পারেন না সামাজিক ও আর্থিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা যত বাড়বে ততই এমন ঘটনা ঘটবে দেখুন বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করা থেকে শুরু করে এই অনিশ্চয়তা আজ কিভাবে সমস্ত ক্ষেত্রকে গ্রাস করেছে। আজকে অদৃষ্ট আর ভাগ্য সমার্থক হয়ে গেছে। গোড়ায় কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ছিল না। অদৃষ্ট শব্দটা আমার খুব ভাল লাগে। অর্থাৎ আমরা অনেকটা জানি, দেখতে পাই, আবার কিছুটা জানি না, দেখতে পাই না। এই অংশটা অদৃষ্ট। যতটুকু — জানিনা তার অংশটা আজ বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ অনিশ্চয়তা অস্থিরতা বাড়ছে। এবারে এই অদৃষ্ট অংশটা নিয়ন্ত্রণের জন্য আসছে নানা বাধা, ছোট বড় মাদুলি বা গ্রহ-রত্নাদি। সমাজ আজ এই রোগে ভুগছে। সামগ্রিক ভাবেই এই অসুখে আমরা আক্রান্ত

প্রতিক্ষণ : ত্র্যহস্পর্শ অথবা মঘা-র পেছনে কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবনা আছে ?

ডঃ সরকার : এখানে একটা মজা আছে। এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের কনসেপ্ট। এর পেছনে গণিত রয়েছে, বিজ্ঞান রয়েছে। একটা তিথি হল একটা চন্দ্র-দিন। একটা তিথির দৈর্ঘ্য ১৯ ঘণ্টা কয়েক মিনিট থেকে ২৭ ঘণ্টা পর্যন্ত কম বেশি হতে পারে। ফলে যখন একটা দিন শুরু হল অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে, এমন হতে পারে যে তার মাঝখানে রইল একটা তিথি এবং এই মাঝে ১৯ ঘণ্টা কয়েক মিনিট বাদে সামনে পেছনে যে কয়েকটা ঘণ্টা (প্রায় পাঁচ ঘণ্টা) রইল তার প্রথম অংশ দখল করল আগের চন্দ্র তিথি এবং শেষ অংশ দখল করল পরের চন্দ্র তিথি। অর্থাৎ একটি সূর্য-দিনের ভেতরে এসে গেল এই তিন তিথি। এই হল ত্র্যহস্পর্শ। এই কনসেপ্টটায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু ত্র্যহস্পর্শে বেগুন খাব কি খাব না, যাত্রা শুভ না অশুভ এগুলো মানুষের বানানো। আর মঘা একটি তারার নাম। আকাশে চাঁদের উৎপত্তি চিহ্নিত করতে ২৭টি নক্ষত্র আছে, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিনী ইত্যাদি। এর মধ্যে মঘা-ও একটি নক্ষত্র। মঘা-র আগে আছে অশ্লেষা। এই দুটো তারা বিনা দোষেই অশুভ হয়ে গেছে। এটাও মানুষের বানানো।

প্রতিক্ষণ তিথি আর দিনের এই সমস্যাটা কোথা থেকে আসছে ?

ডঃ সরকার : এটা হল চন্দ্র পঞ্জিকা আর সূর্য পঞ্জিকার ব্যাপার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রথমে চাঁদকে খুঁটি করে পঞ্জিকা রচনা করা হয়েছিল কিন্তু চাঁদের গতিপথ বড় জটিল। এর ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল। এর পরে তৈরি হয়েছে সূর্য সিদ্ধান্ত মত। কিন্তু ততদিনে চাঁদকে ঘিরে যে পঞ্জিকা তার ভিত্তিতে প্রচুর লোকাচার গড়ে উঠেছে। তখন পণ্ডিতেরা চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে একটা কম্প্রোমাইজ করলেন। সাহেবদের বড় দিন সূর্যের গতি পথের উপর হিশেব করে নির্দিষ্ট করা আছে, তাই ওটা প্রত্যেক বছরই ২৫শে ডিসেম্বর হয়ে থাকে। ২৩শে ডিসেম্বর সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু অর্থাৎ বড় দিনের শুরু তার দু'দিন পর। কিন্তু ২৫শে ডিসেম্বর কি বার হবে আপনি আগাম বলতে পারবেন না। অর্থাৎ ওটা নির্দিষ্ট নয়। আবার ধরুন ইস্টার পরব কবে, না রবিবার। গুড ফ্রাইডের পরের রবিবার। ইস্টার পরব এ বছর পড়েছিল ২৩শে মার্চ। ইস্টার পরব ২২শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো দিন হতে পারে। ২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রি সমান। এই ২১শে মার্চ-এর পরের পূর্ণিমার পরবর্তী রবিবারটি হল ইস্টার পরব। অর্থাৎ ইস্টার পরবটা চাঁদের গতির হিশেবে হচ্ছে। আমাদের দেশে যেমন চাঁদের হিশেবে হয় দুর্গা পুজো। এই জন্যই বছরে বছরে ১১ দিনের, ২২ দিনের তফাত হয় পূজার তারিখ নির্ণয়ে।

প্রতিক্ষণ জ্যোতিষ গণকদের কথা তো কখনও কখনও মিলে যায়...

ডঃ সরকার সে তো মিলতে বাধ্য। প্রথমত যেগুলো মেলে না সেগুলো নিয়ে কেউ কথাই বলে না। আর যে কটা মিলল তাই নিয়ে অলৌকিকতার প্রচার চলে। কিছু কথা বা কিছু ভবিষ্যৎবাণী মিলতে বাধ্য। এটা অঙ্কের নিয়ম। প্রবাবিলিটি। আপনি ১০০ জন লোক সম্পর্কে ইচ্ছেমতো কিছু কথা বলে যান, শতকরা ৫০ দেখবেন মিলে গেছে। বরং অনেক বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার হবে সেটাই যদি একটাও কথা মিলে না যায়।

প্রতিক্ষণ এ তো গেল অঙ্কের খেলা। এর বাইরে হাত দেখে কি সত্যিই কিছু বলা যায় ?

ডঃ সরকার : না, যায় না। যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিক্ষণ পঞ্জিকায় যে সব তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি দেওয়া থাকে সেগুলো কতটা নির্ভরযোগ্য ?।

ডঃ সরকার : পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্রের গণনা ভুল হবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের দেশে যে কটা পঞ্জিকা চলে তার প্রায় সবগুলোই ভুল। সমস্তটাই। ওঁরা পঞ্জিকার গণনা করেন সূর্য সিদ্ধান্ত মতে। এটা খুবই খুবই প্রাচীন বিজ্ঞান। যেমন ধরুন আকাশে একটা জিনিশ ঘটে যাকে বলে অয়নচলন। যখন সূর্যসিদ্ধান্ত বিজ্ঞান আবিষ্কার হয়েছিল তখন অয়নচলনের কথা জানা ছিল না। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'প্রিসিসন অফ দ্য ইকুইনক্স'। পরবর্তীকালে ভারতে মুনজাল নামের এক মহাপণ্ডিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই অয়নচলন সংস্কার করে সূর্য সিদ্ধান্ত গণনাকে আরো নিখুঁত করেন। আজকে তো গণনার কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, গণিত কত এগিয়ে গেছে। এইসব পঞ্জিকা যাঁরা করেন তাঁরা প্রায় সবাই সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণনা করেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের গণনার সময় অয়নচলনের মত প্রাচীন সংস্কারকেও গ্রাহ্য করেন না। ফল যা হবার তাই হয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ গণনাই হয় ভুল। প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্তকারেরা কিন্তু অনেক মুক্ত মনের ছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিত মুনজালের আবিষ্কারকে তাঁরা যথাযথ সম্মান দিয়ে নিজেদের গণনাকে সংস্কার করে নিয়েছিলেন।

প্রতিক্ষণ : কিন্তু পঞ্জিকা অনুসারে গ্রহণ গুলো তো ঠিকই হয় !

ডঃ সরকার : এখানে একটা দুর্নীতি আছে। পঞ্জিকাকারেরা যে পদ্ধতিতে আর সমস্ত কিছু গণনা করেন সেই একই পদ্ধতিতে গ্রহণ গণনা করেন না। কারণ গ্রহণ চোখে দেখা যায়। ভুল গণনা মানুষ ধরে ফেলবে। আমাদের দেশে যে পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার আছে সেখান থেকে ওঁরা খবর সংগ্রহ করেন। স্বাধীনতার পরে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে, ভারতের হাজারটা পঞ্জিকা তার প্রত্যেকটাই প্রায় আগাগোড়া ভুল গণনায় ঠাসা, এই সমস্যাটার কথা জানান। মেঘনাদ সাহার অনুরোধেই তৈরি হয়েছিল এই পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার। এখানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও জটিল গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ভুল পঞ্জিকা তৈরি করেন। এই কেন্দ্রের আরো একটা কাজ হল, এখান থেকে যে কেউ খবর সংগ্রহ করতে পারেন। সমস্ত বাজারি পঞ্জিকা এই কেন্দ্র থেকে গ্রহণের দিনক্ষণ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন, যাতে তাদের ভুল গণনা ধরা না পড়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার যে নির্ভুল পঞ্জিকা প্রত্যেক বছর তৈরি করছে তার কদর কিন্তু ভারতীয়রা দিচ্ছেন না। তাঁরা ঐ ভুল পঞ্জিকাতেই সন্তুষ্ট। অথচ মোট চোদ্দটা ভাষায় 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' নামের এই পঞ্জিকা প্রতি বছরই ছাপানো হচ্ছে যাত্রা শুভ-অশুভটা যদি কেউ বিশ্বাসও করেন কোন কোন তিথিতে বা কোন কোন নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানে, তাহলেও তো তাঁর সেই তিথিটা বা নক্ষত্রের সেই বিশেষ অবস্থানের সময়টা নির্দিষ্টভাবে জানতে হবে। বাজারি পঞ্জিকাগুলোতে ভ্রান্তগণনার ফলে এই সমস্ত তথ্যই প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভুল থাকে। □

সাক্ষাৎকার : শুভাশিস মৈত্র

ফাইনানশিয়ার। এবং লাভের টাকার একটা বড় অংশ নেবেন তিনিই। একেবারে আধুনিক যে কোনো ব্যবসার মত বড় বাবাদের জনসংযোগ অফিসার আছেন, প্রচার দপ্তর আছে, প্রকাশনা কেন্দ্র আছে, এমন কি কোনো কোনো বাবার মার্কেটিং ম্যানেজারও আছে। প্রচার ছাড়া যে কোনো কিছুই বাজারে বিক্রি করা যায় না সে সম্পর্কে বাবারা সম্পূর্ণ অবহিত। তাই 'আগে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি' এই প্রবাদটি বাবাদের কাছে বেদবাক্যের মত পালনীয়। শ্মশ্রুপালিত বা মুণ্ডিত মস্তক, জটাধারী বা সাঁইবাবাজাতীয় কেশ—সব ফিকিরের বাবাই কিন্তু পোশাকে-আশাকে, পারফিউমে, হাসিতে দর্শনধারী হয়ে ওঠার দক্ষতাটাই প্রথমে অর্জন করেন। এক বাবার কথায়, জীবনবীমার পলিসি বিক্রি করার থেকেও তাঁদের কাজটা অনেক বেশি কঠিন। কেননা এখানে হাতে-হাতে কিছু পাওয়া যায় না। সব বাবাই তাই মানসিক শান্তির ওপর বেশি করে জোর দেন।

তবে হ্যাঁ, গেরুয়া, লাল বা ফিকে গেরুয়া। অধিকাংশ বাবাই কিন্তু পোশাকে রং-এর ব্যাপারে বিপ্লব আনতে সাহস করেন না। কোনো কোনো বাবা আছেন যাঁরা কিন্তু জিনস্ পরলে বেশ মানাবে। তবে এই একটা ব্যাপার। সরষের তেলের বিজ্ঞাপনে যেমন বিশুদ্ধ বা খাঁটি কথাটা লিখতেই হয় তেমনই পোশাকের রংটা প্রায় এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। তবে দুচার জন এর ব্যতিক্রমও আছেন। তাঁরা শাদা পোশাক পরেন।

হর-কি-পৌরিতে স্নান করতে করতে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন বাবারা হচ্ছেন ভাল 'লিয়েজোঁ' অফিসার। কথাটার অর্থ পরিষ্কার হয় সদাচারী বাবার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর। খুবই বিতর্কিত এই আন্তর্জাতিক বাবা। এই বাবা [illegible] প্রেস ক্যাম্পে সাংবাদিক সম্মেলন [illegible] করেন। সাংবাদিকদের ব্যাগ উপহার দেন। বাবার মুখে সব সময়ই রাজীব গান্ধী আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কথা। সদাচারী বাবা জানেন নেগেটিভ প্রচারেরও একটা দাম আছে। প্রচার নেগেটিভ হলেও মানুষকে কৌতূহলী করে।

বাবার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। ৩৫ থেকে ৪৫-এর মধ্যে যে কোনো বয়স হতে পারে। বাবার জীবনী ছেপে বেরিয়েছে। বাবা নিজেই সাংবাদিকদের উপহার দিয়েছেন তাঁর জীবনীগ্রন্থ। ইংরেজী ও হিন্দি দুটি ভাষায় এই বইটি বিক্রি হয়েছে লাখ কপি। দাম ৫১ টাকা। বইটির লেখক হিসেবে উল্লেখ আছে আমেরিকা নিবাসী রেনাল্ড রেগন। এখন এত ভাল একটা প্রকাশনা ব্যবসার জন্য প্রযোজক না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যদিও এ বই বাবা নিজেই ছেপেছেন।

বইটির পাতায় পাতায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ছবি। সকলেই সদাচারী বাবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ। এইসব ছবি দেখার পর যদি ভক্তরা ভাবেন 'বাবা কিনা পারেন' তাতে আর এমন অন্যায় কি ? তাছাড়া দু একটা পারমিট, লাইসেন্স বা ছোটখাট সমস্যারও বাবা পারেনই এই সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা হোমরা চোমরাদের সাহায্যে মুশকিল আসান করে দিতে।

আগে একসময় সাধু সন্ন্যাসীরা সাধারণত সুতির গেরুয়া বস্ত্রই পরতেন। কিন্তু এখন যুগের প্রয়োজনেই এসব পাল্টেছে। টেরিকট বা পলিয়েস্টার ছাড়া অন্য পোশাকের কথা বাবারা ভাবতেই পারেন না। তাঁর কারণ অন্য কিছু নয় সুতির পোশাকের ঔজ্জ্বল্যের অভাব।

সাধুসঙ্গই মানুষের জীবনে স্থায়ী শান্তি এনে দিতে পারে। এখন সাধুসঙ্গ করার কোনো অসুবিধা নেই। শুদ্ধানন্দ বাবার ভক্তরা ৪০ টাকা দিলেই ৪৫ মিনিট বাবার বাণী বাড়িতে বসেই যখন ইচ্ছে শুনতে পাবেন। বাবার বাণীর ক্যাসেটের দাম মাত্র ৪০ টাকা। তবে উপরি লাভ ক্যাসেটের মাঝে মাঝে অনুপ জালোটার যুগানুযায়ী ভজন। বড় বাবা মেজ বাবা ছোট বাবা সব বাবারই এখন প্রিয় গায়ক অনুপ জালোটা।

তবে ভজনের ব্যাপারেও বাবারা চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রায় সব আশ্রমেই এক দুজন স্থায়ী গায়ক গায়িকা রয়েছেন। তাঁরা ভক্তপরিবৃত বাবা বা মাকে ভজন শোনান। খুশি হলে বাবা বা মা মাঝে মাঝে তাঁদের গানে গলা মেলান। ভক্তদের কাছে এইসব গায়ক গায়িকাদের দাম বাড়ে। ভক্তদের বাড়িতে ভজনের আসরে এদের ডাক পড়ে। এদের সাম্মানিক দক্ষিণাও বাবা স্থির করে দেন। বাবারা কিন্তু খোল করতাল নিয়ে ১৫ শতকের কায়দায় ঢিমেতালের ভক্তিগীতি মোটেই পছন্দ করেন না। তাই পিয়ানো অর্কেডিয়ান, ব্যান্ড ইত্যাদি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ফিল্মী ভক্তিগীতিতেই বাবাদের টান বেশি। লেটেস্ট 'রাম তেরি গঙ্গা মইলি'-র গানগুলো কুম্ভে খুব চলেছে।

সব ভক্তই ত আর হেড অফিসের বড়বাবু বা স্কুল শিক্ষক নন। এসব ভক্তরা আছেন। থাকবেন। তবে তাঁরা অল্পতেই খুশি। বাবার একটু হাসি, দুটো কথা আর শিষ্যদের মুখে প্রচারিত নানা গপ্পো এই নিয়েই তাঁরা খুশি। কিন্তু যে সব ভক্তদের কালো টাকা রাখার জায়গা নেই, তাঁদেরই তো বেশি দরকার। তাঁরাই ত ধর্মের বড় ক্রেতা। এই ধরনের ভক্তরাই বাবাসঙ্গ করতে পারেন সব সময়। ভিডিও ক্যাসেটে বাবার ধ্যান, ধর্মালোচনা, উপদেশদান এবং নানাবিধ দৃশ্য ধরা আছে। এক বাবা বললেন, আশ্রমে ত সবাই থাকতে পারেন না। জীব মায়ায় বদ্ধ। সংসারের পাকে পাকে ঘুরছে। তারই মধ্যে সময় সুযোগমত এইসব ভিডিও ক্যাসেট যদি ভিসিআর-এ দেখে তাহলে কিছুটা মুক্তির পথ সুগম হবে। কতবার আর ভাড়া করা ভিডিও ক্যামেরা এনে বাবা ছবি তুলবেন। তাই নিজের ছেলেকেই ভিডিও ক্যামেরা চালানর ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন। একটা ভিডিও ক্যামেরাও কিনে দিয়েছেন। ঘরের পয়সা এখন ঘরেই থাকছে।

আর স্থায়ী ফটোগ্রাফার ত মাঝারি বাবাদেরও আছে। কেননা সাধারণ ভক্তরাও একটা ফটোগ্রাফ কিনতে পারেন। মেলায় এক একজন বাবার দৈনিক হাজার কপিও বিক্রি হয়েছে। এছাড়া বাবার ছবি লাগানো লকেট, আংটি এসব ত আছেই।

উজ্জয়িনীর ওঙ্কার বাবা সব প্রশ্নেরই বেশ সহজ উত্তর দিতে জানেন। বাবার আট ছেলে মেয়ে। সংসার ছেড়েছেন বছর কুড়ি হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এখন পাঁচটা আশ্রম। ওঙ্কার বাবার বক্তব্য হল মানুষ কি সহজে ভাল জিনিশ শুনতে চায়, দেখতে চায়। তোদের সত্যজিৎ রায়ের ছবি থাকতে মানুষ ব্লু ফিলম্ দেখে কেন। তবুও এই সব ভিডিও ক্যাসেট গানের ক্যাসেট কিছু লোক শুনছে। এভাবেই ত মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে। আর আমাদেরও

গঙ্গাসাগরের যীশু ফটো : সোমনাথ ঘোষ

ত আশ্রম চালাতে হবে। এক একটা আশ্রমের খরচ কত ? ভক্তরা কতবার এমনি এমনি টাকা দেবে। সংসারী মানুষ সবসময়ই হিশেব করে। দুটোকেই খেলাতে হবে তো।

ওঙ্কার বাবার ইচ্ছে সাধুসন্তদের জীবন, উপদেশ ইত্যাদি নিয়ে একটি কাল্যার ম্যাগাজিন প্রকাশ করবেন। একটা অফসেট মেশিন কেনার তোড়জোড় করছেন।

গল্পের হাতির পায়ের নিচে থেকে কাটতে কাটতে ইঁদুর একসময় মাথায় পৌঁছেছিল। সেই বাউল গায়কের ইঁদুর কতদূর পৌঁছেছে জানি না। কিন্তু সাধুর কারখানায়যে ইঁদুর ঢুকেছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বাবাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে রজনীশ আর মহেশযোগী। সব বাবারই একবার বিদেশ যাওয়ার শখ। তাই শাদা চামড়ার ভক্তদের বাবাদের কাছে মূল্য অনেক বেশি। বিদেশ মানেই আরও অর্থ, আরও প্রচার। বিদেশে একটা আশ্রম খুলতে পারলেই তো আর কথাই নেই।

মায়েরাও বাবাদের তুলনায় পেছিয়ে নেই। সাংসারিক বুদ্ধি মায়েদের কিছুটা বেশি। তাই উন্নতিও দ্রুত হয়। মীরা মাধব কুম্ভের মা ভগবতী দেবী চারবছর হরিদ্বারে আশ্রম করেছেন। পাঁচখানা ঘর বিশিষ্ট একটা একতলা বাড়ি আশ্রম বলতে এই। বেলা তিনটে নাগাদ মার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তিনটের সময় মা বললেন একটু বস বেটা হাতের কাজ সেরে নিই। মা কাজ সারতে লাগলেন। দুজন ভক্ত এসেছেন। পয়সাওয়ালা মানুষ। মা ফাঁকা জমিতে একটা পোলট্রি গড়ে তোলার প্ল্যান করছেন তাঁদের সঙ্গে। কাজ সেরে এসে মা বললেন জায়গাটা পড়ে আছে, একটা পোলট্রি করতে পারলে আশ্রমের খরচ বেশ কিছুটা উঠে আসবে।

মীরা মাধব কুম্ভ থেকে ফেরার সময় মার প্রধান শিষ্য রামদাস ধরলেন। বললেন, অন্য মায়েদের মত ভগবতীদেবীর প্রচারের ব্যবস্থা নেই। নাহলে দেখতেন মীরা মাধব কুম্ভ এতদিনে কত বড় হয়ে যেত। বললাম প্রচার করছেন না কেন ? উত্তর—অনেক টাকার দরকার। অত টাকা নেই। তবে গোটা কংখল এলাকায় দুহাজার টাকা খরচ করে দেওয়ালে লিখিয়েছি। কিন্তু পাইলটবাবা অনেক আগে থেকে শহরের কাছাকাছি দেওয়ালগুলো দখল করে নিয়েছে।

স্বামী পরমানন্দকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনারা তো ত্যাগী মানুষ, গাড়ি চড়েন কেন স্বামীজি আমার কথায় এতটুকু রাগলেন না, বিচলিত হলেন না। বললেন, "তোর ছেলে যদি ভালবেসে একটা জামা এনে দেয়, কি করবি, ফিরিয়ে দিবি ? ভক্ত তো সন্তানতুল্য। তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় ? বিষয়ের মধ্যে থাকলেই কি আর বিষয়ে মত্ত হতে হয় রে।" বাবার বেশি কথা বলার সময় ছিল না। বাইরে এ্যামবাসাডার হর্ন দিচ্ছিল। বাবা তাড়াতাড়ি গায়ে বুকে খানিকটা পাউডার ছড়িয়ে ঝোল্লা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এখনই মায়াপুর থেকে স্নানের মিছিল বেরোবে। ওখানে বাবার রথ রয়েছে। গাড়ি ছেড়ে রথে উঠবেন। তবে এ রথ যেকেউ টানতে পারবে না। যে সব ভক্তরা বাবার রথ টানবেন তাঁদের ১,০০১ টাকা করে প্রণামী দিতে হবে। বাবা অমৃত স্নানে যাচ্ছেন যে-রথে তাঁর মূল্য আলাদা। বার বছর অন্তর এই দুর্লভ সুযোগ আসে। ১,০০১ টাকা সে হিশেবে কিছুই নয়। তবে যাঁরা রথ টানতে পারবেন না তাঁদের দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। কেন না রথযাত্রার ছবি পাওয়া যাবে। ভি ডি ও ক্যাসেট পাওয়া যাবে। তাছাড়াও রথ, আশ্রমের গেটে রেখে দেওয়া হবে ২৪ ঘণ্টা। খুশি মত প্রণামী দিয়ে রথ স্পর্শ করে প্রণাম করা যাবে। তবে দেখবেন প্রণামীটা যেন লজ্জাকর না হয়।

১০০৮ লক্ষণ চৈতন্যজী—**কী কষ্টে আছেন !** ফটো : মধুসূদন রায়

বাউল গায়ক গাইছেন 'ইঁদুর ঢুকে কেটে দিল সাধুর কারখানা। কাটা সাধু ভবের হাটে অচল দুআনা।' এ গান ঠিক নয়। কাটা সাধুর দামই এখন বেশি। যাতায়াত যোদ মন্ত্রীদের দপ্তর পর্যন্ত।

সরকারের ধর্মাধর্ম

আসলে, কুম্ভের এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। গোটা দেশেই ধর্মের নামে যে জিগির তোলা হচ্ছে, 'বাবা'-রা যেভাবে চুটিয়ে ব্ল্যাক মানির দৌলতে ও প্রসাদে আশ্রমের ব্যবসায় লাভবান, ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, সাঁইবাবার মতো হঠাৎ গজানো 'বাবা'-দের প্রতি প্রশাসনিক পক্ষপাত, আমাদের তথাকথিত সরকারের নানা অনুষ্ঠানে ছড়ানো হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আচারবিধি, রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার এবং সর্বোপরি আমাদেরই ভেতরকার অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক অন্ধতারই প্রকাশ ঘটে কুম্ভমেলার মতো ধর্মীয় ব্যবসার বিপুল অপচয়ে, অকারণ মৃত্যুতে।

আমাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নিহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা তো আছেই। রাজীবের মন্ত্রীসভা গঠন থেকে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গঙ্গা পরিশোধন প্রকল্পের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিরই সচেতন প্রকাশ। গোটা হিন্দী বেল্ট থেকে মোট ২৯ জন মন্ত্রী আছেন রাজীব ক্যাবিনেটে, তার ভেতর ১০ জনই উত্তর প্রদেশের এবং এই ক্যাবিনেটে হিন্দু 'বায়াস' যে কেউই বুঝতে পারবেন মন্ত্রীসভার পূর্ণ তালিকা দেখলে ('প্রতিক্ষণ', ২-১৬ অক্টোবর, ১৯৮৫ দ্রষ্টব্য)। গত ২ এপ্রিল হরিদ্বারে ভাষণে রাজীব তাঁর ছটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার যে তালিকা দেন, তার মধ্যে গঙ্গার পরিশোধন অন্যতম। হরিদ্বারের গঙ্গাকেই দূষণমুক্ত করতে ব্যয় হয়েছে ১৭ কোটি টাকা। পরিবেশ উন্নয়নের দিক থেকে এই সিদ্ধান্তে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু যেভাবে এই প্রকল্পের প্রচার হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দিকে নজর রেখেই করা। গঙ্গা হিন্দুধর্মে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। ২০০ কোটি টাকায় গঙ্গা শোধন, তাই হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু ভোট কেনার প্রকল্প। দিল্লিতে 'প্রতিক্ষণ' আয়োজিত জাতীয় সংহতি বিষয়ক গোলটেবিলে ('প্রতিক্ষণ', ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, দ্রষ্টব্য) ভারতের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী পি. এন. হাকসার বলেছিলেন, আমরা বলি যদিও, আমাদের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। হাকসার বলেন, "আমাদের সরকারি কাজকর্মে ধর্মীয় আবহ ছড়ানো...পাবলিক সেক্টর চত্বরে মন্দির গড়ে উঠতে দেখি। অসংহতির পক্ষে এগুলোই তো যথেষ্ট।...জ্যোতিষদের মতামত নিয়ে সরকারি ভূমিকা ঠিক করা হয়। এখানেই অসংহতির শুরু।"

কিন্তু ধর্মের এই দেশজোড়া লাভজনক ব্যবসায়ের প্রধান দায়িত্ব বর্তায় আমাদেরই ওপর, আমাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, কূপমণ্ডুক মনোবৃত্তি, চিন্তার সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়েই ধর্মের বাজারে এত বোলবোলাও ব্যবসা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে, বাজারের সমস্ত পঞ্জিকা ভুল (রমাতোষ সরকারের সাক্ষাৎকার দেখুন)। বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে, জ্যোতিষ অবিজ্ঞান নয় কেবল, অপবিজ্ঞান। বিজ্ঞান জানিয়েছে আমাদের, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই, পাথর-রত্নের কোনো প্রভাব মানব শরীরে পড়ে না। তবুও আমরা গ্রহ নক্ষত্র দেখে বানানো রীতিবিধি মেনে অমুক মুহূর্তে স্নান করি, তমুক তীর্থে জল ঢালি, জ্যোতিষীকে হাত দেখাই, রত্ন ধারণ করি। বাংলার ১৩০৫ সালে 'প্রদীপ' সাময়িকীতে 'ফলিত জ্যোতিষ' নামে এক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লেখেন, "একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায় প্রশংসনীয় নহে।" রামেন্দ্রসুন্দর জ্যোতিষকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক মনে করতেন। প্রায় বছর ৮০ আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যদি নক্ষত্র আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে ফেলুক, তাতে ক্ষতি নেই। যদি কোনো নক্ষত্র আমাদের জীবনকে বিব্রত করেও তাতে কিছু যায় আসে না। আপনারা এটা জানুন যে, জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণত একটি দুর্বল মনের লক্ষণ। সুতরাং, মনে এই দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখিয়ে ভালভাবে খাওয়া আর বিশ্রাম করা।"

১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে 'দ্য হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ১৮৬ জন বিজ্ঞানীরা (১৮ জন নোবেল বিজয়ীসহ) এক স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, "গ্রহনক্ষত্রগুলোর অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে তারা পৃথিবীর ওপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার

পরিমাণ অতি নগণ্য অতএব জন্মমুহূর্তে গ্রহনক্ষত্রদের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে—এমন ভাবার কোনো যুক্তি নেই। এও সত্য নয় যে ঐ বহুদূরের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান কোনো বিশেষ দিন বা সময়কে কোনো বিশেষ কাজের পক্ষে সুবিধেজনক করে তুলছে।

...মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায়...ভাবতে চায়, পৃথিবী বহির্ভূত কোনো অলৌকিক শক্তিই বুঝি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে আমাদের ভবিষ্যৎ নিজেদের ওপর নির্ভর করে, কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর নয়।

আমরা অত্যন্ত বিচলিত কেননা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, নামকরা সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তক-প্রকাশক পর্যন্ত ঠিকুজিকোষ্ঠি, রাশিবিচার, ভবিষ্যৎবাণীর মহিমা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।...এতে মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ধ্যানধারণা, অন্ধবিশ্বাস বেড়েই যায়। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষচর্চার ধ্বজাধারীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

আমরা কিন্তু কোনো চ্যালেঞ্জ করি নি। বরং একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে আরও বেশি করে আত্মসমর্পণ করছি। এই অন্ধ আত্মসমর্পণ থেকেই আমরা বৌবাজারের জ্যোতিষ পণ্ডিতদের কাছে হত্যে দিই ছেলেমেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে কোন বিষয় নেবে তা জানতে ; নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি হাজার হাজার টাকার নীলা, আর পলা পরে ; সাঁইবাবার ভণ্ডামিতে বিশ্বাস করে অকারণ ভজন করি ; রাস্তার ধারে রাখা যেকোনো সিঁদুর লাগানো পাথরে প্রণাম জানাই ; গুরুভজনায় মাতি আমাদের এই আত্মসমর্পণের সুযোগ নিয়েই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুল-গল্পে-ভরা রাশিফল ছাপে ভারতের প্রায় প্রতিটি পত্রপত্রিকা—কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদে। আর এই দুর্বলতার সুযোগেই বেড়ে ওঠে পুজোর ব্যবসা, স্মাগলিং আর কালো টাকার প্রশস্ত চ্যানেল তৈরি হয়।

ধর্মের টাকাকড়ি

গত বছর মধ্য কলকাতার একটি বিলাসবহুল শ্যামাপুজোর জন্য নাকি ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে ঐ অবাঙালি ঠিকাদারের চাহিদা ছিল দেড় লক্ষ টাকা। সে টাকা তিনি পেয়েছিলেনও। কিন্তু তার খরচ হয়েছিল ৮২ হাজার টাকা

ঐ পূজার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মধ্য কলকাতার এক 'দাদা' ব্যক্তি যিনি এখন কালোয়াতি ও প্রকাশনার ব্যবসায়ে নেমেছেন। তাঁর শ্যামাপূজা ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রীসভার আমলে। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে পুজো বাজেট ছিল ৬০/৬৫ হাজার টাকা। সেই 'দাদা'-র পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক কংগ্রেসী নেতা, এম. পি., এম. এল. এ. তো বটেই, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা একবার উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিশেবে। বলা বাহুল্য, বাজেটের একটা বড় অংশ ও বিভিন্ন স্টল মালিকদের বিক্রির কমিশন সেই 'দাদা'-র পকেটেই যেত। একাধিক নামজাদা সাংবাদিক তাঁর স্মারক পত্রিকার লেখা সংগ্রহ থেকে সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। ঠিকাদার দিয়ে পুজো এক অভিনব ব্যাপার—অবশ্য বিজ্ঞাপন ও চাঁদা বাবদ গত বছর ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উঠেছিল।

অন্য এক 'দাদা'-র জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় জরুরি অবস্থার সময়। পাড়া থেকে উৎখাত হবার আগের বছরেও সেই ব্যক্তির জগদ্ধাত্রী পুজোর খরচ হয়েছিল ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। অবশ্য জগদ্ধাত্রী পুজোই তার একমাত্র ব্যবসা ছিল না। হরি সাহা বাজারে তোলা থেকে নিয়মিত ভালো টাকা আয় হত, তার সঙ্গে কালোয়াতি কারবার।

অনেকে হয়ত জানেন না যে এখন দুর্গাপুজোর অভিনবত্বে কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে বনগাঁ, কাঁচরাপাড়া। বনগাঁয় অন্তত আটটি পুজো হয় যেখানে পুজো পিছু ব্যয় হয় দেড় লক্ষ টাকার বেশি।

অথচ আট-নয় বছর আগে বনগাঁয় এমন পুজো ছিল না যার পিছনে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হত। এর কারণ একটিই। বনগাঁ এখন চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য। আবার একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অনুন্নত মহকুমা শহর বলতে বনগাঁকেই বোঝায়। আশপাশের হাটে হাটবারে গেলেই বোঝা যায় যে সাধারণভাবে এখানকার লোক কত নিঃস্ব। অথচ কলকাতা থেকে মাত্র ৫২ মাইল এর রেলপথে দূরত্ব।

পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত ছাড়াও আরো একাধিক সীমান্ত রয়েছে বাঙলা দেশের সঙ্গে যা বনগাঁ শহর থেকে পাঁচ-আট মাইলের মধ্যে। বাঙলা দেশ থেকে অনবরত চালান হচ্ছে বিদেশি বিলাসবহুল দ্রব্য—টেপরেকর্ডার, সিনথেটিকস, ক্যামেরা, ঘড়ি, রঙিন টিভি। এছাড়া ইলিশ মাছের চালান তো আছেই। এসব কাজে নানা শ্রেণীর লোকজন যুক্ত।

বনগাঁয় এই 'ধর্মপরায়ণ' চোরাচালানকারীদের পিছনে পুলিশের বড় কর্তাদের মদত রয়েছে। ছ-সাত বছর আগে (যখন বিলাসবহুল দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছে সবে) বনগাঁয় এক বিরলদৃষ্ট পুলিশ ইনসপেক্টর (বা হয়ত সাব ইনসপেক্টর) বদলি হন শান্তনু চ্যাটার্জি। ইনি এক মাসের মধ্যে ডাকাত, চোরাচালানকারী ও মাস্তানদের শায়েস্তা করেন। কয়েকমাস পরেই শান্তনু চ্যাটার্জি বদলি!

কাঁচড়াপাড়ায় গতবার একটি দুর্গাপুজোয় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। প্রতিমার দাম পড়েছে ৬০ হাজার টাকা। এছাড়া মণ্ডপসজ্জা, আলোর রোশনাইয়ের খরচ আছে। নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়া এলাকা ওয়াগন ব্রেকারদের বেহেশ্‌ত।

পুজোগুলোতে কিরকম খরচের বহর ? তার বন্টনই বা কিরকম ? এলোমেলো নমুনা সমীক্ষায় হিশেবটা এই রকম। পার্ক সার্কাস সার্বজনীন দুর্গোৎসব-এ গত বছর শিল্পী রমেশ পালের তৈরি ১২ ফুট উঁচু প্রতিমার ব্যয় ২০ হাজার টাকা, আলোকসজ্জা ও মণ্ডপে ব্যয় ৬৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। কাজের বেলায় এ পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। কলেজ স্ট্রীটের দুর্গাপুজোয় ব্যয় আড়াই লক্ষ টাকা। বনেদী পুজোয় খরচটা অন্য ধরনের। বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবে ১৯৮৩ সালে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বাজেট হলেও খরচ শেষ অবধি ১ লক্ষ ৯০ হাজার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৫ সালে বাজেট ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। খরচ শেষ অবধি ২ লাখ টাকায় ঠেকেছিল। বাগবাজারে ২১ ফুট উঁচু প্রতিমার জন্য জিতেন পালের ছেলেরা নিয়েছিলেন ১১ হাজার টাকা। মণ্ডপের খরচ ৬৭০০০ টাকা, আর আলোকসজ্জা ৭০০০ টাকা। আলোকসজ্জায় খরচ অনেক কম—সাবেকী ধারা বজায় রাখার জন্যেই। ৬৭ বছর আগে এ পুজোয় খরচ হয়েছিল ১১ টাকা ৫ আনা। পূর্ব পুঁটিয়ারী ও পশ্চিম পুঁটিয়ারীর সংযোগস্থলের কাছাকাছি একটি দুর্গাপুজোয় গত বছর খরচ হয়েছে ৮০ হাজার টাকা—উদ্যোক্তাদের মধ্যে পাতালরেলের ঠিকাদারদের থেকে মাস ভাতা পাওয়া একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে। বালিগঞ্জে একডালিয়া এভারগ্রীন-এ ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে বাজেট ছিল যথাক্রমে ৮৫ হাজার টাকা ও এক লক্ষ টাকা। কিন্তু সাবেকী সিমলা ব্যায়াম সমিতির বাজেট ৩৫ হাজার টাকা (আসল খরচ তার মধ্যেই থাকে)।

জ্যোতিষ—বোল বোলাও কারবার ফটো স্বপন বক্সী

কলকাতায় ১৯৮৫ সালে পুলিশ ও পুরসভার অনুমোদন হিশেবে ১,০২১টি বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয়েছে। ১৯৮০ সালে দুর্গাপুজোর সংখ্যা ছিল ১,১০০-র কাছাকাছি। কেবল দক্ষিণ কলকাতাতেই গত বছর ৩৩৭টি দুর্গাপুজো হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে গড়ে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এক একটি পুজোয়, তাহলে মোট পুজো ব্যয় ২ কোটি টাকারও বেশি।

কলকাতা ও তার ৫০/৫২ মাইল ব্যাসার্ধ-অন্তর্গত অঞ্চলে বারোয়ারি পুজোগুলিতে মোট খরচ ১০ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এই টাকায় যদি একটা চা বাগিচায় খরচ করা যেত (নতুন চারা লাগানোর জন্য, বা নতুন জমিতে চা পাতা বোনার জন্য) তাহলে ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হত।

(এই রিপোর্ট তৈরিতে 'উৎস মানুষ সংকলন'-এর 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ, সমাজ' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।)

কংগ্রেসে বিদ্রোহ : আশঙ্কা না আতঙ্ক ?

২৭ এপ্রিল প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ছ-বছরের জন্যে বরখাস্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বর্তমান রাজ্যসভাসদস্য এ· পি· শর্মা, বর্তমান লোকসভা সদস্য ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্ মিশ্র ও আসামের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রকাশ মেহরোত্রাকে সাময়িকভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে সরানো হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী এই সিদ্ধান্ত নেন ও কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জি· কে· মুপানার এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান।

এই সব বরখাস্ত কংগ্রেসের দলীয় ব্যাপার। কংগ্রেস সংবিধানে সভাপতিকে এ-রকম বরখাস্তের অধিকার দেয়া আছে। সুতরাং রাজীব গান্ধী তাঁর ক্ষমতার মধ্যেই কাজ করেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস (ই) বর্তমানে আমাদের শাসকদল, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসভায় তাদের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সংসদীয় রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি এই দলের ও এই দলের সভাপতির আনুগত্য কতখানি তার ওপর আমাদের রাজনৈতিক জীবন অনেকটা নির্ভর করে। কংগ্রেস-সভাপতি রাজীব গান্ধী তাঁর দলের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়েছেন সেটা বিচার্যই শুধু নয়, প্রধান বিচার্য।

কংগ্রেস সভাপতি যে-কোনো মুহূর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকতে পারেন। সে-সভায় সমস্ত সদস্যের উপস্থিতির সুযোগ নাও থাকতে পারে। যাঁদের পাওয়া যায়, তাঁদের নিয়েই জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দলের যে-কমিটির সভায় রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর কাছে দলের নেতা হিশেবে রাজীব গান্ধীর নাম সুপারিশ করা হয় তাতে তিনজন সদস্যমাত্র উপস্থিত ছিলেন।

চার-চারজন সদস্যকে বরখাস্তের জন্যে কংগ্রেস সভাপতি নাম-কো-ওয়াস্তেও কোনো মিটিং ডাকেন নি। অথচ রাজীব, অর্জুন সিং, অরুণ নেহরু এঁরা সেদিন নিজেদের মধ্যে বহু কথাবার্তার শেষেই এই সিদ্ধান্তে আসেন। অর্থাৎ রাজীব গান্ধী ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের গৃহীত সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সভাপতির সিলের জোরে দলের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এমন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও তাঁদের মত প্রকাশ করতে পারলেন না। সংসদীয় রীতি-পদ্ধতিতে এ কাজ করা চলে না।

দ্বিতীয়ত—যাঁরা বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের কাউকেই আগে অভিযোগপত্র দিয়ে জবাব চাওয়া হয় নি, যেমন অন্তত কিছুটা হয়েছিল গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সোলাংকির ক্ষেত্রে। অভিযুক্তকে জবাব দেবার সুযোগ না দেয়া স্বাভাবিক ন্যায়নীতির বিরোধী। এমন কি দলীয় সভাপতি হিশেবেও রাজীব গান্ধী এই ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করতে পারেন না।

তৃতীয়ত—যাঁরা বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের জানানোর আগেই সাংবাদিকদের খবরটা জানানো হয়। এটাও গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতির বিরোধী।

চতুর্থত—কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ থেকে এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে সংক্ষিপ্ততম বাক্যেও। সেটাও সভাপতির বয়ানে নয়, মুপানারের মুখ দিয়ে সারা হয়েছে। এঁরা "দলবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন" এবং "শ্রী মুখার্জি পার্টির সম্মান নষ্ট করার জন্যে পরিকল্পিত পথে চলছিলেন।"

কিন্তু কী এমন হয়েছিল যে লোকসভায় চার শতাধিক সদস্যের নেতা রাজীব গান্ধীকে এমন কাজির বিচারে চার-চারজন সদস্যকে কোতল করতে হল।

কাগজে-পত্রে বলা হয়েছে—কমলাপতি ত্রিপাঠীর চিঠি নিয়ে রাজীববিরোধীরা যাতে জোট বাঁধতে না পারে সে জন্যে রাজীব গান্ধী পূর্বাহ্নেই এদের শাস্তি দিলেন এবং সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের ভয় দেখালেন।

রাজীবের হিশেব যদি তাই হয়, তা হলে ত আরো উচিত ছিল বিক্ষুব্ধদের পরিকল্পিত কর্মসূচির অন্তত প্রথম স্তরটি পর্যন্ত এগুতে দেয়া। তা হলে এঁদের পার্টিবিরোধী কাজের প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া যেত।

দ্বিতীয়ত—যাঁর চিঠি নিয়ে এত, তাঁকে কিছুই বলা হল না, অথচ, যাঁরা এই চিঠির পেছনে আছেন বলে সন্দেহ, তাঁদের শাস্তি দেয়া হল। রাজীবের ত উচিত ছিল এমন সুযোগ তৈরি করা যাতে সন্দেহভাজনরা প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য হন।

তা হলে ?

আসলে রাজীব ভয় পেয়েছেন। সেই ভয়ের জন্যেই তিনি রাজনৈতিক দল পরিচালনার ঐ কূটচালের মধ্যে যেতে চান নি—ধরো তক্তা মারো পেরেক করে প্রণব মুখার্জির মুণ্ডু কাটলেন আর বাকি তিনজনকে ঝুলিয়ে রাখলেন। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ এ-রকম কাণ্ড করে বসে।

কিন্তু ভয় কেন ?

লোকসভা নির্বাচনের পর বিধানসভাগুলির নির্বাচনে ও তারও পর উপনির্বাচনগুলির ফলে এটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে যে ভারতের জনসাধারণ রাজীব গান্ধীকে রাজীব গান্ধী হিশেবেই দেখছে। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এটা আরো পরিষ্কার যে কংগ্রেস(ই) এখন যাকে বলে হিন্দি বলয়, তার একটি আঞ্চলিক দল। অন্য রাজ্যগুলিতে লোকসভা-আসনে কংগ্রেসের কিছু প্রার্থী ইন্দিরা-হত্যার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় জিতলেও, সেই রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে কংগ্রেস তার প্রাধান্য খুইয়েছে। ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা—এই হচ্ছে রাজীবের রাজনৈতিক ভারত। এর ভিতর হরিয়ানা এখন অনিশ্চিত। কমলাপতি ত্রিপাঠী ও শ্রীপত্ মিশ্র মিলে সেই রাজীবের ভারতের কেন্দ্রবিন্দু উত্তরপ্রদেশের রাজীব-সমর্থনে যদি ফাটল ধরান তা হলে বাকি কটা রাজ্যে ফাটল ধরতে আর কতক্ষণ ?

সুতরাং যে-মুহূর্তেই কংগ্রেসের বিক্ষোভ হিন্দি বলয়ে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্তে রাজীব আতঙ্কগ্রস্তের মত আঘাত করেছেন, যাতে সবাই ভয় পায়। রাজনৈতিক আঘাতের রীতিপদ্ধতি, নীতিরীতি মেনে চলার ধৈর্য আর সময় যেন তাঁর আর ছিল না।

কিন্তু এত ভয় পাওয়ার আছেটা কী ?

একদিকে পাঞ্জাব। পাঞ্জাবচুক্তি এখন প্রতিদিন রক্তের গভীরতর ফাঁকে ডুবে যাচ্ছে। ভজনলালের এক বক্তৃতায় বোঝা যায় তিনি শিখবিরোধী হিন্দু ভোট সংগ্রহে এখন দেবীলালের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। পাঞ্জাবচুক্তিকে রক্ষা করতে রাজীব প্রথমে বার্নালা-সরকার গড়ে দিলেন, রিবেইরোকে পুলিশ-প্রধান করে পাঠালেন, সিদ্ধার্থশঙ্করকে রাজ্যপাল করলেন। কিন্তু এখনো চণ্ডীগড় হস্তান্তরের মত আপাত-বিরোধহীন সিদ্ধান্ত কার্যকর করা গেল না। পাঞ্জাবের কোন শহরে যে কখন কারফিউ জারি করতে হবে তা কেউ জানে না। পাঞ্জাব চুক্তির ব্যর্থতার ওপর রাজীব গান্ধীর কোন মূর্তি তৈরি হবে।

আর একদিকে মুসলিম নারী আইন।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে এত বড় পরাজয় ত কংগ্রেসিদের কেউ কেউ মেনে নাও নিতে পারেন। কংগ্রেসে এ-পর্যন্ত এমন কোনো প্রধান নেতা-হন নি যাঁকে কংগ্রেসের ভিতরে এক বিরোধী পক্ষে লড়তে হয় নি। রাজীব নেতা হয়েছিলেন সর্বসম্মতভাবে। দলের ভিতরে প্রথম একটি বিরোধিতার মুখোমুখিও তিনি হতে পারলেন না। □

প্রণব মুখোপাধ্যায়

দেবেশ রায়

দেশকাল

ছোট প্রেসের কর্মীরা নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে আছে

পশ্চিমবঙ্গে মোট কত ছাপাখানা আছে, তার সঠিক হিশেব খুঁজে বের করা শক্ত। রাজ্য শ্রম দপ্তরের একটি হিশেবে (১৯৮০-৮১) এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রায় ১৬ হাজার মানুষ। অন্য একটি হিশেবে, এ-রাজ্যে ছাপাখানা আছে সাড়ে ছয় হাজারের মতো। ছাপাখানার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শিল্প এবং সরকারি-বেসরকারি বড় বড় ছাপাখানাগুলো ধরলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। তবে আমাদের আলোচনা এখানে কলকাতার নিতান্ত ছোট ছাপাখানা নিয়ে। কর্মী-সংখ্যা এখানে তিন-চার জনের বেশি নয়। কলকাতার বইপাড়া-বটতলা ছাড়াও অলিতে-গলিতে এরকম ছাপাখানা অজস্র ছড়িয়ে আছে। অত্যন্ত রুগ্ণ এই শিল্প। সমস্ত দিক দিয়ে অসংগঠিত এই শিল্পের শ্রমিকরা।

মজুরি

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে যখন এ-রাজ্যে ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়, সেই সময় কর্মীদের একাংশের উদ্যোগে 'প্রেস কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম মোর্চা' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠনের হিশেবে, ছোটো ছাপাখানা কর্মীদের শতকরা ৯০ ভাগেরই মাসিক আয় ২০০ টাকার কম। সাত বছর পর পঁচাশির ডিসেম্বরে হিশেব নিলে দেখা যাবে, এখন তাঁদের গড় মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৩০০ টাকার মতো। এর কমও আছে, বেশিও আছে। এরকম দোটানাভাবে যে বলতে হচ্ছে, তার কারণ—মজুরি-হারের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য ওঠা-নামা আছে। ১৬ নম্বর পটুয়াটোলা লেনের একটি ছাপাখানায় কর্মীরা কাজ করেন দিনে ৮ টাকা মজুরিতে। সামান্য এগিয়ে নরসিং লেনের সরু গলির ভেতর একটি ছাপাখানায় দেখা যাবে, কর্মীরা পাচ্ছেন দিনে ১০ থেকে ১২ টাকার মতো। আবার ৩৩বি রামমোহন রায় সরণীর ওপর ছোট্ট একটি প্রেসের মধ্যে বসে কাজ করছেন যে বৃদ্ধ, তাঁর মাসিক আয় ৪০০ টাকা। সামান্য হেরফেরে যা দেখা যাচ্ছে, তার একটা সহজ-সরল কারণ কর্মীরা কেউ কেউ দীর্ঘদিন কাজ করছেন। স্বভাবতই মজুরি বেড়ে কিছু বেশি হয়েছে। কিন্তু বড় রকম ফারাক যেটা হচ্ছে, তার কারণ বিবিধ। এক-এক করে বললে এরকম দাঁড়াবে

ক ৪০০ টাকার বেশি যাঁদের মাসিক আয়, তাঁরা—
১) অনেকেই কম করে ১৫/২০ বছর ধরে কাজ করছেন। ২) প্রতি বছর বেতন বাড়ানো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ১০ টাকা করে হলেও অন্তত বেড়েছে। ৩) ১৯৭৮-এর ধর্মঘটের পর ২৫ টাকা করে এককালীন বেড়েছে। ৪) যে-প্রেসে কাজ করেন, সেখানে মোটামুটি নিয়মিত কাজ আসে; এবং ২০০ টাকার কমে ফর্মা ছাপা হয় না।

খ ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে যাঁদের মাসিক আয়, তাঁরা—
১) অনেকেই অল্পদিন কাজ করছেন। ২) প্রতি বছর বেতন বাড়ানো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ৩) নিয়মিত কাজ আসে না। এলেও কম রেটে ১৭৫-৮০ টাকায় ফর্মা ছাপাতে হয়। ৪) মালিকের নিজের মেসিন নেই। বাইরে থেকে ছাপাতে হয় বলে লাভ কম হয়। অতএব শ্রমিকের মজুরিও কমে। ৫) কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ১৯৭৮-র পর এককালীন ২৫ টাকা বাড়ানো মালিকের-পক্ষে সম্ভব হয় নি; কর্মীরা সেটা মেনে নিয়েই কাজ করছেন। এছাড়াও আরও কতগুলি কারণ আছে। সেগুলো একটু বিশদ করে বলা দরকার

এক ছোট ছোট ছাপাখানায় সাধারণত দু-ধরনের ছাপার রেট আছে। ইংরেজী-বাংলা ভাউচার, বিল, দরখাস্ত ইত্যাদি ছাপার কাজকে বলা হয় 'জব ওয়ার্ক'। এই কাজে নানা ধরনের টাইপ (৮ পয়েন্ট থেকে শুরু করে ২০ পয়েন্ট পর্যন্ত) ব্যবহার হয়। হরফগুলিকে বিশেষ মাপজোখ করে বসাতে হয়—দক্ষতা বেশি লাগে; অতএব মজুরিও বেশি। যেসব প্রেস কেবলমাত্র 'জব' কাজই করে, তাদের কর্মীদের মজুরি তাই বেশি। গল্প-উপন্যাসের বই, পত্র-পত্রিকা ছাপায়—ওঁদের ভাষায় 'রানিং' কাজে—মজুরি কম। তাই যে-সব প্রেসে দু ধরনের কাজই হয়, সেখানে কিন্তু শ্রমিকের মজুরি একই থাকে, কমে-বাড়ে না

দুই পাঠ্যবই ছাপার রেট বেশি। কর্মীদের মজুরিও তাই একটু বেশি হয়। বিশেষত যাঁরা গণিতের বই কম্পোজ করেন, তাঁদের মজুরি সব সময়ই বেশি হয়। তবে ছোট ছোট ছাপাখানা যেখানে লাভের কথা ভেবে পাঠ্যবইয়ের কাজ নেয়, কিন্তু সময়ে পাওনা আদায় করতে পারে না, সেখানে শ্রমিকের মজুরি কমে যায়, টাকা পাওয়াও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনেক ছোট প্রেস তাই পাঠ্যবইয়ের 'রিস্ক' নিতে চায় না।

তিন মালিকের নিজের মেসিন থাকা-না-থাকার ওপর তাঁর লাভ নির্ভর করে। শ্রমিকের মজুরিও সেইমতো কম-বেশি হয়।

চার মজুরি অনেকটাই নির্ভর করে মালিকের সামর্থ্য, কাজ পাওয়া-না-পাওয়া, শ্রমিকের কাজের গুণাগুণ ('কোয়ালিটি')—এইসব শর্তের ওপর। ছোট ছাপাখানা এমনই একটি শিল্প, যেখানে নেহাতই মধ্যবিত্ত মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের তেমন কোনো শ্রেণীভেদ থাকে না। 'মানুষ হিশেবে' মালিক কেমন, সেটা দিয়েও অনেক কিছু নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ফটো স্বপন বকাস

বেশিভাগ প্রেসেই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া

ওভারটাইম, বোনাস ইত্যাদি : ছাপাখানার কর্মীদের প্রায় সকলকেই ওভারটাইমের ওপর নির্ভর করতে হয়। ওভারটাইম কাজে ডবল হারে মজুরি পাওয়া যায় না; তবে 'তিন ঘণ্টায় আধ রোজ আর পাঁচ ঘণ্টায় এক রোজ' এই হারে ওভারটাইমের মজুরি ঠিক হয়। তার মানে একজন শ্রমিক যদি নটা-পাঁচটা আটঘণ্টা কাজের পর আরও তিন ঘণ্টা কাজ করেন, তাহলে তিনি দেড় রোজের মজুরি পান। আর যদি একেবারে রাত দশটা পর্যন্ত খেটে পাঁচ ঘণ্টা ওভারটাইম করেন, তাহলে তাঁর পাওনা হয় পুরো দু-রোজের মজুরি।

এছাড়াও আর একধরনের চুক্তিতে ওভারটাইম করানো হয়। হঠাৎ কোনো বড় কোম্পানির অর্ডার, ভোটের কাগজপত্র ছাপার মতো সরকারি কাজ এসে গেলে এই চুক্তিতে কাজ হয়। তখন মজুরি ঠিক হয় লাইনের হিশাবে। ১০০ লাইন গাঁথতে পারলে বার-পনের এমনকি কুড়ি টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এটা অনেকটাই নির্ভর করে কত টাকার কাজ পাওয়া গেছে তার ওপর। এছাড়া টাইপের মাপের

('মেজারমেন্ট') ওপর নির্ভর করে। চব্বিশ-এম ১০ টাকা, ছাব্বিশ-এম ১২ টাকা, তিরিশ-এম ১৫ টাকা—এরকম রেট চালু আছে। এইসব কাজে দায়িত্ব অনেক বেশি। মজুরিও তাই বেশি। কাজের চাপ বেশি হলে 'ঠিকে'শ্রমিকও নেওয়া হয়। লাইনের হিশেবেই তাদের মজুরি ঠিক হয়।

শ্রমিক নিয়োগের সময় কয়েকদিন 'ট্রায়াল' দিয়ে নেওয়া হয়। কাজের গুণাগুণ দেখে মজুরি ঠিক হয়। চাকরির স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। নরসিং লেনের একটি প্রেসের কর্মীরা জানান, তাঁদের ছাপাখানায় কিছুদিন অন্তর অন্তরই লোক বদল হয়। মালিক যে-কোনোদিন তাড়িয়ে দিতে পারে। শ্রমিকদের কোনো সংগঠন নেই ; অতএব কিছু করারও নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো একটা ছাপাখানাই চলে 'ফুরন' শ্রমিক দিয়ে। ৪০০ নম্বর রবীন্দ্র সরণীর বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস এরকম একটি প্রেস, সেখানে কর্মচারীরা সকলেই ফুরনে কাজ করেন। বৃদ্ধ গুপীনাথ দাস মেসিনম্যান। ১০০০ কপি ছাপলে পান তিন টাকা।

আমাদের দেখা ছোট ছাপাখানায় সাধারণত বছরে পাঁচ-দশ টাকা করে হলেও বেতন কিছু বাড়ানো আর এক মাসের বেতন বোনাস দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু বাজার খারাপ থাকলে এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ১৬ পটুয়াটোলা লেনের কর্মীরা যেমন গত বছর ৫০ টাকা বোনাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। ১৯৭৮-র পর তাঁদের যে এককালীন ২৫ টাকা বাড়ে নি, সেটাও তাঁরা মেনে নিয়েছেন এই বিবেচনায় যে, মালিকের সামর্থ্য নেই।

ছোট ছাপাখানার শ্রমিকদের কাছে 'ডি এ' শব্দটি একটি ছোট্ট স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। প্রেস মালিকদের সংগঠন 'মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছাপাখানার শ্রমিকরাই কেবল ডি এ দাবি করেন। কিন্তু এরকম প্রেসের সংখ্যা এরাজ্যে বড় জোর দেড় হাজার। বেশির ভাগ ছাপাখানাতেই মালিক যেমন কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেই শ্রমিকরাও তেমনি কোনো ইউনিয়নের সদস্য নয়। ফলে ডি এ-র প্রসঙ্গটি ওঠেই না।

কাজের পরিবেশ : আলোবাতাসহীন, স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। চারদিকে কাঠের কেসে ঠাসা হরফ। ছোট ছোট টুলের ওপর বসে ঝোলানো চড়া আলোর নিচে ঘাড় কুঁজো করে কাজ করে যাচ্ছেন কর্মীরা। ছোট ছাপাখানার এই চিত্র আমাদের সকলেরই দেখা আছে। শহরে-মফস্বলে সর্বত্রই ছাপাখানার কাজের পরিবেশ এই রকম। গলির ভেতর কোনো বাড়ির একতলায়, হয়ত বাথরুমের পাশেই প্রেস। কাজ করেন তিন-চারজন। সকাল আটটা কি নটায় ঢোকেন, বেরন সন্ধে সাতটা-আটটার সময়।

সীসে অ্যান্টিমনি আর টিন দিয়ে তৈরি ছাপার হরফ। কম্পোজের কাজে কাঁচা সীসের পাতও ব্যবহার করতে হয়। সীসের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা কর্মীরা যে একেবারেই জানেন না, তা নয়। সীসে লেগে ক্ষত বিষিয়ে যেতে পারে—তাঁদের জানা আছে। তাই কেটেকুটে গেলে ডেটল বা 'লাল ওষুধ' লাগিয়ে নেন। মালিকরাও এর থেকে বেশি সচেতন নন। ছাপাখানা-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের এই দিকটি নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এই শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত এমন একজনের মুখে শুনেছি, অকালে দাঁত পড়ে যাওয়ার ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে খুবই লক্ষ্য করা যায়। আর বটতলার এক প্রবীণ শ্রমিক বলেন, যখন পা-মেসিন ছিল, অনেকেরই বুকের রোগ আর হজমের রোগ দেখা দিত।

বছরে ৫২টি রবিবার আর পুজো নিয়ে আরও ২৪ দিন এঁদের ছুটি। অনেক সময়ই ছুটির দিনে ওভারটাইম করেন।

ছাপাখানার কর্মীদের মধ্যে মেদিনীপুরের লোকই বেশি দেখা যায়। এছাড়া হাওড়া-হুগলী-চব্বিশ পরগনার মানুষও আছেন। এঁরা বেশির ভাগই আসেন মফস্বল থেকে, ট্রেনে। কর্মীদের মধ্যে নারীরাও আছেন। তবে বই-বাঁধাইয়ের কাজে নারীদের সংখ্যা বেশি।

আটাত্তরের ধর্মঘট : ১৯৭৮-এর ১৩ ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবাঙলার ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়। চলে ৩৩ দিন, কোনো কোনো জায়গায় তার চেয়েও বেশি। 'প্রেস কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম মোর্চা' এককালীন ৮০ টাকা বৃদ্ধি দাবি করেছিলেন। অন্যদিকে মালিকদের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গের প্রেস কর্মীদের বেতন বিহার-ওড়িশা-আসাম-তামিলনাড়ুর কর্মীদের থেকে বেশি। সুতরাং এই দাবির পিছনে কোনো যুক্তি নেই। এটা মেনে নেওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে বড় মালিকরা চেয়েছিলেন, সমস্ত ধরনের শ্রমিকদেরই প্রথম বছরে ২৫, দ্বিতীয় বছরে ৩০ এবং তৃতীয় বছরে ৩৫ টাকা—এইভাবে বাড়ানো হোক এবং এই ব্যবস্থা তিন বছরের জন্যে চালু থাকুক। তাঁরা ন্যূনতম মজুরি আইন মেনে নিতে রাজি আছেন, যদি সব ছাপাখানায় তা প্রয়োগ করা হয়। স্বভাবতই ছোট মালিকদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এককালীন ২৫ টাকা বাড়াতে হলে, সেটাই তাঁদের পক্ষে বোঝা হয়ে যাবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা/১১ ও ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯)।

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে পরপর কয়েকটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর সরকারের পক্ষ থেকে এরকম একটি ফর্মুলা ঠিক করে দেওয়া হয় যেসব প্রেসে কর্মী সংখ্যা ৯-এর মধ্যে সেখানে 'অ্যাড-হক' হিশাবে ২৫ টাকা বাড়বে। কর্মীসংখ্যা ১০ থেকে ২৯-র মধ্যে হলে ৩২ টাকা, ৩০ থেকে ৪৯-র মধ্যে হলে ৪০ টাকা ইত্যাদি। কর্মচারী মোর্চা এই ফর্মুলাকে স্বাগত জানিয়ে ১৬ জানুয়ারি থেকে ধর্মঘট তুলে নেয় ; সরকারও সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে দাবি করেন, কিন্তু মালিকদের সংগঠন মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রেস মালিক কনভেনশন এই ফর্মুলার বিরোধিতা করে জানান, এর ফলে প্রেস-শিল্প 'রুগ্ণ' হয়ে পড়বে। (স্টেট্সম্যান/১৬. ১. ৭৯)। কার্যত দেখা যায়, অনেক ছাপাখানাতেই ধর্মঘট চলছে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে মাত্র ৮০০ প্রেস খোলে। কোনো কোনো জায়গায় মোর্চা-সদস্যদের একাংশ জোর করে প্রেস আবার বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে অভিযোগ করা হয়, মালিক স্রেফ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েই প্রেস খুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কম মজুরিতেই কাজ শুরু করেছে এরকম প্রচার চলতেই থাকে। মোর্চার নেতৃত্ব নিয়ে আর. এস. পি. আর সি. পি. এদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। ফলত শ্রমিকরা, যাদের বেশির ভাগই সচেতনভাবে কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন, ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

মালিকদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। একদল মনে করেন, কর্মীসংখ্যাকে ফর্মুলার ভিত্তি হিশাবে নেওয়াটা ঠিক হয় নি। প্রেসের সামর্থ্য, মেসিন থাকা-না-থাকা ইত্যাদি শর্ত মনে রাখা উচিত। অন্যদিকে ছাপাখানা খুলতে উৎসুক নিতান্ত ছোট মালিকরা অসহায়ভাবে কর্মীদের জানান, এককালীন ২৫ টাকা বাড়ানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই।

১৯৭৯-র জানুয়ারি মাসের সংবাদপত্র ওল্টালে দেখা যাবে, ১৬ তারিখের পর থেকে প্রতিদিনই খবর থাকছে : কয়েকটি করে প্রেস খুলেছে, কিন্তু কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছে। ফেব্রুয়ারি থেকে আর খবর নেই ; কেউ জানে না—ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল।

আর আজ সাত বছর পরেও একই অবস্থা। বেশির ভাগ মালিকই আজ 'অ্যাড-হক' ২৫ টাকা বৃদ্ধি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর আর সমাধান এক ধাপও এগোয় নি। সংগঠন সম্পর্কে আজ কারোর কোনো আগ্রহ নেই। ৭৮-এর বিধ্বংসী বন্যায় ছোট ছাপাখানার মালিক-শ্রমিক উভয়েরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। ছাপাখানার মধ্যে জল ঢুকে গিয়ে ছাপা ফর্মা যেমন নষ্ট হয়, অনেকেরই তেমনি ঘরবাড়ি জোত-জমির ক্ষতি হয়েছিল। এই আঘাতের আড়াই মাস পর টানা ধর্মঘট তাদের অনেকের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় মোটামুটি একটা ফয়সালা করে নিয়ে প্রেস খোলার ব্যাপারে মালিক-শ্রমিক উভয়েরই আগ্রহ ছিল। ধর্মঘটের স্মৃতি আজ তাদের মনে ফিকে হয়ে গেছে। অনেকেই জানেন না, মোর্চা আদৌ টিকে আছে কি না। □

মাইনে ও চাকরির শর্ত অনিশ্চিত

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মদ্যপানে মৃত্যু বেড়েই চলেছে

গত কয়েকমাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে বিষাক্ত মদ্যপানে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। এদের বেশির ভাগই রাজ্য সরকারের আবগারী দপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে কেনা দেশী মদ খেয়েই মারা গেছেন।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি উত্তর কলিকাতার নিমতলা শ্মশানে বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা যান পাঁচজন। এরপর মার্চের ১১ তারিখে মালদার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম মেহেদিপুরে এক বিয়ে বাড়িতে এসে বরযাত্রীরা সরকারের অনুমোদিত দোকান থেকে মদ কিনে পান করার পরই বিষক্রিয়ায় আটজন মারা যান। এদের মধ্যে একজন চেকপোস্ট ইন্সপেক্টারও ছিলেন। ২৩ মার্চ কলকাতায় লকগেট রোডে মারা যান একজন ড্রাইভার। ২২-২৬ মার্চের মধ্যে নদীয়ায় মদে বিষক্রিয়ার ফলে দুজন মারা যান ৪ এপ্রিল পুরুলিয়া জেলার হুড়ায় বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা গেলেন ৯ জন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বেশ কয়েকজন। তার পরের দিনই খবর মিললো যে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে মদ খেয়ে আবার আটজন মারা গেছেন।

পরপর এতগুলো মৃত্যুর খবর আসার পর একটু হৈ চৈ শুরু হয়েছে মনে পড়ছে ৭ জুলাই, ১৯৮১-র কথা। বাঙ্গালোরে মদে বিষক্রিয়ার জন্য মারা গেলেন প্রায় সাড়ে তিনশো জন। মদে বিষক্রিয়াজনিত একসঙ্গে মৃত্যুর সর্বোচ্চ খতিয়ানে ভারত বিশ্ব রেকর্ড করল। ট্রাক বোঝাই করে বাঙ্গালোরের হাসপাতালগুলোয় অসুস্থ লোক এসেছে ও আবার ট্রাক বোঝাই হয়ে মৃতদেহ গেছে। গণ সৎকার করতে হয়েছে। কর্নাটকে তখন মুখ্যমন্ত্রী কং(ই) নেতা গুণ্ডু রাও। অভিযোগ উঠলো ঐ বিষাক্ত মদ ব্যবসায়ের নেপথ্যের মালিক সৈয়দ আমীর সুলতান নির্বাচনে টাকা যোগাত গুণ্ডু রাওকে। অনেক চাপের মুখে গুণ্ডু রাও বাধ্য হয়ে বসিয়েছিলেন এক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। এর পূর্বে ঐ বছরের মার্চে ঐ বাঙ্গালোরেই মারা গিয়েছিলেন ২০ জন।

ঐ বছরের ১৩ জানুয়ারি বিষাক্ত মদ খেয়ে দিল্লিতে মারা গিয়েছিলেন পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী ১৪। জানুয়ারি ১৯৮১। হরিয়ানার জিন্দ শহরে মদে বিষক্রিয়ায় মারা গেলেন ২৩ জন। সাতজন অন্ধ হয়ে এবং বাকি ৭ জন আজীবন পঙ্গু হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করে রাজ্যের আবগারী মন্ত্রীকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১। কেরালার তদানীন্তন আবগারী মন্ত্রী এম. কে কৃষ্ণাণ রাজ্য বিধানসভায় এক বিবৃতিতে বললেন, 'কুইলন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পুনালুর এলাকায় বিষাক্ত আরক পান করে অন্তত ত্রিশজন মারা গেছেন, এবং অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, তিনি আরো জানান যে মৃতের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। কারণ মৃতের আত্মীয়রা অনেক সময়ই লজ্জায় মৃত্যুর কারণ হিশেবে বিষাক্ত মদ্যপানের কথা স্বীকার করেন না। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কেরালার ভাইপিন দ্বীপে মদ্যপান করে ৭২ জন মারা গেলেন। চুরাশিতে বিহারের ধানবাদে বেশ কয়েকজন কয়লাখনি শ্রমিক মারা গেলেন মদ্য পানের পর।

সবক্ষেত্রেই বিষাক্ত মদ্যপানে মারা গেছেন সমাজের গরিব মানুষরাই। ভবানীপুরে যারা মারা গেছেন সেই রাজনারায়ণ সাউ, বাসুদেব গায়েন, ওরনলাল, প্রহ্লাদ নায়েক, হরবিন্দ সিং, মদন পারিজা, চন্দন সিং, রামগিরি রাম, বিন্ধিয়া দেবী—বেশিরভাগই গরিব বস্তিবাসী।

কোন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা শ্রমিকনেতা নেশাবন্ধের জন্য শ্রমিকদের সুশিক্ষিত করতে চান। মালিকের উদ্বৃত্ত মূল্যলাভে শ্রমিকদের মদ্যপান অবশ্যই সহায়ক। এ কথাটা বুঝেছিলেন ছত্রিশগড়ের শ্রমিকনেতা শঙ্কর গুহনিয়োগী। হাজার হাজার শ্রমিককে বুঝিয়ে মদ্যপান বন্ধ করিয়েছিলেন। মদের ব্যবসায়ীরা ক্ষেপে গিয়ে একাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্জুন সিং এর নেতৃত্বাধীন কং(ই) মন্ত্রিসভার জন্য ৮% বেশি খরচ করে একটু ভালো আহার করেন, কাপড়-জামা কেনার জন্য মদ্যপায়ীদের তুলনায় ৩০% বশি খরচ করতে পারেন, চিকিৎসাবাবদ ১৬৮%বেশি টাকা খরচ করেন ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বাবদ৩০০%বেশি টাকা খরচ করেন। ছত্রিশগড়ের শ্রমিকরা মদ ছেড়ে দিয়ে ছয় গুণ বাড়তি মজুরি আদায় করে ছত্রিশগড় মাইনস শ্রমিক সঙ্ঘের (CMSS) তহবিলে বেশি করে টাকা দিয়ে নিজেদের ইউনিয়নের বিরাট বাড়ি ও হাসপাতাল গড়ে তুলেছে দল্লি-রাজহারায়। যে মহিলারা আগে প্রতি রাতে মাতাল স্বামীর হাতে নির্যাতিতা হতেন তাঁরা এখন সন্ধের পর সুস্থ স্বামীর হাত ধরে ইউনিয়নের অফিসে

ধাপায় বেআইনি চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে

শিল্পমন্ত্রী ঝুনুকলাল ভেদীয়াকে বলল, 'নির্বাচনী তহবিলে টাকা দিয়েছি। কিন্তু আজ আমাদের ব্যবসা বন্ধ হতে চলল, কারণ মদের খদ্দের নেই।' এদিকে ঠিকেদারদের শ্রমিকরা তখন লড়াই করে দৈনিক মজুরি ৩ টাকা থেকে ১৯.৫০ টাকা আদায় করেছে। শিল্পমন্ত্রীর কলকাঠিতে ১১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শঙ্কর গুহনিয়োগীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (NSA) গ্রেপ্তার করে।

মাদ্রাজ বন্দরের শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপানের ফলাফল সম্পর্কে সমীক্ষা করে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী সরস্বতী শঙ্করণ তাঁর প্রতিবেদনে (অতি সম্প্রতি প্রকাশিত) বলেছেন, ১৬২ জন শ্রমিকের মধ্যে অর্ধেকের বেশি খুব বেশি মদ্যপান করেন এবং এক তৃতীয়াংশের মত মদে আসক্তই বলা যায়। যে সব শ্রমিকরা মদ খান তাঁদের অধিকাংশই ছদিন অন্তর একদিন কামাই করেন। এর ফলে এঁদের তুলনায় মদ্যপান যাঁরা করেন না সেইসব শ্রমিকরা মাসান্তে বেশি টাকা মজুরি ঘরে নিয়ে যান, মদ্যপায়ীদের তুলনায় এঁরা খাদ্যের

এসে জমায়েত হন।

মদ্য নিবারণে সরকারি ভাবনা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৭ নং ধারায় বলা হল যে ওষুধের প্রয়োজন ছাড়া মদ বেচাকেনা বিক্রির জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। [Art. 47 of the Indian constitution states—'The state shall regard the raising of the level of nuprition and the standard of living of its people and the improvement of the public helath as among its primary duties and, in particular, the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposesof intoxicatingdrinks and of durgs which are injurious to health.]

সংবিধানের এই নির্দেশের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য সরকারগুলি আবগারী শুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে চাইছে। মদ্যপানের ফলে স্ত্রী-নির্যাতন,

"মানুষ মদ খান, তা আমরা চাই না"

আবগারি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের আবগারি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিক্ষণ পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

প্রতিক্ষণ : সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি মদের দোকান থেকে মদ নিয়ে পান করার পর এতগুলো লোক মারা গেলেন, এ ব্যাপারে সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে ?

বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় : বামফ্রন্ট সরকার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অনেকগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছে। ১. অন্যান্য রাজ্য থেকে যে অ্যালকোহল আসে তা সেইসব রাজ্যের মদ তৈরির কারখানার পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর কেমিস্টের কাছ থেকে 'পানের যোগ্য' (fit for Consumption) বলে সার্টিফিকেট আনতে হবে। ২. এখানে মদ যেসব জায়গায় বোতলজাত (Bottling Plant) করা হয় সেখানে পরীক্ষাগার ও কেমিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে যেসব প্ল্যান্টে এরকম বন্দোবস্ত নেই তারা নিকটবর্তী প্ল্যান্ট, যেখানে পরীক্ষাগার আছে, সেখান থেকে পরীক্ষা করাবে ও আবগারি দপ্তরের পরিদর্শকরা কেমিস্টের রিপোর্ট দেখে প্ল্যান্ট থেকে বোতলগুলো বিক্রির জন্য বাইরে পাঠাবার নির্দেশ দেবেন। এছাড়া পরীক্ষার কাজ দ্রুত করার জন্য কলকাতায় আমরা একটা কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার গড়ে তুলছি। ৩ বর্তমানে কোনো ক্রেতাকে সর্বোচ্চ দশ বোতল মদ বিক্রি করা যায়, এটা কমিয়ে চার বোতল করা হচ্ছে।

প্রতিক্ষণ : আবগারি শুল্ক বাবদ আয় কেমন হচ্ছে ?

বি মু : ১৯৮১-৮২ সালে (যখন ডঃ অশোক মিত্র আবগারি মন্ত্রী ছিলেন) আদায় হয়েছিল ৫২.৮০ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালে হয়েছে ৬৯.৩৪ কোটি টাকা। পরের বছর দাঁড়ায় ৭৬.৮৭ কোটি টাকা। ১৯৮৫—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ পর্যন্ত হয়েছে ৫৮ কোটি টাকা। (বর্তমানে মদের সরবরাহ কম বলে রাজস্ব কমে গেছে।)

প্রতিক্ষণ : বামফ্রন্ট শাসনেও রাজস্ব বৃদ্ধির দিক থেকে কি মদ খাওয়া বাড়ছে ?

বি মু : প্রথম কথা, আমরা চাই না, যে মানুষ মদ্য পান করুন। রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ দুটো, ১. দামি মদে, যা সমাজের ধনীরা পান করে, তার উপর চড়া শুল্ক বসানো হয়েছে ও ক্রমাগত শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। ২. বেআইনী ব্যবসা বন্ধে লাগাতার অভিযান। তার ফলে সরবরাহ ঠিক থাকলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানে মদের বিক্রি বাড়ছে ও আনুপাতিক হারে রাজস্ব আদায়ও বাড়ছে।

প্রতিক্ষণ : বেআইনী চোলাই ব্যবসা বন্ধে কতটা সফল হয়েছেন ?

বি মু : চোলাই ব্যবসা বন্ধে সরকার সক্রিয়। এই তো দোলের পনেরো দিন আগে থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে শুধু কলকাতাতেই ৫০১টা কেস হয়েছে, ৪৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ৫৭৯৮.৬ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

প্রতিক্ষণ : মদ্যপান ও চোলাই সম্পর্কে আপনার মতামত ?

বি মু : শুধু আইন করে মদ্যপান ও চোলাই ব্যবসা বন্ধ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্দোলন ও সুশিক্ষার বিস্তার। একসময় বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ (prohibition) ছিল। কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে এইসব রাজ্য ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। এখন একমাত্র গুজরাটে মদ্যপান নিষিদ্ধ, যদিও গতবছরে সেখানে মদে বিষক্রিয়ায় কুড়ি জন মারা গেছেন। আর চোলাই ? এ তো এই সমাজ ব্যবস্থার ফল। পশ্চিমবঙ্গে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। বেকারি, অনটন, সংকট, হতাশা সমাজে যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আরেকদলের হাতে যখন প্রচুর পয়সা আছে তখন পয়সাওয়ালারা বেকারদের দিয়ে চোলাই ব্যবসা চালাবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে। □

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দেবাশিস ভট্টাচার্য

বিবাহ বিচ্ছেদ, পথ দুর্ঘটনা—এ সবই বৃদ্ধি পেলেও সকার সন্তুষ্ট কারণ রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মদের কোম্পানিগুলোর শ্রী বৃদ্ধিও হচ্ছে। কর্নাটক সরকার আবগারী শুল্ক বাবদ আয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তামিলনাড়ুতে সরকারি আয়ের৮%আসে আবগারী শুল্ক থেকে।

মদের বিক্রি থেকে আয় নিয়ে সরকার শিক্ষায় ঢালছে ও মধ্যাহ্নে স্কুলের ছেলেমেয়েদের খাবার দিচ্ছে (Mid day Meal Scheme) বলে তামিলনাড়ুর অর্থমন্ত্রী নেদুচেঝিয়ান বিধানসভায় গর্ব প্রকাশ করেন।

২৮ জুলাই ১৯৭২ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আবগারী দপ্তরের বাজেট পেশ করে তদানীন্তন আবগারী মন্ত্রী সীতারাম মাহাতো বলেছিলেন, ১৯৭১-৭২ সালে আবগারী খাতে সরকারের খরচ হয়েছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং আয় হয়েছিল প্রায় উনিশ কোটি টাকা। ব্যয় কম, আয় বেশি একমাত্র আবগারী মন্ত্রীই দাবি করতে পারেন।

সেদিন সীতারাম মাহাতো বলেছিলেন, 'রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দও কম। এই অবস্থায় রাজ্য অন্তঃশুল্ক বিভাগ দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজস্ব বিভাগ হিশেবে কাজ করবে। আবার অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্ব বৃদ্ধির কথা উঠলেই স্বাভাবিকভাবে মাদকদ্রব্য বৃদ্ধির ধারণা মনে এসে যায়।'

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আবগারী দপ্তরের হিশেব অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের পরিমান বছরে পঁচাত্তর

২৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আবগারী দপ্তরের বাজেট পেশ করে তদানীন্তন আবগারী সীতারাম মাহাতো বলেছিলেন, ১৯৭১-৭২ সালে আবগারী খাতে সরকারের খরচ হয়েছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং আয় হয়েছিল প্রায় উনিশ কোটি টাকা। ব্যয় কম, আয় বেশি একমাত্র আবগারী মন্ত্রীই দাবি করতে পারেন।

কোটি টাকা। দুঃখের হলেও সত্য যে, মদের টাকায় প্রাথমিক স্কুল খোলা হচ্ছে। সব রাজ্য সরকারই হিশেব দেন যে আবগারী শুল্ক বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা কৃতিত্বের চিহ্ন কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

একমাত্র গুজরাটেই এখন মদ্যপান বেআইনী। ঐ রাজ্যে কোনো আবগারী মন্ত্রী নেই, বরং মদ্যপান নিবারণ (prohibition) মন্ত্রী আছেন। তথাপি মোহনদাস করিমচাঁদ গান্ধীর জন্মভূমিতে লুকিয়ে চলে

মদের ব্যবসা। আসলে মদ্যপানের কুপ্রভাব বুঝিয়ে জনতাকে শিক্ষিত করার জন্য নেই সরকারি ও বেসরকারি স্তরে চালাও প্রচার।

মদের ব্যবসা বন্ধে মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু আন্দোলন হয়েছে। সত্তর-একাত্তরে নকশালপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় মদের দোকান ও বার ভাঙচুর করেছে। এখনও কোথাও কোথাও চোলাইয়ের ঠেক তোলার দাবিতে মিছিল-মিটিং হয়। কয়েকমাস আগে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে মহিলারা তাঁদের স্বামীদের মদ্যপানে ক্ষিপ্ত হয়ে সমিতি গড়ে তোলেন। ঐ মহিলারা রোজ সন্ধেবেলা মদের দোকানগুলোর সামনে বিক্ষোভ দেখান ও মাতাল স্বামীদের ধরে গলায় বোতল ঝুলিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে অপমান করেন।

মদ্য ব্যবসায়ীদের লবি বেশ শক্তিশালী। একাশি সালের মার্চ মাসে হায়দ্রাবাদের চিকদ্য পল্লীতে বাসিন্দারা একটা আরকের দোকান তুলে দেবার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও অন্ধ্রপ্রদেশ মদ্য নিবারণী পরিষদের সভাপতি আলী আকবর খান ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু আবগারী দপ্তর বা পৌরসভা কেউই ঐ দোকান এখান থেকে সরাতে পারল না. কারণ ঐ দোকান সহ বহু দোকানের মালিক ছিল ঐ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেন্না রেড্ডীর বন্ধু।

এতক্ষণ সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশিমদ নিয়েই আলোচনা হয়েছে। কারণ সাম্প্রতিক মৃত্যুগুলো হয়েছে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের মদ পান করে। এবার আসা যাক চোলাই মদের কথায়। চোলাই মদের বিক্রি হু হু করে বাড়ছে। কারণ. চোলাই মদ শস্তা. সরকারকে শুল্ক দিতে হয় না। আবগারী শুল্কের তুলনায় অল্প পয়সা পুলিশকে দিয়ে ব্যবসা চালানো যায়। পুলিশকে ঘুষ না দিয়ে কোনো চোলাইয়ের ঠেক চলে না। থানার দশ গজ দূরেই ঠেক চলছে. চাট হিশেবে পচা মাছভাজা বা ছোলা. তেলেভাজা বিক্রি হচ্ছে পাশেই।

১৯৭২ সালে দিল্লির চোলাইয়ের ঠেকগুলি নিয়ে বাভেজা কমিটি এক সমীক্ষা করেছিল। সমীক্ষার রিপোর্টে লেখা হয়েছে যে ঠেক চালাতে পুলিশকে নিয়মিত ঘুষ দিতে হয়।

এরাজ্যেও লোকাল থানা. পাড়ার মাস্তান ও আবগারী দপ্তরের ইনস্পেক্টারদের নিয়মিত পয়সা দেয় চোলাইয়ের কারবারীরা। এ ছাড়া করতে হয় পুলিশের সঙ্গে চুক্তি। প্রতিমাসে একজনকে একটা করে পেটি কেস খেতে হবে। খাতা কলমে অফিসাররা যাতে বোঝাতে পারেন যে এক বছরে এতসংখ্যক কেস হয়েছে ইত্যাদি। ১৯০৯ সালের বঙ্গীয় আবগারী আইন (Bengal Excise Act) সরকার ১৯৭৯ সালে সংশোধন করেছেন. তথাপি চোলাইয়ের ঠেক বেড়েছে বই কমে নি। চোলাই মদ. যাকে 'চুল্লু' 'ধেনো' বলে তা তৈরির প্রক্রিয়া শুনলে আতঙ্কিত হতে হয়। গুড়. ধুতরোর ছাল. নিশাদল তো লাগেই এর সঙ্গে মেশানো হয় মুরগীর বিষ্ঠা ও নাড়িভুঁড়ি. কাঁকড়া বিছে অথবা সাপের বাচ্চা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পৈলান অঞ্চলে চোলাই এখন ঘরে ঘরে কুটির শিল্প। বড় বড় উনুনে গেঁজানো গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে সব সময়েই। বিরাট ব্যবসা। একজনের নাকি চোদ্দটা গাড়ি আছে মাল কলকাতা সহ অন্যত্র সরবরাহ করার জন্য। বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে এ-কারবার কিভাবে চলতে পারে. তা আশ্চর্যের বিষয়। □

দেবাশিস ভট্টাচার্য

একটি সেমিনার ও সাম্প্রদায়িকতা

মুসলিম নারী বিল সমর্থন ও বিল বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে ২২ এপ্রিল কলকাতায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃস্টি হয়েছিল। এদিন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিলটির বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং এতে অংশ নিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার। শাহবানু মামলা লড়ে খ্যাত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দানিয়েল লতিফি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গী অধ্যাপক জেড. হাসান, সংসদ সদস্য সঈফউদ্দিন চৌধুরী, মওলানা আজাদ কলেজের আরবি বিভাগের মুরব্বি অধ্যাপক হারুণউর রশিদ, বাকপটু অধ্যাপক মাহমুদ এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাসুদ। আলোচনাচক্রটির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জোতি বসু। সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ হাশিম আব্দুল হালিম। দিনকয়েক আগে থেকেই আলোচনাচক্রের সমর্থনে যেমন জোর প্রচার চলছিল, ঠিক তেমনি এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছিল কয়েকটি উর্দু কাগজ, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল ল বোর্ডের পশ্চিমবঙ্গীয় অ্যাকশন কমিটি এবং স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। অধ্যক্ষ হাশিম আব্দুল হালিম আলোচনাচক্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধেই প্রধানত বিল সমর্থকেরা রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তাঁর বাড়ির সামনে কাল পতাকা দেখান কয়েকজন। কয়েকজনকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। সকালে মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থার ৮০০ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিল বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডেকার্স লেনে। তারা মিছিল করে বামফ্রন্টের লাশ কাঁধে সমবেত হন এসপ্ল্যানেড ইস্টে। স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মহিলা শাখাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডেকার্স লেনে। প্রতিটি বিক্ষোভ মিছিলই ছিল সুপরিকল্পিত। আলোচনাচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর নামে এদিন প্রকাশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিল বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিল সমর্থকেরা। বিল সমর্থকদের পিছনে বামফ্রন্ট বিরোধীদের ইন্ধন রয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বাধাবিপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আলোচনাচক্রটি বানচাল করতে পারেন নি বিল সমর্থকেরা। সাধারণত আলোচনাচক্রের এমন সাফল্য দেখা যায় না। এদেশে আলোচনাচক্র মানেই মাত্র কয়েকজনের সমাবেশ। জনসমাবেশের দিক থেকেও আলোচনাচক্রটি ছিল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিরাট সমাবেশ থেকে একটা কথাই মনে হয়েছে যে, মুসলিম নারীর অধিকার রক্ষার প্রহসন বিলের বিরুদ্ধে ক্রমশ জনমত গড়ে উঠছে, হয়ত এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে যাচ্ছেন

সেমিনারে বক্তৃতা করছেন জ্যোতি বসু

বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করার জন্যেও চাঁদনিচকের মুসলমানদের উসকানি দিচ্ছিলেন অ্যাকশন কমিটি। উর্দু কাগজপত্রে, বিশেষ করে দৈনিক ইকরা পত্রিকায় অধ্যক্ষ হাশিম আব্দুল হালিম এবং মুখ্যমন্ত্রী জোতি বসুকে 'মুসলিম ও ইসলামবিদ্বেষী' বলে চিহ্নিত করে আলোচনাচক্রে যোগ না দেওয়ার জন্যে সাধারণ মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়। সপ্তাহ দুয়েকের টানা অপপ্রচার থেকেই অনুমান হয়েছিল আলোচনাচক্রের বিরুদ্ধে ২২ এপ্রিল বিল সমর্থকেরা মিছিল-সমাবেশ ঘটাবেন। পুলিস গন্ডগোলের আশঙ্কাও করেছিল। বিল সমর্থকেরা গন্ডগোল বাঁধাতে পারেন নি, তাদের উসকানিতে সাধারণ মানুষও কান দেন নি, অন্তত হাজার দেড়েক মানুষ জনা চল্লিশেক বুদ্ধিজীবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছিলেন ইনডোর স্টেডিয়ামে। এদিকে, আলোচনাচক্রেই জনৈক কংগ্রেস কর্মী মুখ্যমন্ত্রীর বিল বিরোধিতার জন্যে তাঁকে ধিক্কার জানাতে গিয়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে নিচে পড়ে যান। স্টেডিয়ামের বাইরেও মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লক্ষ লক্ষ মানুষ। অধ্যাপক মামুদও তাঁর ভাষণে এই ইঙ্গিত দিয়েই বলেছেন যে, এটা একটা সুলক্ষণ যে মুসলিম নারীর অধিকার রক্ষার স্বার্থে আজ সোচ্চার হয়ে উঠছেন লোকায়ত আদর্শে বিশ্বাসী বহুসংখ্যক মানুষ। বিলকে কেন্দ্র করে যাঁরা সাম্প্রদায়িক উসকানি দিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গকে প্রসঙ্গত একটি প্রাপ্য স্বীকৃতি দিয়েছেন আইনজীবী দানিয়েল লতিফি। লতিফি তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, গোটা দেশে আজ দাঙ্গার পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গই ব্যতিক্রম। এখানে মুসলিম বিরোধিতাকে যেমন স্থান দেওয়া হয় না, ঠিক তেমনি মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকেও অস্বীকার করা হয় না। গোটা ভারতেই পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম। মুসলিম বিল বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বাগত জানান তিনি। বিচারপতি আয়ার বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, বিলটি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে উসকানি দেবে। তিনি দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে—সাধারণ সামাজিক আইন প্রবর্তনের দাবি তোলেন। □

বাহারুদ্দিন

কস্টিং ইনস্টিটিউট : ভোটে হেরে গিয়েও কর্তারা গদী ছাড়ছেন না

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ভারতীয় কস্টিং ইনস্টিটিউটের (আই. সি. ডব্লু. এ) অফিসাররা উচ্চতম কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতির একটি দীর্ঘ তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন। এছাড়াও মিনিস্ট্রি অফ ইনডাস্ট্রি অ্যান্ড কোম্পানি অ্যাফেয়ার্সকেও এ বিষয়ে সবিস্তারে জানানো হয়েছে। ১,৫০,০০০ ছাত্র এবং ৬০০০ সদস্যের এই বিরাট সংগঠন পরিচালনা করেন ১৬ জন কাউন্সিল মেম্বার। দুর্নীতির অভিযোগ এই কাউন্সিল মেম্বারদের একাংশের বিরুদ্ধেই। এরাই ঘুরে-ফিরে বছরের পর বছর এখানকার প্রেসিডেন্টের পদ দখল করে আছেন। এখানকার অফিসার ও কর্মচারীরা মনে করেন, প্রেসিডেন্ট পদ থেকে এদের না সরালে দুর্নীতি রোধ করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে কর্মচারী এবং অফিসারদের প্রবল চাপের মুখে কাউন্সিল মেম্বাররা একটি গণভোটের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এই সংগঠনের সমস্ত সদস্যর কাছে আলাদা আলাদা ভাবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট শ্রী নাদকার্নী ব্যালট পেপার পাঠান। গণভোটের বিষয় ছিল, একজন ব্যক্তি তিনবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা। বর্তমান কাউন্সিল মেম্বারদের যে অংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে তিন বারের বেশি প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছেন। অভিযোগ আছে, তাঁদের গোপন ইচ্ছে এটাই যে কেবল তারাই আজীবন এখানকার উচ্চতম পদটি কব্জা করে রাখবেন।

১৯৮৫-র নভেম্বর মাসে গণভোট হবার পর তাঁরা একমাসের ওপর ভোটের ফলাফল চেপে রেখে দেন। এরপর মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তারা বাধ্য হন ভোটের ফলাফল প্রকাশ করতে এবং এই সংগঠনের মুখপত্র 'ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টটেন্টস' পত্রিকায় মুদ্রিত করতে। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৭০% ভাগ ভোট পড়েছে তাঁদের বিপক্ষে, অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট তিনবারের বেশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এই ইনস্টিটিউটের কর্মী ও অফিসাররা প্রশ্ন তুলেছেন গণতন্ত্রের ওপর এ ধরনের আক্রমণ কোনো সভ্যদেশে সম্ভব কিনা।

দুর্নীতির তালিকা

হিশেবের গরমিল: ১৯৮৪ সালের অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট অনুসারে এখানে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকার গোলমাল ধরা পড়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১,৫০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা ফি বা ভর্তির জন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আই. সি. ডব্লু. এ কে টাকা জমা দেন। এই ভাবে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ছাত্রের কাছে থাকে ব্যাঙ্ক চালানের চারটি কপি। দুকপি রেখে দেয় ব্যাঙ্ক আর বাকি দুকপির একটি কপি নিজের কাছে রেখে অন্যটি ব্যাঙ্কের ছাপসহ ছাত্র পাঠায় আই. সি. ডব্লু. এ-তে। এবং ব্যাঙ্কও তার দু-কপির একটি কপি আই. সি. এ. ডব্লু-কে পাঠায়। এরপর আই. সি. ডব্লু. এ-র হিশেবের খাতায় মিলিয়ে নেওয়া হয় ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা পড়েছে তার হিশেব। কিন্তু এই মিলিয়ে নেওয়ার কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে না করে সমস্ত চালান কপিগুলো সেরদরে বাজারে বেচে দেওয়া হয় এবং একজন কর্মীর অভিযোগ, সেই টাকায় চা-বিস্কুট-কফি খাওয়া হয়। এইজন্যই দেখা গেছে ব্যাঙ্ক যখন বলছে তার খাতায় ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে, আই. সি. ডব্লু. এ-র খাতায় তার কোনো হিশেবই নেই। কিন্তু অভিযোগ এখানেই থেমে থাকে নি। এইভাবে চালানের কপি সরিয়ে ফেলার পেছনে এক বিশাল ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে অনেকের ধারণা। সেটা হল এই ব্যাঙ্ক চালানের কপিগুলো বিনামূল্যে আই. সি. ডব্লু. এ-র বিভিন্ন অফিস থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এইবারে ব্যাঙ্কের একটি ভুয়া সিলের কালির ছাপ মেরে চালানের কপি কেউ যদি জমা দেয় এবং সেটা যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলেই সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় বসতে পারবেন আসলে একটিও পয়সা ব্যয় না করেই। অবশ্যই উৎকোচ হিশেবে কিছু টাকা তাকে দিতে হবে। যিনি বা যাঁরা এটা গ্রহণ করবেন তাঁকে। এধরনের একটি চক্রের অস্তিত্বের কথা এখানকার কর্মীরা এই রিপোর্টারকে জানিয়েছেন, যাঁরা এই পদ্ধতিতে কিছু ছাত্রর ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। এই জন্যই দেখা যাচ্ছে আই. সি. ডব্লু-এর অন্য একটি হিশেবের খাতা অনুসারে ব্যাঙ্কে যখন ছাত্রদের থেকে জমা পড়া উচিত ১২,৫৮,৭৯২ টাকা, কিন্তু ব্যাঙ্ক বলছে তাদের কাছে এই টাকা জমা পড়ে নি। অর্থাৎ কয়েক হাজার ছাত্রকে এই চক্রটি ভর্তি বা আরও নানান সুবিধা করে দিয়েছে যার জন্য তাদের ব্যাঙ্কে অর্থাৎ ইনস্টিটিউটকে কোনো টাকা দিতে হয় নি। এদের এই সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলার জনাই চালানের কপি বেচে দেওয়া হয়। স্বভাবতই এই ধরনের কাগজপত্রের সঙ্গে প্রকৃত ছাত্র যাঁরা, যাঁরা ব্যাঙ্কে ঠিকমত টাকা জমা দিয়েছেন তাঁদের কপিগুলোও হারিয়ে যায়। এবং এটাই কারণ যার জন্য পূর্বে উল্লেখিত, ব্যাঙ্কের খাতায় ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়ে, কিন্তু কস্টিং ইনস্টিটিউটের খাতায় তার কোনো হিশেব থাকে না।

নষ্ট চেক

১৯৮৪ সালের হিশেবে দেখা যাচ্ছে এই ইনস্টিটিউট ৬০,০০০ টাকার বেশি 'অ্যাকাউন্ট পেয়ি' চেক সময় মতো না ভাঙিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। কেন এটা করা হল তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। এই চেকগুলো, ছাত্ররা এখান থেকে বই-পত্র কোয়েশ্চেন পেপার ইত্যাদি কেনার বিনিময়ে ইনস্টিটিউটকে দিয়েছিল। দুর্নীতি ছাড়াও কর্তব্যে অবহেলার এটা একটা উল্লেখযোগ্য নজির।

যাঁরা ব্যাঙ্কে ঠিক মতো টাকা জমা দিয়েছেন তাদের কপিগুলোও হারিয়ে যায়। এবং এটাই কারণ যার জন্য পূর্বে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের খাতায় ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়ে, কিন্তু কস্টিং ইনস্টিটিউটের খাতায় তার কোনো হিশেব থাকে না।

বেআইনি বিদেশ ভ্রমণ

কাউন্সিল মেম্বারদের একটি অংশ প্রায়ই ছাত্রদের পয়সায় লন্ডন, নিউইয়র্ক, ম্যানিলা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ঘুরে বেড়ান। বলা হয়ে থাকে এতে নাকি শিক্ষার উন্নতি হবে। কস্টিং ইনস্টিটিউট একটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংগঠন। এই ইনস্টিটিউটের আইনের ১৬(১) (ই) ধারা অনুসারে, যে কোনো প্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণের আগে সরকারের অগ্রিম অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু কোনো সময়েই এই অনুমতি নেওয়া হয় না। ইনস্টিউটের কর্মচারী ও অফিসাররা এগুলোকে কর্তাব্যক্তিদের প্রমোদভ্রমণ আখ্যা দিয়েছেন। কাউন্সিল মেম্বারদের দুজন এই প্রতিবেদককে বলেছেন, এই ভ্রমণগুলো কোনোভাবেই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়। এমনকি এই ধরনের বিদেশ ভ্রমণের সময় তাঁরা বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মিটিং করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (IFAC) নামের একটি কমিটিতে (সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে) ফিনান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কমিটি (FMAC) নামের সংগঠনে কস্টিং ইনস্টিউটের ঐসব ব্যক্তিরা যোগ দেন। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি সেলউইন ম্যাকফারলেন থাকা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নীতি লঙ্ঘন করে তারা এই কমিটিতে যোগ দিয়েছেন এবং গর্ব করে সেই রিপোর্ট নিজেদের ভারতীয় মুখপত্রে ছেপেছেন। ভারতের জাতীয় নীতির প্রতি, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী কালো মানুষদের প্রতি এই জঘন্য অপমান ছুঁড়ে দিতে ঐরা কিভাবে সাহসী হলেন?

লেখাপড়া

স্বভাবতই এই ডামাডোলের বাজারে লেখাপড়া এবং পেশাগত উন্নতির চেষ্টা ডকে উঠেছে। সবচেয়ে মজার কথা হল, যাবতীয় লেখাপড়া ও প্রফেশনাল কাজকর্ম বাইরের লোকদের দিয়ে করানো হয় যারা কাউন্সিলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ। যদিও ইনস্টিটিউটে অনেক কস্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ কর্মচারী আছেন, তাদের দিয়ে এইসব কাজকর্ম পারতপক্ষে করানো হয় না। ফলে বাইরের হাতুড়ে, আনাড়ি লোকদের দিয়ে করানো এইসব এ্যাকাডেমিক কাজকর্মে গুরুতর ফাঁকি থেকে যায়। উদাহরণ, ICWAI স্টাডি নোটস্ যা ছাত্রদের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায় বাইরের লোকেদের তৈরি এইসব স্টাডি নোটস্ প্রাথমিক ভুলে ভর্তি। গোটা স্টাডি ডিপার্টমেন্টে ডিরেক্টর ছাড়া কোনো কস্ট একাউন্টেন্ট নেই, নেই কোনো বিশেষজ্ঞ। কুল্লে একজন অর্থনীতির এম. এ আছেন—কিন্তু অর্থনীতি তো কস্ট এ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষার মোট ষোলো বা আঠারো পেপারের মধ্যে একটি পেপার। বাকিগুলো কে দেখবে?

গবেষণা বিভাগ প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রয়েছেন মাত্র একজন সুপারভাইজার যিনি গবেষক নন বা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। পরীক্ষা বিভাগেও বিভাগীয় প্রধান ছাড়া কোনো কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা বিশেষজ্ঞ নেই। প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টেও বিভাগীয় প্রধান ছাড়া [illegible] কোনো

কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নেই। আই. সি. ডব্লু. এ. আই. এর খোদ সেক্রেটারিও অ্যাকাউন্টেন্ট নন। ইনি চারুচন্দ্র কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্বতন লেকচারার আই. আই. টি খড়্গপুরের রেজিস্ট্রার ও আই আই এম কলকাতার চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ছিলেন। এখন কস্টিং ইনস্টিটিউটের সর্বেসর্বা। ১৯৮৩ মার্চ মাসে তিনি কার্যভার নেবার পর থেকেই কস্টিং ইনস্টিটিউটের অরাজকতা ব্যাপকতর রূপগ্রহণ করে।

প্রতারণা ?

সম্প্রতি ৪৬,০০০ টাকার একটি ঋণ নিয়ে আই সি ডব্লু এ-তে ঝড় উঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেক্রেটারি, ফিনান্স ডিরেক্টর এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। ১৯৮৩-র ডিসেম্বরে একজন কর্মচারী গৃহনির্মাণ ঋণের জন্য ইনস্টিটিউটের কাছে আবেদন করেন। ৫৩,০০০ টাকা ঋণ চাওয়া হয় ৫৬,০০০ টাকা দামের একটি বাড়ি কিনবার জন্য। ইনস্টিটিউটের নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি আইনগত পরীক্ষার জন্য পাঠান হয় আইন বিশেষজ্ঞ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রর কাছে। শ্রীচন্দ্র জানান, যেহেতু যে সম্পত্তি কেনা-বেচা হচ্ছে তার দাম ৫০,০০০ টাকার বেশি অতএব বিক্রেতার incometax clearance certificate লাগবে এবং ঋণ দানের অন্যান্য পূর্ব শর্ত পালন করতে হবে। যেমন সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল, রেজিস্ট্রেশন, ইনস্টিটিউটের কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখা ইত্যাদি। এরপর একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে। জানানো হল ঐ সম্পত্তিটির মূল্য নাকি হঠাৎ কমে গেছে এবং তার দাম আর ৫৬,০০০ টাকা নেই, হয়েছে ৪৯,০০০ টাকা। টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু বেশ কিছুদিন বাদে একটি অনুসন্ধানে জানা গেল কোনোরকম বাড়িই নাকি ঐ টাকায় কেনা হয় নি। ১৯৮৪ সালের প্রেসিডেন্ট রোশনলাল ভাটিয়া যখন এটা জানতে পারেন, তিনি নির্দেশ দেন কড়া ব্যবস্থা নেবার। এবং যে ভাবে টাকটা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং পরবর্তী কাজকর্ম, সবকিছুই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র, এরকম প্রমাণ পাওয়ার পর শ্রীভাটিয়া সমস্ত তথ্য জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সলিল গাঙ্গুলীর কাছে পরামর্শ প্রার্থনা করেন। শ্রীগাঙ্গুলী পরিষ্কারভাবে জানান এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককেই এই মুহূর্তে সাসপেন্ড করা উচিত এবং এরা প্রত্যেকে ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের ৪২০, ১২০, ৪০৬ ধারা অনুসারে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এসব কিছুই হল না, অবাধ গতিতে চলতে থাকল ইনস্টিটিউটের কর্ম-কাণ্ড।

গণভোট'

এই যখন অবস্থা, যখন কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ, দায়িত্বশীল অফিসার এবং দু-একজন সৎ কাউন্সিল মেম্বার বিরক্ত ও হতাশ, কিন্তু তাঁদের যৌথ চাপের কাছে ক্ষমতাশালী কাউন্সিল মেম্বাররা কিছুটা নতি স্বীকার করে বাধ্য হলেন গণভোট ডাকতে। হল ভোট। রায় গেল ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই রায় মেনে নিলে দীর্ঘ সময়ের এক অশুভ আঁতাত ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। তাই বলা হল, রায় যাই হোক অবস্থা একই থাকবে। ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল এপ্রিল মাসে। এ লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত তার ফলাফল বের হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী নানা অভিযোগে বিপর্যস্ত কাউন্সিল মেম্বারদের বর্তমান গোষ্ঠীটিই আবার ফিরে আসবে কিনা এটাই এখন এখানকার কর্মচারী এবং সদস্যদের একমাত্র আলোচনার বিষয়। □

শুভাশিস মৈত্র

অন্ধ্রে সি· পি· আই (এম) ও সমঝোতার রাজনীতি

অন্ধ্রের মানুষ রামা রাওয়ের তেলুগু দেশমকে সমর্থন করেন, তার কারণ সাধারণ মানুষের সামনে রামা রাওয়ের ভগবান-সদৃশ ইমেজ তৈরি হয়েছে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটে ওঠা ছবি থেকে। এই সামাজিক ব্যবস্থায়, যেখানে সমস্ত ধরনের ভগবান, এদের মধ্যে আধুনিক সেলুলয়েড দেবতারাও আছেন, অশিক্ষিত, অনগ্রসর, অসংগঠিত মানুষকে অন্ধ বানিয়ে রাখেন। এন. টি. রামা রাও খুব সফলতার সঙ্গে এই ধর্মান্ধতাকে মূলধন করে তাঁর গদি জিইয়ে রেখেছেন। সবচেয়ে যেটা অবাক করা ব্যাপার তা হলো, এই ধর্মান্ধ মানুষদের পরেই যাঁরা রামা রাওকে সমর্থন করছেন তাঁরা হলেন সি. পি. আই (এম) নেতা। তাঁরা একেবারেই অন্ধ নন, সম্পূর্ণ সচেতন এবং সজাগ। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই দল এখন 'কমরেড' এন. টি. আর-কে সমর্থন করেছে এক মাসে দু বার। সমর্থনের দুটি ঘটনা হলো ১৫ ফেব্রুয়ারির হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচন, যা দু দশক পরে অনুষ্ঠিত হতে দেখলাম, আর ২০ মার্চের রাজ্যসভা নির্বাচনে। যেখানে জনতা এবং বি. জে. পি সমেত সমস্ত অকংগ্রেসী দল এন. টি. আর-কে ছেড়ে দূরে চলে গেছে।

হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে 'কমরেড' এন. টি. আর সি. পি. আই (এম)-কে আশীর্বাদস্বরূপ চারটি আসন দিয়েছিলেন, তার একটিতে জিতেছে সি. পি. আই (এম), মাত্র ৫৩ ভোটে। তিন বছর আগে একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মানেকা গান্ধীর স্বল্পায়ু সঞ্জয় বিচার মঞ্চ এন. টি. আর-এর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে পাঁচটির ভেতর চারটি আসনে জয়লাভ করেছিল ১৯৮৩-র ঐতিহাসিক বিধানসভা নির্বাচনে। বেদনার কথা এটাই যে সঞ্জয় বিচার মঞ্চ যে চারটি আসনে জিতেছিল তার তিনটিই ছিল তেলেঙ্গানা অঞ্চলের। উত্তর ভারতীয় মানেকা গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রভাবের জন্যেই তৈরি করতে পেরেছিলেন স্বল্পায়ু 'বৈবাহিক-সম্পর্ক'। কিন্তু তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ঐতিহাসিক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সি. পি. আই (এম)-এর যে ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁরা হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে নিদেনপক্ষে চারটে আসনই দখল রাখতে পারল না, যেখানে তাঁদের পেছনে ছিল রামা রাওয়ের সমর্থন।

রামারাও জ্যোতি বসুর সঙ্গে

শ্রমিকশ্রেণীর আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক সুবিধের কথা মনে রেখে সি. পি. আই (এম)-এর উচিত ছিল কমরেড এন. টি. আর-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা করা আর 'রাজযোগী'র হলুদ পতাকা থেকে নিজের লাল পতাকা আলাদা করা। কিন্তু তা হয় নি। রাজ্যসভা নির্বাচনে সি. পি. আই (এম) ২ জন তেলুগু দেশম প্রার্থীকে সমর্থন করেছে, সি. পি. আই বার বার যেখানে বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যের স্বার্থে তার একমাত্র প্রার্থীকে সমর্থন করার জন্যে আবেদন জানিয়েছিল। বাম ঐক্যের জাতীয় শ্লোগান মুছে দিয়ে 'সেলুলয়েডের ভগবান'-এর সঙ্গে ঐক্য গড়ল রামা রাওয়ের আশীর্বাদপুষ্ট সি. পি. আই (এম) শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত তেলেঙ্গানায়।

তেলেঙ্গানায় যখন এরকম চলছে, সি. পি. আই (এম) অন্য এক কায়দা শুরু করল কেরালায়, যে কেরালাকে দক্ষিণ ভারতের লাল অঞ্চল হিশেবে সম্মানিত করা হয়। সি. পি. আই (এম) নেতৃত্ব তার রাজ্য শাখার ন জনকে কিছুদিন আগে বরখাস্ত করেছে। এদের মধ্যে বিধানসভায় দলের সম্পাদক এম. ভি. রাঘবন, বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এল. ডি. এফ)-এর কনভেনার পি. ভি. কুঞ্জিকাননও আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে উপদল তৈরি এবং 'সংসদীয় সংশোধনবাদের' অভিযোগ আছে। তাঁদের অপরাধ, পার্টির দলিলের বিরুদ্ধে তাঁরা এক পাল্টা দলিলকে সমর্থন করে প্রবল যুক্তি রেখেছিলেন—দলিলের নাম 'পলিটব্যুরো লেটার'। দলিলে এল. ডি. এফ-এ সে সমস্ত দল কংগ্রেসের বিরোধী তাদের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল, আসুন আমরা সমস্ত দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেস (ই) মন্ত্রীসভাকে উপড়ে ফেলি। এই ব্যাপারটি সি. পি. আই (এম) অফিসিয়াল নেতৃত্বের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক নাম্বুদিরিপাদ জোরগলায় 'কেরালা কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলের' সঙ্গে 'মুসলিম লিগের মতো সাম্প্রদায়িক দলের' সঙ্গে এই আঁতাত খুব নগণ্য নির্বাচনী লাভের ব্যাপার বলে বাতিল করে দেন। সি. পি. আই (এম)-এর 'সংশোধনবাদী বিদ্রোহীদের' ন জনের বক্তব্য, বামফ্রন্টের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কংগ্রেস (ই)-র বিরোধিতা, এই ব্যাপারে যে কোনো দল বা গ্রুপের ভূমিকা যদি থাকে, তাহলে তাকে সাদরে এল. ডি. এফ-এ নেয়া হবে—যার মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেস (ই) সরকার মুছে ফেলা।

একই সময়ে পাশের প্রদেশ তামিলনাড়ুতে সি. পি. আই (এম) আর এক ধরনের খেলা দেখাচ্ছে। ডি. এম. কে পরিচালিত ফ্রন্টের অধীনে সি. পি. আই (এম) স্থানীয়-নির্বাচনে লড়ছে, তাতে তারা আসনভিত্তিক সমঝোতা করেছে মুসলিম লিগের সঙ্গে। এই মুসলিম লিগের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নেই কেরালায় তাঁরা নিজেদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছেন। নাম্বুদিরিপাদ তামিলনাড়ুতে মুসলিম লিগের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, তামিলনাড়ুতে মুসলিম লিগের

সঙ্গে সমঝোতায় তাঁর দল কিছু হারায় নি, কিন্তু কেরালায় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মুসলিম লিগের সঙ্গে অতীত আঁতাতের ফলে কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকার অপসারণের পর ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়ে ১৯৬০-এ জওহরলাল নেহরু কি একই ধরনের তত্ত্ব খাড়া করেন নি। তাঁর তত্ত্বটি ছিল কেরালা ছাড়া সর্বত্রই মুসলিম লিগ সাম্প্রদায়িক দল, সুতরাং ১৯৫৯-৬০-এ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস-মুসলিম লিগ-পি. এস. পি অশুভ আঁতাত তৈরি করে।

সি. পি. আই (এম)-এর কেরালা থিসিস—'কেরালা কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলির বিরোধিতা কর', তার অন্ধ্র থিসিস—'তেলুগু দেশমের সঙ্গে চলো'-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। আসামে আবার তার নীতি হলো আসাম গণ পরিষদ (এ. জি. পি)-এর প্রধান শত্রু হিশেবে কাজ করা। একটি আন্তর্জাতিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির পক্ষে এ ধরনের অঞ্চল হিশেবে আলাদা আলাদা তত্ত্ব অবশ্যই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

আসামের বাইরে এ. জি. পি-এর প্রধান বন্ধু এন. টি. আর তাঁর প্রথম নির্বাচনী প্রচারে বিন্ধ্যার উত্তর অঞ্চলে সি. পি. আই (এম)-এর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন গত বছরে। কারণ সি. পি. আই (এম) এ. জি. পি বিরোধী। আর অন্ধ্রে সি. পি. আই (এম) এন. টি. আর-এর একমাত্র মিত্র হিশেবে কাজ করছে, যে এন. টি. আর এ. জি. পি-র একমাত্র বন্ধু. আর আসামে সি. পি. আই (এম) এ. জি. পি-র শত্রু। সি. পি. আই (এম)-এর চোখে এ. জি. পি হলো 'আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদীদের' সংগঠন। এন. টি. আর-এর মতে এ. জি. পি হচ্ছে 'আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের' প্রতীক। আর আশ্চর্য সি. পি. আই (এম) আর এন. টি. আর তেলেঙ্গানার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে মৈত্রী গড়ছে! তাত্ত্বিক দিক থেকে বলি. সি. পি. আই (এম) কংগ্রেস (ই)-র বিরোধিতা করার জন্যে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন 'কমরেড' এন. টি. আর-কে সঙ্গে নিয়েছে। মনে রাখতে হবে ১৯৮৩-র জানুয়ারির বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে লোকসভা নির্বাচন এবং ১৯৮৫-র মার্চে বিধানসভা নির্বাচনে যখন এই চিত্রাভিনেতা একাই হাটিয়ে দিলেন কংগ্রেসকে : আর স্বাধীনতার পর অন্ধ্রে কংগ্রেস (ই)-র সেটাই প্রথম পরাজয়। দুঃখের বিষয় এই সময়গুলোতে সি. পি. আই (এম) রামা রাওয়ের সঙ্গে সমঝোতার কথা ভাবে নি।

শ্রেণীগত বিচারে কেরালা কংগ্রেস ও এ. জি.. পি.-কে সি. পি. আই (এম) প্রতিক্রিয়াশীল ও শ্রমিকশ্রেণীর ...থবিরোধী দল বলে মনে করে। তাহলে তেলুগু ...ম সি. পি. আই (এম)-এর মিত্র হয় কী করে, ...ণ সম্ভ্রান্ত খাম্মা শ্রেণীই রামা রাওয়ের ক্ষমতার ...ান উৎস. এবং রামা রাও ভূমিসংস্কার বিরোধী। ...ণী চরিত্রই যদি যুক্তফ্রন্ট গড়বার নিরিখ হয়, তাহলে ...ি. পি. আই (এম) তামিলনাড়ুতে মুসলিম লীগ এবং কেরালায় কংগ্রেস (স) ও জনতার সঙ্গে আঁতাত করে কীভাবে? ১৯৮০-তে চরণ সিং-এর জাঠলবির সবুজ পতাকার সঙ্গে সি. পি. আই (এম)-এর লাল পতাকা ওড়ে কীভাবে? লোকদলের সঙ্গে সি. পি. আই (এম) হিন্দি বেল্টে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু সফল হয় নি। এখন তারা অন্ধ্রের গ্রামাঞ্চলে ঢুকতে চাইছে। এন. টি. আর. কে ধরে। এমন রাজনৈতিক লাইন কতদূর সফল হয়; সেটাই দেখার। □

মুকুন্দন সি. মেনন

সর্বভারতীয় নারী আন্দোলনের সংহতি ও সমন্বয়ের সন্ধানে একটি সম্মেলন

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে

গত ৫-৬ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায়. শ্রেণী ও সামাজিক স্তর থেকে মহিলারা এসেছিলেন এতে অংশ নিতে। এইসব অংশগ্রহণকারী মহিলাদের কেউ বিশিষ্ট কবি, কেউ আইনজীবী, কেউ সাংবাদিক, কেউবা অধ্যাপিকা। আবার ভারতব্যাপী সাড়া জাগানো কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃস্থানীয় অনেকে এসেছিলেন এই সম্মেলনে যোগ দিতে। সব মিলিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল কলকাতার এই মহিলা সম্মেলনে।

কনভেনশনের পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল একটি সারা ভারত মহিলা সেল। এই মহিলা সেলের পক্ষ থেকে গীতা দাশ জানান, কনভেনশনে প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক ও অতিথির সংখ্যা মিলিয়ে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশ। যোগদানকারী সংগঠনের সংখ্যা প্রায় সত্তর। ব্যক্তিগতভাবেও হাজির ছিলেন অনেক বিশিষ্ট মহিলা। মোটামুটি ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি বাদে সব রাজ্যেরই প্রতিনিধিত্ব ঘটেছিল এই কনভেনশনে। উদ্দেশ্য ছিল নারী নির্যাতন ও মর্যাদার প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে আন্দোলনগুলো চলছে তাকে একটা সংহত রূপ দিতে সমন্বয়ধর্মী কোনো কাঠামো গড়ে তোলা।

মহিলা সেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, আলোচ্য বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক কৃষক রমণীরাও গভীর মনোযোগে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনায় মগ্ন থাকেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলে বোঝা যাবে না কী সেই তাগিদ যার ফলে এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকে মহিলা আন্দোলনের নেত্রী ও কর্মীরা সুদূর কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন।

সাম্প্রতিককালের অন্যান্য বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে বধূহত্যা বধূ নিপীড়ন, গণধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনাগুলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একই ঘটনা অতীতেও সমানভাবেই ঘটেছে। তাই নারী নির্যাতন বা বধূহত্যা নতুন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু বিশিষ্টতা এর এখানেই যে শুধুমাত্র নারী নির্যাতনের প্রশ্নে স্বতন্ত্র নারী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠা এবং নারীর স্বাধিকার ও পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদার প্রশ্নটি খুব জোরের সঙ্গে ইদানীং উঠছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, ১৯৭৫ থেকে '৮৫—এই দশ বছরকে নারী দশক হিশাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণা করা। এবং সেই সঙ্গে নারীর মর্যাদার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসা। এরই পরিণামে ১৯৭৫ সালেই পুনায় অনুষ্ঠিত হয় নারী মুক্তি সম্মেলন। গ্রাম শহর নির্বিশেষে প্রায় ৭৫০ জন মহিলা এই সম্মেলনে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, সেই বছরই জুন মাসে এদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং এই সম্মেলনের নেত্রীরা বেশিরভাগই পরে গ্রেপ্তার হন।

১৯৭৬ সালে নারী অধিকারের প্রশ্নে গড়ে ওঠে পুরোগামী নারী সংগঠন স্ত্রীমুক্তি সংগঠন এদের চাপে সমমজুরির আইন প্রবর্তিত হয়। ৭৮-এ বম্বেতে গড়ে উঠল আরো একটি সংগঠন—সমতা এদের

অন্যতম কর্মসূচি হিশাবে প্রকাশ হতে শুরু করল 'মানুষী' পত্রিকা।
এভাবেই গত দশ বছরে মহিলা সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপকতা দেখা দেয় ১৯৭৯ সালে মথুরা নামে এক আদিবাসী হরিজন বালিকার উপর পাশবিক বলাৎকারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে একটা আলোড়ন দেখা যায়। বিভিন্ন মহিলা, গণতান্ত্রিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ধর্ষণ আইন বদলের দাবি ওঠে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মথুরাধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন তাদের স্থানীয় বিভিন্ন সমজাতীয় ঘটনার প্রতি নজর দেয়। এবং তাই নিয়ে লড়াইয়ে মেতে ওঠে।
মথুরাধর্ষণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন সংগঠন ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেশন অন ওম্যান বোম্বাইতে ১৯৮০ সালে একটা সম্মেলন ডাকে এবং সমস্ত নারী সংগঠন যেগুলো মূলত বুদ্ধিজীবী উচ্চ শিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত, একটি সারা ভারত নারীবাদী নেটওয়ার্ক-এর সূচনা করে। এই নেটওয়ার্ক-এর কাজ হল বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিভিন্ন ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটানো ১৯৮৪ সালে আবার ত্রিবান্দ্রমে একটি সমজাতীয় নারী সম্মেলন হয়। এই দুটো সম্মেলনই নারী আন্দোলনকে সমন্বিত করতে ব্যর্থ হয়। এবং নারী আন্দোলনের সামনে নারীবাদী ধারার নেতৃত্বের প্রশ্নে জটিলতা থেকে যায়। এর পর চারমাসের মধ্যে বম্বে এবং কলকাতায় বর্তমানে আলোচ্য সম্মেলন দুটি অনুষ্ঠিত হয়। এবং তখনই নারী আন্দোলনে সমন্বয়ের প্রশ্নটি উচ্চমার্গে পৌঁছয়।
বোম্বাই সম্মেলনেই প্রথম রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা ইউনিটগুলির প্রবেশ অবাধ করা হয়। ফলত এই সম্মেলনে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ আধিপত্য থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নারীবাদী ধারণার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের প্রশ্নটিও আলোচিত হয়। এবং সিদ্ধান্ত হয়, নারী আন্দোলন তার স্বাধীনসত্তা বজায় রেখে পিতৃতান্ত্রিকতা এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলবে।
কিন্তু বোম্বাই সম্মেলনের অন্যতম ব্যর্থতা হল, কৃষি ক্ষেত্রে এবং কারখানায় আন্দোলনরত নারীদের এবং আসাম ধরনের জাতীয় আন্দোলনের মহিলা সংগঠনগুলিকে শামিল করতে না পারায় তা সমাজের উচ্চবিত্ত উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কলকাতা সম্মেলন এই সমস্যার সমাধান করেছে এই সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল বিহার, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কৃষক এবং শ্রমিক মহিলারা।
কলকাতা সম্মেলনের প্রথম পর্যায়েই ছিল বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা। সেক্ষেত্রে বিহারের কৃষক মহিলারা ও অন্ধ্রের গিরিজন মহিলারা বর্ণনা করেন, কীভাবে তারা সামন্তজমিদার এবংউচ্চজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। একই রকমভাবে আসাম পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন প্রতিনিধিরা। সেইসঙ্গে বিভিন্ন হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত তদন্ত ও আন্দোলনের বর্ণনা তো ছিলই।
সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়টিই বলা যায় আজকের নারী আন্দোলনের বিকাশের প্রশ্নে নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ইতিমধ্যে বর্ধিত সামাজিক জুলুম এবং প্রতিবাদরত নারী সংগঠনগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সর্বস্তরে এক নারীবাদী দৃষ্টিকোণের জন্ম দিয়েছে। এই নারীবাদী ঝোঁক সামাজিক অন্যান্য স্তরের আন্দোলন থেকে সাধারণ নারী সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে পুরুষবিরোধী একটা মনোভাবের জন্ম দিচ্ছে। কলকাতার সম্মেলনেও প্রধানত আলোচনা তাই কেন্দ্রীভূত হয় এই নারীবাদী দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার সম্পর্ক ও পার্থক্য এবং লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও সংঘাতের প্রসঙ্গ।
নারীবাদীরা মনে করে, নারীত্বের এবং উর্বরতার উপর পুরুষ প্রাধান্যই মহিলাদের দাসত্বের ভিত্তি। নারীবাদীরা অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত এদের একটি স্বতন্ত্র সংগঠন বা দল কেন বর্তমান? তাহলে কোনটা মার্কসবাদ? আর এইরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে মৌল নারীবাদীরা এক চূড়ান্ত নৈরাজ্যমূলক ধারণা তৈরি করে। তাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যারা মাতৃত্বকেই অস্বীকার করে। এদের মতে প্রত্যেক পুরুষই পশুত্বের অধিকারী এবং ধর্ষণকারী।
কলকাতা সম্মেলনেও নারীবাদীদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে বহুভাবে। মূলত বোম্বাই-এর ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেশন, কানপুরের মহিলা মঞ্চ সখী কেন্দ্র, নাগপুরের ফোরাম এগেনস্ট রেপ ইত্যাদি হচ্ছে এইরকম নারীবাদী সংগঠন
কলকাতা সম্মেলনে এর বিরুদ্ধ মতটাই ছিল জোরালো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতাও এই মৌল নারীবাদের বিরুদ্ধে।

ত্যাগরাজ হলে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন

শাখা একবিবাহভিত্তিক পরিবারের ধারণাকে অস্বীকার করে এই এক বিবাহব্যবস্থার বিপরীতে তারা স্ত্রী পুরুষের একটি সাধারণ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একত্র বসবাস এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাধীনতার ধারণা পোষণ করে। তাদের মতে পিতৃতান্ত্রিকতা হল একটি ব্যবস্থা। যৌন ভিত্তিক শ্রমবিভাজন হল তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটাই সমাজে মহিলাদের অধস্তনের ভূমিকা দেয়। তারা নারীদের সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেয় তা হল, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে-কোনো সমাজসংস্কারকমূলক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যাই হোক না কেন তা পুরুষের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এবং মহিলাদের সেখানে শুধুমাত্র একটি সংখ্যা হিশাবে এবং মজুত বাহিনী হিশাবে দেখানো হয়। বামপন্থী ও মার্কসবাদী ধারণার বিরুদ্ধে তাদের ধারণা হল, তারা শ্রেণী কর্তৃত্বের অবসানের কথা বলে কখনই পারিবারিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে না। তারা আলাদাভাবে মহিলাদের সংগঠিত করলে তা মূলত পার্টির কর্তৃত্বেই চলে মার্কসবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে নারীবাদের আর একটি অভিযোগ হল, চীন, রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও সেই সব দেশে নারীদের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। এর কারণ মার্কসবাদ অর্থনৈতিক শোষণের উপর বেশি জোর আরোপ করে মহিলাদের সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বুঝতে তারা ব্যর্থ। তাছাড়া একই মার্কসবাদের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশে এতগুলো নারীবাদী উগ্র পুরুষ বিরোধিতার উৎস হিশাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের উচ্চবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত সেই সব মহিলারা, যারা তাদের পারিবারিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পুরুষের অধীনতা ছাড়া সামাজিক কোনো শোষণকে উপলব্ধি করেন না বরং নিজেরাই নিম্ন শ্রেণীগুলিকে শোষণের দ্বারা বেঁচে থাকেন, তারা পরিবারে পুরুষ কর্তৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে সমাজে পুরুষ কর্তৃত্বের ধারণাকে চাপিয়ে দেন এবং এটাকেই সমগ্র নারী সমাজের একমাত্র সমস্যা হিশাবে হাজির করেন। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে আসামের জনৈক অধ্যাপিকা বলেন, মার্কসবাদই একটি বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এবং তা নারী মুক্তির সঠিক নিশানা দেয়। মার্কসবাদীদের পক্ষে আরও বলা হয়, আলাদাভাবে নারী মুক্তি সম্ভব নয়। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মুক্তির সঙ্গে নারীমুক্তির প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তাই শ্রেণী সংগ্রামের অমীমাংসিত স্তরে বিচ্ছিন্ন নারীমুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলাটা শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাই সংগ্রাম চলবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়।
এই জটিল বিতর্কের অবশ্য কোনো মীমাংসা সম্মেলনে হয় নি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সারা ভারতের আন্দোলনরত নারী সংগঠনগুলিকে একটি ন্যূনতম কর্মসূচিতে ঐকবদ্ধ করা, তা সম্পন্ন হয় নি। ঐক্যের সমস্যাই থেকে গেছে তীব্রভাবে। বুদ্ধিজীবীসুলভ বিতর্কের গাড্ডায় পড়ে তার গতিমুখ নির্ণয় করা যায় নি বলাই বাহুল্য.

চুলচেরা এই বিতর্কের অংশীদার ছিলেন মূলত বুদ্ধিজীবীরাই। আর বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় আন্দোলনরত সেইসব শ্রমিক কৃষক মহিলারা ছিলেন মূলত শ্রোতা।

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে জ্বলন্ত যে সমস্যা, যা তাবৎ মুসলিম নারী সমাজের মর্যাদা এবং বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই প্রস্তাবিত মুসলিম অধিকার রক্ষা বিল নিয়েও আলোচনা হয় সম্মেলনে। উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক তসবীর নাকভী এবং কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মুসলিম মহিলার অধিকার রক্ষা কমিটির সম্পাদিকা মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী মুসলীম মহিলাদের অধিকার হরণকারী এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, শরীয়তের দোহাই দিয়ে মুসলিম নারীর অধিকার হরণ এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভবিষ্যতে মনু, স্মৃতি ইত্যাদির বিধানের সূত্র ধরে হিন্দু মহিলাদের অধিকারও কেড়ে নেয়া হতে পারে। তাই দরকার সবার জন্য একটা নতুন সিভিল কোড। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন, ডাঃ সীমা শাখারে। নিজের উদ্যোগে তিনি নাগপুরে ৬০০ ধর্ষণের মামলা লড়ছেন। এবং বিদর্ভ অপরাধ আইন '৮৩-র সংশোধনী গ্রহণ করতে বাধ্য করান মহারাষ্ট্র সরকারকে। রজনী বক্সী একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। নন্দিনী হাকসার দিল্লির বিশিষ্ট আইনজীবী এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী। গেইল ওমভেট জন্মসূত্রে আমেরিকান। ভারতীয় নাগরিক, বোম্বাইয়ে বিশিষ্ট নারী আন্দোলনের নেত্রী ও বামপন্থী সাংবাদিক। তারণ গুজরাল দিল্লির প্রতিষ্ঠিত কবি। এছাড়া তসবীর নাকভি, মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী, কাজল আচার্য, অপর্ণা মহন্ত, নির্মলা শাঠে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম (বিপ্লবী) সংস্থার প্লট (P-OT)-এর দুজন মহিলা বিপ্লবীও তামিল প্রতিনিধিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নারী আন্দোলনের থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন।

সম্মেলন শেষে প্রত্যেক রাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি যোগাযোগ টিম তৈরি হয়। উদ্দেশ্য পরস্পরের সংগ্রাম সম্পর্কে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল রাখতে নিয়মিত খবরাখবর আদানপ্রদান। এর মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সংগ্রামের পরিকল্পনার রূপায়ণে পরস্পর সহযোগিতা সম্ভব হবে।

এই সমগ্র নারী সম্মেলনটির ব্যবস্থাপক ছিলেন ইন্ডিয়ান পিপলস্‌ফ্রন্ট। এজন্য তারা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মহিলাবুদ্ধিজীবীদের কাছে গিয়েছিলেন তাঁদের সমর্থন সংগ্রহের লক্ষ্যে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন—মহাশ্বেতা দেবী, অপর্ণা সেন, মমতাশঙ্কর, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য, স্বপ্না দেব, সাজেদা আসাদ, যশোধারা বাগচী, মালিনী ভট্টাচার্য, অমিয়া রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

৫ এবং ৬ এপ্রিল দুদিন সম্মেলনের পর ৭ এপ্রিল আই পি এফ-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন প্রগতিশীল মহিলা সমিতির উদ্যোগে এসপ্ল্যানেড ইস্টে একটি মহিলা সমাবেশ এবং জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রায় দেড় হাজার কৃষক শ্রমিক এবং অন্যান্য স্তরের মহিলাদের সামনে সম্মেলনে যোগদানকারী বিশিষ্ট মহিলানেত্রীরা বক্তব্য রাখেন।

সভাশেষে প্রস্তাবিত নারীবিলের প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যপালকে একটি স্মারকপত্র দেওয়া হয়। □

বরেন ভট্টাচার্য

যাদবপুর থানা লকআপে আনোয়ার আলীর মৃত্যু

এপ্রিলের ১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুরের আনোয়ার আলীকে পুলিস গ্রেপ্তারের পর এপ্রিলের ১৯ তারিখ পুলিস আনোয়ারের ভাই আনসার আলীকে যাদবপুর থানায় ডেকে পাঠিয়ে হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলে কাটাপুকুর মর্গ থেকে সে যেন আনোয়ারের মৃতদেহ নিয়ে নেয়।

বাইশ বছরের যুবক আনোয়ার আলী রিক্সা চালাত। এর আগে সে ছিল 'মেকানিক্যাল হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টস' নামে যাদবপুরের একটি ছোট কারখানার দক্ষ শ্রমিক। কারখানাটি বন্ধ হবার পর রিক্সা চালানোই ছিল তাঁর পেশা। আনোয়ারের দাদা সওগত নিজেও একটি বন্ধ কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক। ইলেকট্রিক ওয়েলডিং-এ অত্যন্ত দক্ষতা থাকায় এখন এখানে ওখানে ঠিকা কাজ করে বেড়ান, যদিও মাসের মধ্যে ২০ দিনই কাজ থাকে না। আর ছোট ভাই আনসারের আছে স্কুলের জন্য ভ্যান, রিক্সা ও সকালবেলা শিশুদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসা। ১৭ এপ্রিল সকাল ১১টায় আনসারের ছোট ছেলে ওকে এসে জানায় 'কাকাকে পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে গেছে।'

আনোয়ার আলীর মা এবং পরিবারের **অন্যান্য**

আনসার আমাদের জানিয়েছে ১৬ এপ্রিল একটি ছিনতাইয়ের ঘটনার পর পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায় সে ব্যাপারে আনসার এখনও কিছুই জানে না। বিকেলে আনসার খবর পায় পড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে থানায় পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে। আনোয়ারের স্ত্রী এবং বোন যাদবপুর থানায় খোঁজ করতে যান। থানা থেকে জানানো হয় সেখানে আনোয়ার নেই। পরদিন, অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল শুক্রবার সওগতের স্ত্রী রেহেনা এবং বোন ফতেজা সকাল ৭টায় যাদবপুর থানায় গিয়ে আবার খোঁজ করলে পুলিস ওঁদের জানায় যে গতকাল রাতে আনোয়ার আলী নামে একজন কয়েদী এসেছে, পুলিস লকআপে আছে। রেহেনা এবং ফতেজা দেখা করতে চাইলে অফিসার অনুমতি দেন। তখন লকআপে আনোয়ার ঘুমিয়েছিল। ওঁদের ডাকে ঘুম থেকে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। আনোয়ার জানায়, 'আমি চুরি ছিনতাই কিছু করি নি, আমাকে ভুল করে ধরেছে, আজ কোর্টে পাঠাবে, দু'এক দিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাব।' রেহেনা এবং ফতেজা পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ওঁরা আনোয়ারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার পর ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জামা-কাপড় কোথাও একটুও ছেঁড়া ছিল না, কোথাও কোনো রক্তের দাগ ছিল না, শরীরের যেটুকু অংশ দেখা যায় সেখানে তাঁরা কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখেন নি। ওঁদের সঙ্গে আনোয়ার অনেকক্ষণ কথা বলেছে, হেসেছে।

আনোয়ার ওঁদের জানিয়েছিল, ১৭ এপ্রিল রাত দশটায় পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে। সকাল ৭টায় রেহেনারা ফিরে যাবার পর আনোয়ারের দ্বিতীয় স্ত্রী মিনু থানায় এসে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চান। পুলিস এবারে ওঁকে দেখা করতে দেয় নি। পুলিস জানায় কিছুক্ষণ বাদেই কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে আনোয়ারকে। মিনু কোর্টে গিয়ে একজন মুহুরীর সঙ্গে টাকা-পয়সা দিয়ে বন্দোবস্ত করে কিন্তু সারাদিনেও আনোয়ারকে কোর্টে পাঠানো হয় নি। পরের দিন ১৯ এপ্রিল সকালে আনোয়ারের ছোট বোন ফতেজা যাদবপুর থানায় যায়। থানা থেকে বলা হয় আনোয়ার নামের কোনো আসামী লকআপে নেই। ১৫-১৬ বছরের ফতেজা অবাক হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি এসে দাদা সওগত আলীকে পায় না কারণ সওগত সকাল থেকেই কোর্টে বসে আছেন আনোয়ারের আশায়। বেলা তিনটে পর্যন্ত বসে থেকে সওগত বুঝতে পারে পুলিস আজ আর আনোয়ারকে কোর্টে হাজির করবে না। ইতিমধ্যে দুপুর ১২টায় যাদবপুর থানা থেকে আনোয়ারের ভাই আনসারকে ডেকে পাঠানো হয়। আনসার হাজির হলে থানার বড়বাবু একটি কাগজ আনসারের হাতে ধরিয়ে দেয়, কাটাপুকুর মর্গ থেকে ডেডবডি নেবার জন্য। শনিবার দিন চারটেয় ওরা মর্গে হাজির হয়, কিন্তু ডাক্তার না থাকায় মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। পরদিন রবিবার। সোমবার দুপুরে আনোয়ারের আত্মীয়স্বজনরা মৃতদেহ মর্গ থেকে নিয়ে আসে এবং যাদবপুরেই আনোয়ারকে কবর দেওয়া হয়।

যাদবপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে থানা থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে থানায় দিয়ে যায় নি। শুক্রবার দুপুর ১-২০ মিনিট নাগাদ একটা টেলিফোন পেয়ে পুলিস যাদবপুরের কাছে কাটজুনগর পোস্ট অফিসের কাছ থেকে সাংঘাতিক আহত আনোয়ারকে তুলে আনে।

১৮ এপ্রিল শুক্রবার রেহেনা এবং ফতেজা যে লকআপে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করেছে এবং কথা বলেছে এই ঘটনা পুলিসের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা দেড়টা নাগাদ পুলিস আহত আনোয়ারকে তুলে নিয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠায়। বেলা ১-৪৫ মিনিটে বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে আনোয়ারকে মৃত ঘোষণা করা হয়। শনিবার দুপুরে পুলিস বাড়ির লোককে ডেকে পাঠায় এবং কাটাপুকুর মর্গ থেকে আনোয়ারের মৃতদেহ নিয়ে নিতে বলে। শনিবার সকালে আনোয়ারের বোন থানায় গেলে কেন বলা হয়েছিল, এই নামের কোনো অভিযুক্ত নেই, এর উত্তরে থানা থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে আনোয়ারের বাড়ি থেকে কেউই থানায় যায় নি। □

শুভাশিস মৈত্র

গোল টেবিল

মুসলিম নারী বিল

দিল্লিতে, বিঠল ভাই প্যাটেল হাউস-এ ২৩ এপ্রিল আমাদের গোল টেবিল-এর বিষয় ছিল মুসলিম নারী বিল। সম্প্রতিকালে যে বিলটিকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার দুই শিবিরে খোলাখুলি ভাগ হয়ে গেছে।

শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত, প্রায় অশীতিপর এক বৃদ্ধা নারীকে কেন্দ্র করে প্রবল সেই আলোড়নে সঙ্গত কারণেই আমরা তৃতীয় পক্ষ হতে চাই নি। কিন্তু প্রশ্নটি যখন ধর্মের খোলস ভেঙে হয়ে উঠেছে নারী সমাজেরই মর্যাদার বিষয় এবং একজন ভারতীয় নারীর সাংবিধানিক অধিকারের প্রশ্ন, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মত এবং ধর্মের মানুষই আর এই প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না।

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একই রকম নাগরিক অধিকার দানের পরিবর্তে, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর, সমাজের একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশকে, ধর্মের নামে, সাংবিধানিক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য সংশোধিত হতে চলেছে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা। ৩০ বছর আগে, হিন্দু কোড বিল প্রবর্তনের সময় জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, সমস্ত ভারতবাসীর জন্য সম অধিকার বিধি প্রচলন করতে পারলে আমরা সবচেয়ে সুখী হতাম। কিন্তু অনগ্রসর মুসলমান সমাজের কথা ভেবে সেই পদক্ষেপ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হল। আশায় থাকব আগামী দিনের, যে দিন মুসলমান সমাজ এগিয়ে এসে নিজেরাই এই অধিকার আদায় করে নেবেন

তিরিশ বছর পর, ভারতের নবীন প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর—যিনি তাঁর মাতামহও বটেন—সেই প্রত্যাশা পূরণ করলেন মুসলমান সমাজকে আরো অনেক অনেক পিছনে ঠেলে দিয়ে।

শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় এবং মুসলিম মহিলা বিলকে কেন্দ্র করে, দুই কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে, সমস্ত রাজনৈতিক দলও আজ দ্বিধা বিভক্ত। লোকসভাতেই সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আর একজন মন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের রায়ের সমর্থনে এবং মুসলিম মহিলা বিলের বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। জনতা দলের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই নেতা লোকসভাতেই প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এই বিলের প্রসঙ্গে। তথাকথিত প্রগতিশীল এবং আক্ষরিক অর্থে আধুনিক মুসলমান কোনো কোনো মহিলার বিলের সমর্থনে এগিয়ে আসাতেও অপার বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলমান সমাজের মধ্যে মৌলবাদীরা যখন ইসলাম বাঁচাও রণধ্বনি দিয়ে বিলের স্বপক্ষে জনমত সংগঠিত করছেন, আর ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে, ভারতীয় হিশেবে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, তখন আমরা বিষয়টি সম্পর্কে একটা খোলাখুলি আলোচনা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবার দায় বোধ করছি

প্রতিক্ষণ আয়োজিত অন্য সব গোল টেবিল-এর চাইতে এই গোল টেবিল সংগঠিত করবার অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। মুসলিম নারী বিল বিষয়ক এই বিতর্কে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই বিল এবং তার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত। মুসলিম নারী বিল সংক্রান্ত এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন

আরিফ মহম্মদ খান : লোকসভায় বিল উত্থাপনের আগে পর্যন্ত যিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। বিলের বিরোধিতায়, নীতিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।

সৈয়দ শাহবুদ্দীন : প্রাক্তন আই. এফ. এস, এখন জনতা দলের প্রথম সারির নেতা। শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে বিহারের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে লোকসভায় এসেছেন।

গীতা মুখার্জি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য। নারী আন্দোলনের সঙ্গে চল্লিশের দশক থেকে যুক্ত। বর্তমানে লোকসভার সদস্য।

ভিমলা ফারুকি ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন-এর সাধারণ সম্পাদিকা। নারী আন্দোলনের একজন প্রধান নেত্রী।

চৌধুরী রহমত আলি : অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে লোকসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য। মুসলিম নারী বিল-এর সমর্থক।

সৈফুদ্দিন চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই. এম দলের প্রাক্তন ছাত্র নেতা। বর্তমানে লোকসভার সদস্য। ইনিই মুসলিম মহিলা বিলকে অভিহিত করেছেন 'কালা বিল' নামে

এই গোল টেবিল ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যা থেকে।

আন্তর্জাতিক

লিবিয়া

ব্ল্যাক ফ্লাই থেকে মিসাইল

"১৭ বছর আগে কেউ যদি আমার কোনও মেয়েকে হত্যা করত, তাহলে সেই হত্যাকারীর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতাম না। যতদিন জীবন থাকত, ততদিন প্রতিশোধের স্পৃহাও থাকত", লিবিয়ায় মার্কিন বিমান আক্রমণের সমালোচনায় এই তীব্র মন্তব্য করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার, গত ১৯ এপ্রিল। এ. এফ. পি সংবাদসংস্থা জিমি কার্টারের এই বিবৃতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে জানায়, কার্টারের মতে বিমান হানা ঠিক হয় নি। এটা যে ভুল সিদ্ধান্ত, ভবিষ্যতই তা প্রমাণ দেবে।

গত ১৫ এপ্রিল মার্কিনি বিমান লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি ও বেনগাজি শহরে যে প্রবল আক্রমণ করে, তাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১০০ জন, লিবিয়ার নেতা চুয়াল্লিশ বছরের মুয়াম্মার গদ্দাফির ১৬ মাসের পালিতা কন্যা হান্না মৃতদের তালিকায় অন্যতম আহত হয়েছেন গদ্দাফির দুই পুত্র।

১৮০১ সালে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের একটা স্কোয়াড্রন জাতীয় পতাকা উড়িয়ে লিবিয়ার উপকূলে নোঙর ফেলে। লিবিয়ার নাম তখন ছিল ত্রিপোলিতানিয়া। কেন এসেছিল মার্কিনীরা? তখন তাদের যুক্তি অনুযায়ী জলদস্যু দমনের উদ্দেশ্যে (বিশ শতকে তারা যায় সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করতে)। কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় ১৮০১-এ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে মার্কিনি উপস্থিতির অন্য উদ্দেশ্য ছিল—আফিম আমদানি। অত্যন্ত সস্তায় সহজলভ্য আফিম কিনে মার্কিন ব্যবসায়ীরা নিয়ে যেত চীনে, উনিশ শতকের প্রথমেই সে পরিমাণ ছিল চার-পাঁচ টন। চীনাদের নেশাখোর করে তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাভ করত লক্ষ লক্ষ ডলার।

এখন বিপুল লাভজনক এই আফিম ব্যবসা চলত ভূমধ্যসাগর দিয়েই। স্থানীয় শাসকরা স্বভাবতই তাদের জলভাগ ব্যবহার করবার জন্য মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করতে চাইত। কিন্তু লাভের অংশ থেকে এমন শুল্ক দেবার কোনো ইচ্ছেই মার্কিন ব্যবসায়ীদের ছিল না। তাই জলদস্যু দমনের অছিলায় তার ১৯ শতকেই রণতরী নিয়ে মার্কিনি সামরিক হুমকি দিয়ে যায় স্থানীয় শাসকদের।

১৮০৫ সাল থেকেই মার্কিন নৌ সেনাপতি ও কূটনীতিকরা ত্রিপোলিতানিয়ার বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে। একটি মার্কিনী স্কোয়াড্রন ত্রিপোলি অবরোধ করেছিল। তিউনিস ও ত্রিপোলিতে মার্কিন কনসালরা, রাষ্ট্রপতি জেফারসনের অনুমতি নিয়ে, ত্রিপোলিতানিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক আক্রমণের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি রাখে। ১৮০৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিউনিসের মার্কিন কনসাল উইলিয়ম এটন কর্তৃপক্ষকে লেখেন, ত্রিপোলিতানিয়ার পূর্বাঞ্চল সাইরেনাইকা প্রথমে দখল করে পরে সেখান থেকে মিশরের ভাড়া-করা সৈন্য নিয়ে ত্রিপোলিতে ঢোকা যাবে। এটন এজন্য সমুদ্র থেকে রণতরী সাহায্য চান। মেরিনদের সাহায্যে মার্কিন বাহিনী সেদিন লিবিয়ার শহর ডারনা দখল করে মার্কিন পতাকা তুলেছিল। ত্রিপোলি পর্যন্ত যাবার দরকার হয় নি। ত্রিপোলিতানিয়ার তৎকালীন শাসক ইউসুফ

ভিয়েতনামে মার্কিনী মানবতা

কারামানলি আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করেন। ত্রিপোলিতানিয়ায় এই মার্কিন আক্রমণের স্মৃতি মেরিনদের গানের প্রথম ছত্রে 'অমর' হয়ে আছে।

১৯৮৬-তে লিবিয়ায় মার্কিন হানার প্রসঙ্গে এমন ইতিবৃত্ত মনে আসেই।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান হোতা হচ্ছে এই গদ্দাফি একে ঠাণ্ডা করতে, দরকার হলে, আবার লিবিয়া আক্রমণ করবে মার্কিন বিমান। উপরাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ-ও বলেছেন এপ্রিল মাসের শেষে, দরকার হলে ফের হানা দেবে মার্কিনিরা। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা ও নিন্দেতে মুখর। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিশেবে ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আক্রমণকে লিবিয়ার বিরুদ্ধে নগ্ন আঘাত বলে বর্ণনা করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলীরাম ভগতের নেতৃত্বে একটি দল লিবিয়ায় গিয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসে, কারণ লিবিয়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম সদস্য। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গোর্বাচভের মতে, লিবিয়ার বিরুদ্ধে এই আক্রমণ আইন বিগর্হিত ও স্বৈরাচারীসুলভ। এমনকি ন্যাটো গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বৃটেনই তার বিমান ঘাটিকে এই আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র হিশেবে ব্যবহার করবার অনুমতি দেয় মার্কিন সেনাবাহিনীকে। মার্কিন বোম্বেটে বিমান ফরাসি দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করবার অনুমতি পায় নি মিতেরাঁর কাছ থেকে ফলে ১৮টি এফ-১১১ মার্কিন যুদ্ধবিমানকে ঘুরে দ্বিগুণ মাইল অতিক্রম করে, আকাশেই তেল ভরে নিয়ে, স্পেনের সীমান্ত দিয়ে ত্রিপোলি ও বেনগাজিতে পৌছুতে হয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের ধিক্কারের সামনে কেবল বৃটেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন জঘন্য আক্রমণকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানাল, এতে ন্যাটো (বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, স্পেন, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জোটের বাকি সবাই অপ্রস্তুত, লজ্জিত এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষুব্ধ।

আসলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে রেগন ও তাঁর প্রশাসনের চরম দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক মাস্তানি। যে কোনো রাষ্ট্রকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করতে পারে, যদি সেই রাষ্ট্রকে মার্কিন প্রশাসন তার গুণ্ডামি করার পথে অন্তরায় বলে মনে করে।

লিবিয়াকে আক্রমণ করবার অছিলা রেগন বহুদিন ধরেই খুঁজছিলেন। আসলে গদ্দাফি ক্ষমতায় আসবার পরই লিবিয়াতে মধ্যপ্রাচ্যের সবচাইতে বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি হুইলাস ফিল্ড বন্ধ করে দেন। রেগনের আক্রমণ গদ্দাফির সেই ঔদ্ধত্যের জবাব। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ শায়েস্তা করতে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কথাটা কেমন হাস্যকর শোনায় না?

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত অবাঞ্ছিত নানা বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে ৯০০ বার গোপন 'অপারেশন' করেছে কোন প্রশাসন? ১৯৫৩ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদেগকে হত্যা করেছিল কারা? ১৯৫৪-য় গুয়াতেমালায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় কোন দেশ? ১৯৬৫ সালে ডমিনিকান রিপাবলিক, ১৯৬৬-তে ঘানা, ১৯৭৩ সালে চিলিতে নৃশংস উদ্যোক্তা কে? কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা, চে গুয়েভারা, চিলির রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলিয়েন্দে, ওরল্যান্ডো লেতেলিয়ের, জেনারেল কার্লোস প্রাটস, বলিভিয়ার জুয়ান টোরেস, গিনির আমিলকার কাব্রাল, মোজাম্বিকের এডুয়ার্ডো মন্ডলেন, শ্রীলঙ্কার সোলোমন বন্দরনায়েকের হত্যাকারী কে? ফিদেল কাস্ত্রোকে [illegible] বার হত্যার চেষ্টা করেছে কারা? ভিয়েতনাম যুদ্ধে ২০০,০০০ মানুষের হত্যা ও

ভিনদেশে মার্কিন সেনা—'শান্তির' প্রতীক

১০০০,০০০ আহতের জন্য দায়ী কে? লাওস, কম্বোডিয়ায় গণহত্যার উদ্যোক্তা কারা? মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধ্বংসের পেছনে কাদের হাত? গ্রেনাডা আক্রমণ করেছিল কারা, এই ১৯৮৩ সালেই? পৃথিবীর সমস্ত জল্লাদ একনায়কদের আর্থিক, সামরিক ও প্রশাসনিক সাহায্য যোগায় কোন দেশ? কোন দেশে পৃথিবীর একনায়করা, খুনীরা রাজনৈতিক আশ্রয় পায়? নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতিতে প্রতিবিপ্লবীদের প্রচুর অর্থসাহায্য আসে কোন দেশ থেকে? এল সালভাদোরের ডেথ স্কোয়াডদের ট্রেনিং দেয় কোন দেশের উপদেষ্টা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণদ্বেষী সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কারা? ১৯৮৪ সালে পেন্টাগনের হিশেবেই বিভিন্ন দেশের ২৫ জন রাষ্ট্রপ্রধান, ১৬ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ২৫৮ জন সামরিক বাহিনীর প্রধান, ও ১,৮৩৪ জন সামরিক জেনারেল কোন দেশ থেকে মিলিটারি প্রশিক্ষণ পেয়েছে? শিখ উগ্রপন্থীদের মানুষ মারার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোথায়

উত্তর দুটি শব্দে দেওয়া যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এই তথ্যগুলো ইতিহাস সমর্থিত ও প্রমাণিত সন্দেহাতীতভাবে। খুব একটা গর্ব করবার মতো তালিকা নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে দমন করবার কথা বলে, তখন মনে হয়, নিজেদের কীর্তি রেগনকে স্মরণ করিয়ে দেবার মতো কেউ নেই। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চল্লিশতম বার্ষিক উদযাপন করেন রেগন জার্মানির বিটবুর্গে নাৎসী নায়কদের সমাধিতে গিয়ে, যখন সারা পৃথিবী ফ্যাসিবাদের পতনের চার দশক স্মরণ করতে উদ্যোগী ছিল।

মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কির মতে, মার্কিন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সংবাদমাধ্যম সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকেই লালন করে, পুষ্ট করে। যেমন, ১৯৭৫ সালের ৫ই এপ্রিল 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় বলা হয়, "ভিয়েতনাম যুদ্ধের ট্র্যাজিডি আসলে দুই বিরোধী মার্কিন প্রশাসনিক গোষ্ঠীর ভেতর একদলের পরাজয় উগ্রপন্থীরা বলেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিতবে, অন্য পক্ষের মতে, অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব।" ভিয়েতনামের যে যোদ্ধাদের হাতে মার খেয়ে মার্কিন প্রশাসনকে পালাতে হলো, বিশ্বব্যাপী যে শান্তি আন্দোলনের সামনে মার্কিন প্রশাসন দাঁড়াতে পারল না, সে সমস্ত বিষয় আলোচনার অংশই হয় না কখনও। চমস্কির মতে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য মার্কিনি ব্যবস্থা সব বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলেছে সুপরিকল্পিতভাবে, কিসিংগার যে ব্যবস্থাকে বলবেন 'দ্য এজ অব দ্য এক্সপার্ট'। বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে মতামত দেবেন। এই বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটি মার্কিনি সংস্কৃতিতে এমনভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের বাইরে অন্যধরনের যে কোনো সমালোচনাকেই 'বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী'-র মতামত বলে প্রতিষ্ঠা করতে সময় লাগে না। লিবিয়া সম্পর্কে কার্টারের মন্তব্য এই মুহূর্তে 'ডিসিডেন্ট ওপিনিয়ন'।

এই বিশেষজ্ঞরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতকে প্রভাবিত করবার সবচাইতে বড় নেটওয়র্ক। আর এই জনমত নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সত্যের অপলাপ, সংবাদ চেপে দেওয়া, জাতীয় স্বার্থে মিথ্যাভাষণের মতো অনৈতিক উপায় অবলম্বনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে না মার্কিন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। যেমন, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর পক্ষ থেকে আর্থার শ্লেশিঙ্গারকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, বে অব পিগস ঘটনার সময়ে তাঁর বিবৃতি আর পরে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য আলাদা কেন; শ্লেশিঙ্গার উত্তর দেন, 'আমি মিথ্যে বলেছিলাম।' 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-কেও শ্লেশিঙ্গার ধন্যবাদ জানান, ঐ পরিকল্পিত আক্রমণের তথ্য সেই সময় 'জাতীয় স্বার্থে' প্রকাশ না করবার জন্য। ১৯৮৪ সালে স্পেস শাটলে পেন্টাগন যখন 'সুপার সিকরেট' গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছিল মহাকাশে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাসপার ওয়াইনবারগার সেই তথ্য চেপে যাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা ও টিভি সংস্থাকে অনুরোধ করেন এবং কী কী বিপজ্জনক জিনিশ মহাকাশে গোপনে পাঠানো হচ্ছে, তার সমস্ত তথ্য টিভি সংস্থা এন. বি. সি-র হাতে থাকলেও এন. বি. সি-র প্রধান ভাষ্যকার, গোটা মার্কিন মুলুকে বিখ্যাত, জন চ্যান্সেলর সন্ধেবেলায় তাঁর কমেন্টারিতে বলেন, 'সরকার অনুরোধ করেছেন বলেই আমরা সে সব তথ্য প্রকাশ করছি না।' আসলে নিজেদের স্বার্থের কথা মনে রেখে 'সত্য' প্রকাশ করবার নীতি মূলত ফ্যাসিস্ট। যেমন ১৯৩৩ সালে মাইকেল হাইডেগার লিখেছিলেন, একটি ঘটনার যেটুকু তথ্য প্রকাশ করলে জনমত দৃঢ়, নিশ্চিত ও স্পষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে, সেইটুকু সত্যই কেবল প্রকাশ করা উচিত। লিবিয়া আক্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নয়া নাৎসী পররাষ্ট্র নীতিই কেবল প্রকাশ করল না, আক্রমণের আগে গদ্দাফির বিরুদ্ধে যে মিথ্যে কাহিনী প্রচার করে লিবিয়া-বিরোধী জনমত গড়ার চেষ্টা হয়েছে রেগন ক্ষমতায় আসবার পর, এবং মার্কিনি সংবাদপত্রগুলো যে ভূমিকা নিয়েছিল এই ব্যাপারে, সেটা এই নয়া-নাৎসী দর্শনেরই নিষ্ঠ অনুসরণ। উত্তর

ভিয়েতনামে যখন বোমাবর্ষণ শুরু হয়, আর সেই নৃশংস আক্রমণের সমর্থনে যেসব তথ্য প্রচারিত হলো, সে সব দেখে ভিয়েতনাম বিশেষজ্ঞ জঁ লোকোতুর বলেছিলেন, পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই আক্রমণ করবার 'অধিকার' যেন মার্কিন প্রশাসনের আছে, সারা পৃথিবীটাই যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারির জায়গা, যেন সারা পৃথিবীই শাসিত হবে মার্কিনিদের কথায়। লিবিয়ায় মার্কিন আক্রমণের শেষতম দৃষ্টান্ত এই নীতিরই সম্প্রসারণ কেবল, বরং বলা যায়, হিংস্র সম্প্রসারণ।

লিবিয়া মার্কিন-বিরোধিতার প্রধান সংগঠকদের অন্যতম। গদ্দাফি ক্ষমতায় আসবার পরই উইলাসাফিল্ড এয়ারবেস বন্ধ করে দেওয়ায় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় মার্কিন প্রভাব বিস্তারে অসুবিধে হয়। তেলের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। যে সব দেশ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বসাবার অনুমতি দিয়েছে, গদ্দাফি সে সব দেশের সমালোচনা করেন। মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে জিমি কার্টারের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিরুদ্ধতা করেন গদ্দাফি পি. এল. ও-কে সমর্থন যোগান গদ্দাফি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে এটাই অপরাধ। ফলে গদ্দাফিকে শায়েস্তা করবার পরিকল্পনা হতে থাকে। আয়োজক, সি. আই. এ।

প্রথম পদক্ষেপ হিশেবে ওয়াশিংটনে লিবিয়ার দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হলো লিবিয়ার কূটনীতিকরা বহিষ্কৃত হলেন। লিবিয়া থেকে মার্কিন কূটনীতিকদের ফেরৎ আসার নির্দেশ গেল। লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করল মার্কিন প্রশাসন।

১৯৮১-র মে মাসে ওয়াশিংটনের শহরতলী ল্যাংলে-তে সি. আই. এ হেডকোয়ার্টারে ঐ সংস্থার তাবড়-তাবড় অফিসাররা মিটিং করেছিলেন গদ্দাফির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া, গদ্দাফিকে কীভাবে হত্যা করা যায় তা আলোচনা করতে। সেই আলোচনায় ঠিক হয়, এক ধরনের টাইগার-স্নেকের বিষ লাগানো সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ একটি শলাকায় লাগিয়ে গদ্দাফির শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমে ৪৮ ঘণ্টা গদ্দাফি কিছু বুঝতেই পারবেন না। তারপরই বিষক্রিয়ায় তিনি মারা যাবেন। অথচ বিষের কোনো চিহ্ন থাকবে না। যে লোকটি এই 'দুঃসাহসিক' কাজের দায়িত্ব পাবে, তাকে অনেক আগে থেকেই লিবিয়ায় চলে যেতে বলা হয়েছিল, যাতে গদ্দাফির কাছাকাছি যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। আর সেই সূচ যাতে কারও নজরে না আসে, কেউ যাতে বুঝতে না পারেন, তাকে বানানো হয়েছিল এক ধরনের মাছির আকৃতিতে, লিবিয়ার মরুভূমিতে যা খুবই সহজলভ্য—লিবিয়ায় ঐ মাছিকে ব্ল্যাক ফ্লাই বলে। কিন্তু অপারেশন ব্ল্যাক ফ্লাই রূপায়িত করা যায় নি।

চিলির দেশপ্রেমিক ওরল্যান্ডো লেতেলিয়ের-কে হত্যা করেছিল যে সি. আই. এ. এজেন্ট, সেই এডউইন উইলসনকে গদ্দাফিকে হত্যা করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় পরে। রোমে এই ব্যাপারে পরিকল্পনাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও গদ্দাফিকে মারা গেল না। তখন ১৯৮১-রই অগাস্ট মাসে ভূমধ্যসাগরে লিবিয়া উপকূলের কাছে আটটি এফ-১৪ মার্কিন যুদ্ধবিমান ষষ্ঠ নৌবহর থেকে দুটি লিবিয়ান বিমানের ওপর আক্রমণ চালায়। আর মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে, লিবিয়া আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল বলেই মার্কিন বাহিনী আত্মরক্ষায় তার জবাব দিয়েছে। প্রচার যন্ত্রের বিপুল প্রভাবে মার্কিন

গ্রেনাডা মার্কিন আক্রমণ কি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নয় ?

জনসাধারণ মার্কিন সংবাদসংস্থার খবরই কেবল বিশ্বাস করতে শিখেছে, কারণ সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার যে মিথ্যে ধারণা তৈরি করা হয়েছে আমেরিকায়, তা এমন ভেতর চারিয়ে গেছে যে সাধারণ মানুষ মনে করে, এন. বি. সি. বা এ. বি. সি., জন চ্যান্সেলর বা টম ব্রোকাও যা বলেন, সেটাই সত্য, টি.ভি-তে যা দেখানো হয়, সেটাই ঠিক।

জনসাধারণকে মিথ্যে সংবাদ বিশ্বাস করাবার এই নয়াগোয়েবেলসিও পদ্ধতিতে মার্কিন প্রশাসন এমনই আস্থাবান, যে, গদ্দাফিকে হত্যা করবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে থাকলে, সি. আই. এ. সংবাদপত্রে জানায়, টপ-সিকরেট এক্সক্লুসিভ খবর, লিবিয়ার গদ্দাফি নাকি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগনকে মারবার জন্য হিট স্কোয়াড পাঠিয়েছে। তারা ওয়াশিংটনের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে। যে কোনো সময় রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করতে পারে। অতএব, রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিপন্ন, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাই বিপন্ন অর্থাৎ লিবিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মার্কিন বাহিনী পিছ-পা হবে না। কাগজে, টি.ভি-তে প্রচার তুঙ্গে তোলা হলো। পরে দেখা যায়, সমস্ত ঘটনাটাই বানানো, সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে তৈরি, উদ্দেশ্য খুবই সরল—লিবিয়াকে আক্রমণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ পরিবেশ তৈরি করা (১৭ জানুয়ারি—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬, 'প্রতিক্ষণ'-এ 'লিবিয়ার প্রতি আমেরিকা এত ক্ষুব্ধ কেন ?' লেখাটি দ্রষ্টব্য)। এ বছর জানুয়ারি মাসে আমেরিকা লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল লিবিয়ায় ২,৫০০ কর্মরত মার্কিন নাগরিকদের ফিরে আসতে বলা হয় (তারা যদিও আসে নি); ৯ই জানুয়ারি লিবিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের ওপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাতেও লিবিয়াকে বাগে আনা যায় নি।

তাই ১৯৮৬-র ২৩ মার্চ সিদ্রা উপসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর তার সামরিক দম্ভ ও ক্ষমতা দেখায় সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র বিনিময় হয়েছিল। ঠিক তার ২৩ দিন বাদে এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্কিন সামরিক বাহিনী সরাসরি লিবিয়া আক্রমণ করে।

এই আক্রমণ বা তার আগের হুমকির পেছনে যে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখিয়েছে, তা সবই অপ্রত্যক্ষ কখনও রোম ও ভিয়েনা বন্দরে উগ্রপন্থী হানা, কখনও জার্মানির কোনো পানশালায় 'সন্ত্রাসবাদীদের' হানা—এসবের পেছনে লিবিয়ার হাত আছে, এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি হিশেবে দেখায় আক্রমণের আগে।

কিন্তু মার্কিনি সন্ত্রাসবাদের হিশেবটা দেবে কে যদি লিবিয়ার যোগসাজশ আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহলে তো হিরোশিমা-নাগাসাকি থেকে এল সালভাদোরের হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ মার্কিনি ভূমিকা তো সারা বিশ্বের নিরাপত্তার পরিপন্থী ! আসলে লিবিয়ার প্রতি এই মারমুখী মার্কিন আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; গোটা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চাপে একের পর এক দেশ মুক্ত হয়ে চলেছে, ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রভাব কমে যাচ্ছে যাতে এই প্রভাব থাকে, বাড়ানো যায়, কাঁচামাল শস্তায় আমদানি অব্যাহত থাকে, সে কারণেই মার্কিনি দর্শনের থেকে আলাদা নীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলোর বিরুদ্ধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই হিংসাত্মক ব্যবহার। গোটা আফ্রিকা জুড়েই মার্কিনি আগ্রাসন এখন প্রত্যক্ষ আক্রমণের চেহারা নিয়েছে। কিন্তু সবচাইতে লজ্জার কথা, রাষ্ট্রসংঘে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স। সারা পৃথিবীর মানুষ যেখানে ধিক্কারে মুখর, সেখানে ভেটো দিয়ে আক্রমণকে বৈধ ও আইনসঙ্গত করা যায় না। এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান নায়ক রোনাল্ড রেগন। তার প্রধান সমর্থক মার্গারেট থ্যাচার। এদের সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করাই এখন সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষদের প্রধান দায়িত্ব। □

সুমিত্র দেশপাণ্ডে

ক্রোড়পত্র/রবীন্দ্রনাথ
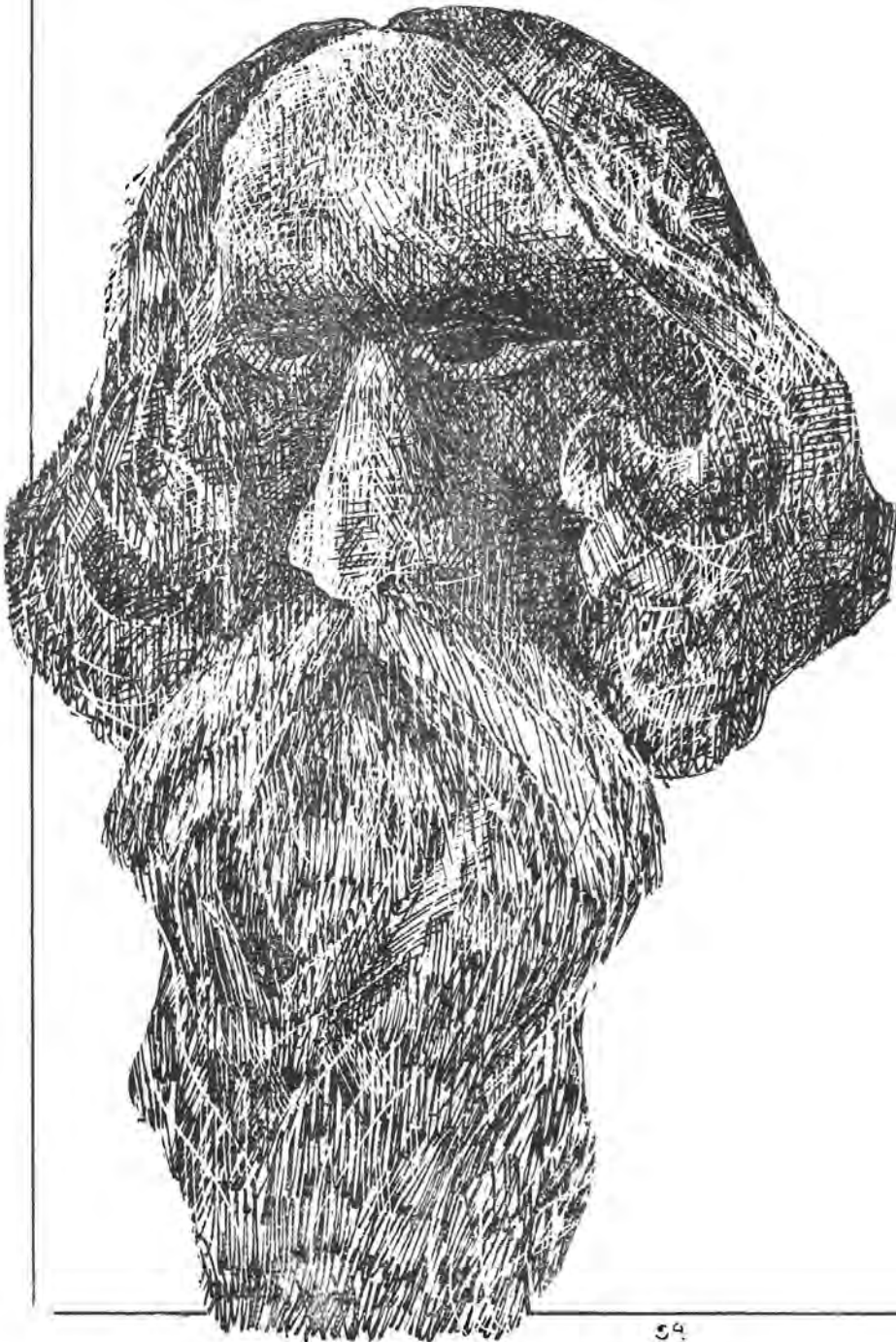
সিদ্ধেশ্বর সেন

তিনি

কবির-ই যে চরমে ধিক্কার
তাঁরই তো প্রেমের শেষ দায়
মেশিনগানের সামনে তিনি

তাঁরই তো প্রেমের শেষ দায়
যুঁই ফুলে উত্তরাধিকার
বৈশাখের অগ্নিভাষ্য শুনি

যুঁই ফুলে উত্তরাধিকার
শ্বেতপতাকার মতো হিয়া
উড়িয়ে অথৈ প্রতিরোধে

শ্বেতপতাকার মতো হিয়া
গড়বে না তেমন প্রতিরোধ
যেমন সে দানবিক বিক্রিয়া

গড়বে না মানুষী প্রতিরোধ
কবি-কে তোমার ঋণশোধে ?
এখানে-ওখানে জ্বলে লিবিয়া

নও কি গভীরে দানে ধনী
এই গ্রহ তোমারই মুখ চায়
তাঁর প্রেমে তোমারও যে দায়

তাঁর প্রেমে তোমারই তো দায়—
নক্ষত্রযুদ্ধে. কার ইতিবৃত্তে বেপথু মোড়ে,
নিরস্ত্র. নিষ্ক্রান্ত. হৃদয়াতুর.—ফিরবেন তিনি !!

ছবি পূর্ণেন্দু পত্রী

The Radial that's just right

APOLLO

POLYGLAS
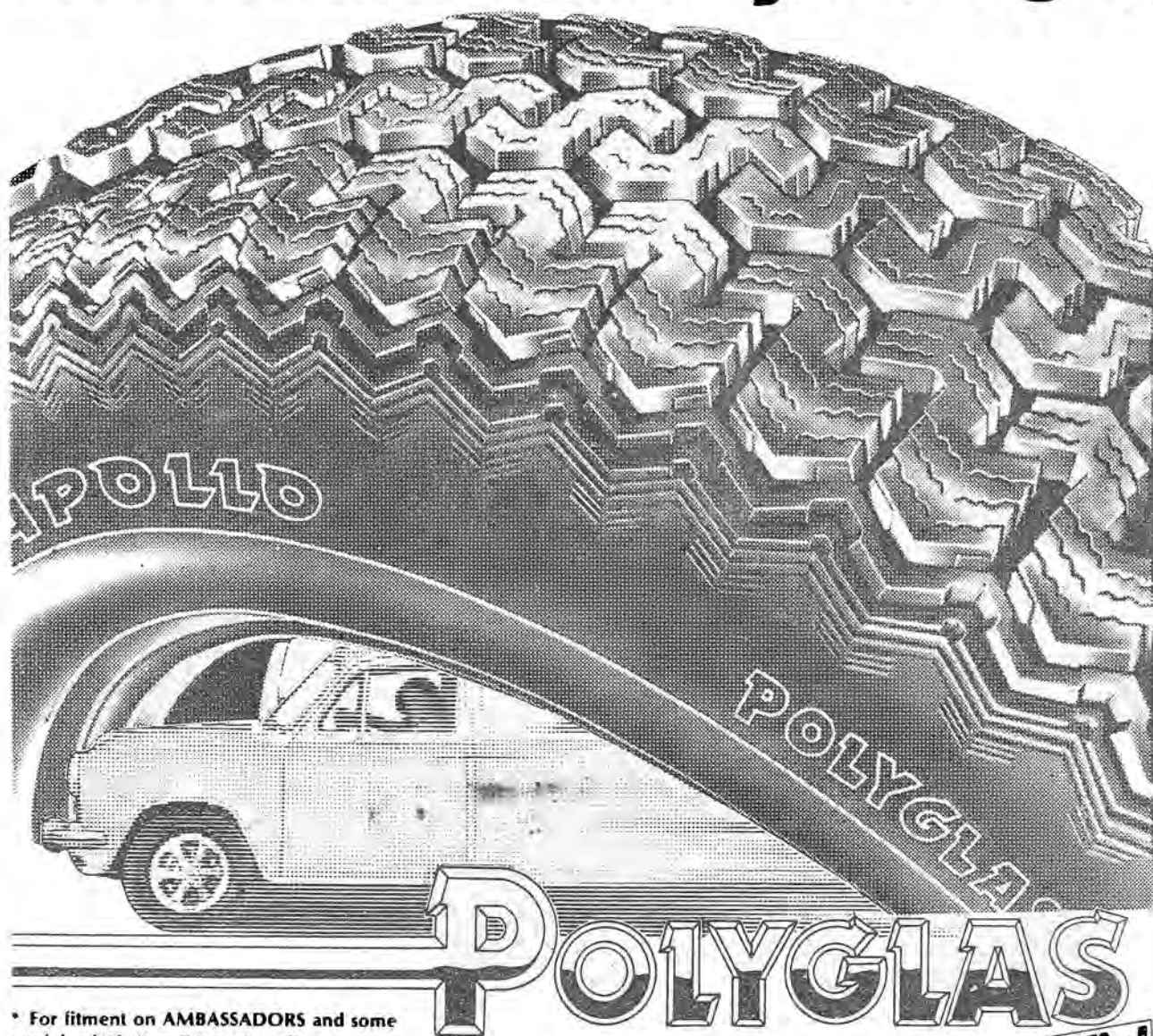
POLYGLAS

Radial

* For fitment on AMBASSADORS and some models of Citröen, Peugeot, Volkswagen, Porsche and Volvo.

Right for Indian Roads ! Right for Indian Cars !

The Right Radial

* Doubles your mileage.
* Safeguards your suspension.
* Cuts fuel costs.
* Gives you a cushioned ride.
* Designed for safety — no aqua-planing.
* Repeated retreadability.
* Protects against punctures.

রবীন্দ্রনাথ : জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

সত্যজিৎ চৌধুরী

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে কিছু কাজকর্ম যাঁরা করেন তাঁরা তথ্য সংগ্রহে শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশের নিরলস উদ্যমের খবর রাখেন। অকৃপণ সাহায্যও পেয়েছেন অনেকে তাঁর কাছ থেকে। তাঁর নিজের লেখার পরিমাণ অবশ্য বেশি নয়। সংগ্রহ সঞ্চয়ে যত সময় দিয়েছেন, গুছিয়ে লিখতে বসার জন্য তত সময় দেন নি কখনও। তাই অল্প সময়ের মধ্যে পর-পর তাঁর দুটি বই হাতে পাওয়া তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। দুটি বই-ই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' (জানুয়ারি ১৯৮৩) এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' (মে ১৯৮৫)। আমাদের দীর্ঘ জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ধারা সশস্ত্র সংঘাতের পথে বিদেশী শাসন উৎখাতের চেষ্টা—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন "অতিশয় পন্থা"। এই ধারাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের ইতিহাস দ্বিতীয় বইটি আগে পড়া যেতে পারে, কারণ, জাতীয়তার ভাবনার ভিতের উপরেই আন্তর্জাতিকতার ভাবনা গড়ে ওঠে। তরুণ বয়সের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে শেষ বয়সের 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের জটিল বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্বদেশ জিজ্ঞাসাই সম্প্রসারিত হয় সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাসের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসায়।

২

আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "আমি কবি মাত্র"। রাজনীতি যে তাঁর কাজের এলাকা নয়, বিশেষ করে একথা তিনি অনেক প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন এই স্বদেশের ইতিহাস কত বিঘ্নে প্রতিহত হতে হতে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ভারতীয় মনুষ্যত্বে আধুনিক মর্যাদা জাগছে কত দুঃখের অভিজ্ঞতায়—কবি হিশেবে সে বাস্তবের সারবস্তু দূর থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে এক শিল্পের ভুবন রচনা করে তোলা অসম্ভব ছিল না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। আঘাত সংঘাতের মাঝখানে এসে দাঁড়ানোর, দ্বন্দ্বময় বাস্তবে সাক্ষাৎ ভূমিকা নেওয়ার দায় না মেনেও একজন স্রষ্টা আপন সময়ের সত্য প্রকাশ যে করতে পারেন—শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টির এলাকায় তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই কিছু। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনাপঞ্জি তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূর্তি তুলে ধরে সে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকের চেহারা নয়। সামাজিক মানুষ হিশেবেই তিনি সাড়া দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ দায় কখনও অস্বীকার করেন নি। কখনও কখনও ঘটনার টানে একটু বেশিই জড়িয়ে যেতেন, প্রায় নেতৃভূমিকায় এসে দাঁড়াতেন, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। পরাধীন স্বদেশের জটিল বাস্তবতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি ও তত্ত্বগত অবস্থান দেশের নেতারা প্রায়ই অগ্রাহ্য করেছেন। সেই বঙ্গভঙ্গের দিন থেকে গান্ধীপর্ব অবধি রবীন্দ্রনাথ চলতি হাওয়ার পন্থী হতে পারেন নি। অপ্রীতিকর কথা বারবার বলেছেন, তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে জেনেও। তাঁর মত চাওয়া হোক বা না হোক, চুপ করে থাকেন নি কখনও। সাড়া দেবার এই অনিবার্য প্রবণতার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর সাহিত্যিক-সাংগীতিক সৃষ্টির পাশাপাশি স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে ধারাবাহিক অবলোকনে—প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, প্রাসঙ্গিক বাদ-প্রতিবাদে। উপন্যাসে তো বটেই, কবিতায়-গানেও অনেক সময়ে এসব সংকটময় আবর্তের ছাপ সরাসরি পড়েছে। রবীন্দ্র-চর্চার এই একটি বিশিষ্ট দিক, সঙ্কিত তথ্য সাজিয়ে বোঝা—কীভাবে তিনি সমকালীন বাস্তবকে দেখেছেন।
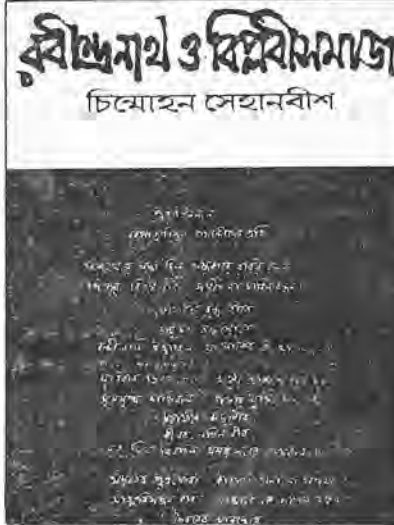
চিন্মোহন সেহানবীশের বিবেচ্য বিষয় স্বাদেশিক আলোড়নের একটি মাত্র ধারা—বিপ্লবী উদ্যোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। কিন্তু এমনই বিষয় এটি যে আলোচনায় একপেশে ঝোঁক এড়ানো বেশ কঠিন। লাগসই উদ্ধৃতির তোড়ে রবীন্দ্রনাথকে এক মহান বিপ্লবী প্রমাণ করে দিয়েছেন অনেকে। আবার বিপ্লবীদের কঠোরতম সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী—এমন প্রতিপাদ্যও পাওয়া যাবে কারো কারো লেখায়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ এমন কোনো সরল ধারণা মাথায় নিয়ে কাজটিতে হাত দেন নি। বস্তুত কোনো অটল সিদ্ধান্ত বের করে আনার ত্বরা নেই তাঁর। লেখার ধরন তাই নিরাবেগ, ধীরস্থির। পাঠককে তিনি অনুপুঙ্খ তথ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেন, ভাবতে সাহায্য করেন কিন্তু নিজের ভাবনা চাপিয়ে দেন না। প্রায়ই তিনি ইঙ্গিতময় প্রশ্ন তুলে থেমে গিয়েছেন। নয়তো একটি দুটি মাত্র বাক্যে নিজের মত বলেছেন। তথ্যের কালানুক্রমিক বিন্যাসে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ইতিহাসগত তাৎপর্য যেমন ফুটে ওঠে তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার বিবরণে স্পষ্ট হয়—মহৎ আত্মত্যাগের শক্তিতে সমুজ্জ্বল যুবকদের জন্য ব্যথিত গৌরববোধের সঙ্গেই এ অতিশয় পন্থা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা এবং দুর্ভাবনা।

লেখক যে সময়ের তথ্য যত্ন করে গুছিয়ে সামনে ধরেছেন এই বইয়ে, আমরা সে সময় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। দেশের বাস্তবতায় আজ মুখ্য দ্বন্দ্বগুলোর চেহারা আলাদা। কিন্তু দুর্গতির তীব্র চাপে যেন অনিবার্য উপায় হিশেবেই সেই অতিশয় পন্থা ফিরে ফিরে আসে আমাদের সামনে। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু মানুষের বীরত্বময় আত্মোৎসর্গে সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে সেই একই দুর্ভাবনাও যেন ফিরে আসে—দুর্গতির আসান এ পথে কতটা সম্ভব! আমাদের সময়েরও সমস্যার তির্যক প্রতিফলন তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, ফলে বিষয়টির চর্চা একালের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। হয়তো এই কারণেই অতিশয় পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতের ভালোমন্দ নিয়ে সম্প্রতি বেশ কিছু কাজ হল ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সভাসমিতি, প্রস্তাব পাশের রাজনীতির সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সংস্রব ছিল গোড়া থেকে। এই রাজনীতিতে ক্রমে ঝোঁকের তফাৎ দেখা দিল, 'নরমপন্থা' 'চরমপন্থা'-র প্রশ্ন এল। বাংলার চরমপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছেন। চরমপন্থার ভেতর থেকেই বিপ্লবপন্থার, গোপন সশস্ত্র উদ্যোগের ধারাটির সূচনা। এ বইয়ের 'জোড়াসাঁকোর পৃষ্ঠপট' এবং 'রবীন্দ্রনাথ কি কোনো বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন?' অধ্যায় দুটিতে সংকলিত তথ্যে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথ কখনও কোনো বিপ্লবী সংগঠনের ভেতরের মানুষ ছিলেন না। অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন অনেক সময়ে কিন্তু সদস্য হন নি। এঁদের গোপন কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। তবুও বিপ্লবপন্থার পথিকদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। অনুশীলন সমিতিই আদিতম বিপ্লবী সংগঠন যার কর্মধারার প্রকাশ্য ও গোপন দুটি স্তর ছিল। বঙ্গভঙ্গের আলোড়নের অনেক আগে থেকে অনুশীলন সমিতির কাজ শুরু হয়েছিল।। এই সংগঠনের কেন্দ্রে ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিস্টার পি· মিত্র। 'প্রমথনাথ মিত্র বর্ধাপন ১৯৮০', নৈহাটি, দ্র·) যিনি দেশময় যুবশক্তিকে সংগঠিত করে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রমথনাথের কথা ছিল, "স্বদেশী-ফদেশিতে কিছুই হবে না। ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও আর নয়তো মরো।" ('বর্ধাপন' পৃ· ৫)। এই প্রেরণাই অগ্নিযুগের সূচনা করে। গণেশ ঘোষ বলেন, ১৮৯৭ সালেই প্রমথনাথ উত্তর কলকাতায় একটি গোপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ('বর্ধাপন', পৃ· ৮) তবে অনুশীলন সমিতির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালের মার্চে। এর অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের ভাইপো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমিতির কিছু যোগ থাকা তাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসের চরমপন্থীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল, সে সময়ের বহু প্রবন্ধে তিনি খোলাখুলি মডারেট রাজনীতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলার রাজনীতিতে তখন চরমপন্থী, স্বদেশী আর বিপ্লবপন্থী—তিনস্তরেই একই নেতাদের দেখা যেত। যেমন অরবিন্দ ঘোষ। মডারেটদের "দরখাস্তপত্র বিছানো" রাজনীতির বিরোধী রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই বামে সরে আসেন। ব্রিটিশ পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ওঠে এবং তাঁর গতিবিধির উপরে নজর রাখা শুরু হয়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের একটি

সার্কুলার উদ্ধার করে দিয়েছেন, তারিখ ২৭ জুলাই ১৯০৯। ২২ জন সন্দেহভাজনের প্রথম নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ১৯তম। তাঁর নামের আগেই গগনেন্দ্রনাথের নাম রয়েছে।

গোপন বিপ্লবী উদ্যোগের খবর রবীন্দ্রনাথ যে ঠিক ঠিক জানতেন তা প্রমাণ করবার মতো কোনো তথ্য এ বইয়ে নেই।। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইংরেজ পক্ষের দমনপীড়নের উগ্রতা এ সময়ে যেমন নিন্দিত হয়েছে তেমনি দেশের যুবশক্তি যে পুলিশি বিভীষিকায় "অভিভূত না হয়ে অসহিষ্ণু" হয়ে উঠছে তাতে তিনি আশ্বাসেরই কারণ দেখছিলেন। কারণ, এতে প্রমাণ হচ্ছিল, "বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।"

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাবের ব্যাপ্তির কথা মনে রাখলে বুঝতে পারা যায়, তাঁর লেখার এইসব ব্যঞ্জনাময় তীব্র মন্তব্য থেকে নিষ্ঠুর উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত যুবকদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশের আগুন ইন্ধন পেত। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটল মজঃফরপুরে, ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র চাকী ভুল গাড়িতে বোমা মারলেন। মারা গেলেন দুজন ইংরেজ মহিলা। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় মানিকতলার মুরারি বাগানে বোমার কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করল, ধরপাকড় হলো। এ ঘটনার প্রায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, এই সব ঘটনা সংঘটনে আমাদের কোন বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি।... ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।" ("পথ ও পাথেয়")। বড় বড় নেতা এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব এড়াতে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষণীয়, নিজের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন না। কিন্তু স্বাধীনতার অভীষ্টে পৌঁছুবার পথ সংক্ষেপের চেষ্টায় যাঁরা গুপ্ত হত্যার রাস্তা ধরেছেন তাঁদের "ধৈর্যহীন উন্মত্ততা" এবং "অন্ধতা" তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এই প্রবন্ধ এবং 'সমস্যা' নামে এর পরের আর-একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখান, উদ্ভূত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মূলে আছে ইংরেজের নিষ্ঠুর শোষণ এবং ইংরেজ শাসনযন্ত্রের ঔদ্ধত্য। অন্য দিকে, আমাদের হৃদয়াবেগ যত প্রবলই হোক স্বাদেশিকতার ভিত্তি যে নড়বড়ে, আমাদের প্রস্তুতিও যে অসম্পূর্ণ—একথাও জোর দিয়েই বললেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় চুপসে গেল, হিন্দুতে-মুসলমানে, উচ্চবর্ণে-নিম্নবর্ণে সংঘাতের বাস্তব বাধা অতিক্রম করা গেল না— এ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক ভাবনায় স্থায়ী জের রেখে গেছে। তাই তিনি এমনও বলেন যে, "ইংরেজ শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে।" কলম তৈরি করতে দুটি ডালকে যেমন দড়ির বাঁধনে বাঁধতে হয়, ইংরেজ-শাসন ভারতে সেই শক্ত বাঁধনের ভূমিকায় যদি কিছুদিন থাকে এবং তার ফলে যদি বিযুক্ত জনসমূহের মধ্যে জৈবিকভাবের "একত্রসংঘটন" সম্ভব হয় তা হলে বরং ইংরেজ-শাসন সাময়িকভাবে তাঁর কাম্যই মনে হচ্ছিল সে-সময়ে।

বিপ্লবী রাজনীতির সেই সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ রাশ টেনে যুবকদের ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। সশস্ত্র হানাহানি অনুমোদন করেন নি। সময় বয়ে গেল অনেক তারপরে। তাঁর জীবনের তিন দশক ধরে চোখের সামনে ইংরেজ-শাসনের চণ্ডনীতির বীভৎস প্রকাশ দেখলেন। বিপ্লবীদের গোপন তৎপরতাও চলে এসেছে ১৯৩৪-এ আণ্ডারসন হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সভ্য শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম দায়-দায়িত্ব বর্জিত ইংরেজ-শাসনের আর কোনো নৈতিক ভিত্তি ছিল না। কলমের জোড় লাগানোর জন্য ইংরেজ-শাসনের শক্ত বাঁধনের উপমা তাঁর নিজের কাছেই ক্রমে অর্থহীন হয়ে যায়। ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্গতির মূল কারণ যে ইংরেজ-শাসন, এই সিদ্ধান্ত বার বার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর শেষ দিকের লেখায়, 'সভ্যতার সঙ্কট' পর্যন্ত। তাঁর লেখা থেকে দেখানো যায়, জীবনের উত্তরপর্বে তিনি পরাধীন স্বদেশের মূল দ্বন্দ্ব—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব— ঠিক ঠিক চিহ্নিত করেছেন। তবুও কেন ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য যাঁরা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন তাঁদের তিনি সমর্থন করতে পারলেন না? লক্ষ্যের মিল সত্ত্বেও কেন অতিশয় পন্থা সম্পর্কে কবির আপত্তি রয়েই গেল? ১৯৩৯ সালেও তিনি মন্তব্য করেন, "...পরবর্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ।" ('দেশনায়ক', 'কালান্তর')।

চিন্মোহন সেহানবীশ ঠিকই লক্ষ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল কথাটা বিখ্যাত 'সত্যের আহ্বান' ('কালান্তর') প্রবন্ধ থেকে উদ্ধার করে দিয়ে লেখক স্বভাবসিদ্ধ অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যোগ করেছেন, "...এবারে আরো একটি যুক্তি যে তিনি দিয়েছেন, সেটি বিশেষ লক্ষণীয়: মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী কয়েকজন তরুণের চূড়ান্ত আত্মদানের মারফত সারা দেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সারা দেশবাসীর জাগরণ। আর তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ তপস্যার।" (পৃঃ ৪১)। চরকাই স্বাধীনতা এনে দেবে—গান্ধীজীর এই নীতির সমালোচনায় লেখা 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধের ১১ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রলয়হুতাশনে যে বিপ্লবীরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁরা সব দেশের সকল মানুষের নমস্য। কিন্তু তাঁদের পরম দুঃখের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে, দেশ যখন তৈরি হয় নি তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেওয়ায় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। "সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়।" চরম দণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া বিপ্লবীদের লেখা পড়ে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তখন কবির মনে হয়েছিল, "তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা-সাধনের যোগ।" গোটা দেশের মানুষকে সঙ্গে নেওয়া ভিন্ন মুক্তির কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা যে নেই—বিপ্লবীদের সঙ্গে এইখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মূল তফাৎ। গণভিত্তিহীন আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনগুলির নেতা ও কর্মীদের অনেকের অনৈতিক কাজকর্মের খবর রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের সূত্রেই পেতেন সম্ভবত—যার প্রতিফলন রয়েছে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। যেমন হেমচন্দ্র কানুনগোর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইটির তথ্য। (নেপাল মজুমদার মশায়ের লেখা "চার অধ্যায়: প্রাসঙ্গিক তথ্য", 'শারদীয় যুবমানস' ১৯৮৫ দ্র.)।

বিপ্লবী রাজনীতির একটি বড় যুক্তি ছিল, অপ্রতিহত ইংরেজ শাসন কোনো একটা ছোট জায়গায় যদি অচল করে দেওয়া যায়, সৈন্যসামন্তের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও যদি কর্তাব্যক্তিদের ঘায়েল করা যায়—তবে সেই ঘটনা একটা প্রতীক মূল্য পাবে দেশের মানুষের মনে। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী বা চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়কেরা বা রাইটার্স অভিযানের যোদ্ধা বিনয়কৃষ্ণ বসু-বাদল গুপ্ত-দীনেশচন্দ্র গুপ্তর মতো যুবকেরা ভারতীয় জনগণের মুক্তির সংগ্রামে এক একটি প্রতীকী মূল্যের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণে এই সব বীরহৃদয়ের তেজস্ক্রিয় প্রভাবের ইতিবাচক দিক, এই যুক্তি রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি কখনও। বিপ্লবীদের প্রত্যাশাহীন দুঃখভোগ এবং চরম আত্মোৎসর্গের সামনে বারবার তিনি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে "দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতা", "অসহিষ্ণু তারুণ্যের হৃদয় বিদারক প্রমাণ" বলেছেন। ভুলভ্রান্তি, কারো কারো ব্যক্তিগত স্খলন এবং তত্ত্বগত ধারণার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা ইতিহাসের একটা পর্বে ইতিবাচক মূল্যবোধ সংযোজন করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই সত্য মানতে না পারায় বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় দ্বৈধ বা দোটানা বরাবর থেকে গেছে। একে শ্রীযুক্ত সেহানবীশ বলেছেন "দ্বৈত-ভাবনা"। "এক দিকে, তিনি তাঁদের অনুসৃত পন্থার কঠোর সমালোচক। অন্য দিকে আবার তাঁর লেখায় ও কাজকর্মে অতি স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট ঐ দুঃসাহসী তরুণদের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর টান। কখনো হয়তো এর এক দিকে, কখনো বা অন্য দিকে ঝোঁক বেশি পড়েছে তাৎক্ষণিকতার তাগিদে।" (পৃঃ ১৫)।

'রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী' এবং 'বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় দুটিতে ক্ষুদিরামদের সময় থেকে আন্দামান দেউলি-প্রেসিডেন্সি-আলিপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট (জুলাই-আগস্ট ১৯৩৭) পর্যন্ত ছোট-বড় নানা ঘটনায় দু-তরফেরই প্রতিক্রিয়ার, যোগাযোগের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য লেখক সঞ্চয়ন করেছেন—সে তথ্যে অবশ্য সব সমালোচনা ছাপিয়ে বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সহানুভূতি এবং ব্যথিত গৌরববোধ যেমন উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে, তেমনি উজ্জ্বল হয়ে ফোটে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপ্লবীদের গর্বে-গৌরবে মেশা মাননা বোধ।

অনুশীলন ও যুগান্তর দলের অনেকে শান্তিনিকেতনে-শ্রীনিকেতনে আশ্রয় পেয়েছেন, চাকরি করেছেন। কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হীরালাল সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ রায়—এঁদের রাজনৈতিক গতিবিধি জেনেও কবি আশ্রয় দিয়েছিলেন। পুলিশের তাড়ায় দেশ ছেড়ে গিয়েছেন এমন কৃতী মানুষদের রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন অনেক সময়ে। এরকম একজন মানুষ কেশোরাম সবেরওয়ালের পরিচয় উদ্ধার করেছেন লেখক (পৃঃ ৪৮)। এরই সঙ্গে উল্লেখ করে যাওয়া যায় অনশনে যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে কবির ক্ষোভের প্রকাশ "সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ" গানটি (১৯২৯) বা হিজলি বন্দী-শিবিরে পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে ময়দানে জনসভায় ভাষণ (১৯৩১)। নিগৃহীত আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে জনসভায় আর-এক ভাষণে (১৯৩৭) রাজনৈতিক বন্দীদের উপর ভারত সরকারের

প্রতিহিংসার নীতিকে কবি সরাসরি ফ্যাসিস্ট নীতি বলে ঘোষণা করেন। এসব সহায়তা-সমর্থন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের গভীরতর সম্পর্কের সত্য প্রকাশ পেয়েছে—"...বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জড়ানো..."—সূর্য সেনের এই উক্তিতে। (পৃঃ ১৭৪)। বিপ্লবীদের জীবনের কত সঙ্কট মুহূর্তে যে রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা উজ্জীবন মন্ত্রের কাজ করেছে—তার বিবরণ আছে এই বইয়ের 'বিপ্লবী জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে। একটি অজানা তথ্য—ভগৎ সিং কনডেম্‌ড সেল-এ যেসব নোট রেখেছিলেন, সেইখাতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে। এই খাতার একটি উদ্ধৃতি "A judge callons to the pain he inflicts, loses the right to judge"—বোধ হয় 'গান্ধারীর আবেদন'-এ গান্ধারীর উক্তি—"ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে, নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার"-এর অনুবাদ।

বিপ্লবীদের দিক থেকে বিরূপতা আদৌ ছিল না এমন নয়। তেমন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সমালোচনায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর তীব্র মন্তব্য (পৃঃ ৯৫-৯৬), আমেরিকা-প্রবাসী গদর দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালইজম' সংক্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনায় ব্রিটিশ-শাসন তাঁকে কিনে নিয়েছে—এই জাতীয় উক্তি (পৃঃ ১০০) বা 'চার অধ্যায়' উপন্যাস পড়ে বিপ্লবীদের ক্ষোভ—সরোজ আচার্যর ভাষায়, "...আমরা যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।...তিনি এই বই কেন লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে অ্যান্ডারসনী তাণ্ডব চলছে।" (পৃঃ ১৩৬)। 'চার অধ্যায়ে' বিপ্লবী রাজনীতির প্রসঙ্গ একান্তই গৌণ, "একমাত্র আখ্যানবস্তু এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা"—রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়ৎ সরোজ আচার্য খণ্ডন করেছেন এবং চিন্মোহন সেহানবীশ সরোজ আচার্যকে সমর্থন করেছেন (পৃঃ ১৩৭)। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন, ইংরেজ-প্রশাসন এ বই বিপ্লব দমনের প্রচার-পুস্তক হিশেবে ব্যবহার করেছিল—এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

তাৎপর্যপূর্ণ আর একটি দৃষ্টান্ত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্যতম প্রধান নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'The Philosophy of Property' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের 'City and Village' (Visva-Bharati Quarterly, Oct. 1924) প্রবন্ধের সমালোচনা। গোটা প্রবন্ধটি Masses of India (Paris, Jan. 1925) পত্রিকা থেকে পরিশিষ্টে তুলে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ভিত্তিক আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য মানবেন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য। মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের এই ধারালো বিশ্লেষণের মূল্য শ্রীযুক্ত সেহানবীশ স্বীকার করেও বলেছেন, "...যে জিনিসের হিসেব তাঁর (মানবেন্দ্রনাথের) লেখায় ছিল না সেটি হল রবীন্দ্রনাথের নিজেকে, নিজের মতকে ক্রমাগত অতিক্রম করার অপরিসীম ক্ষমতা।" (পৃঃ ১১৬)। প্রসঙ্গত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় কবির দৃষ্টিভঙ্গি বদলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কখনওই কি ছেড়েছিলেন? 'রাশিয়ার চিঠি'-তেও তো লিখেছেন, "... সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তাহলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে।... সোভিয়েটেরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।" (৫ সংখ্যক চিঠি)। হিতেন্দ্র মিত্র তাঁর *Tagore Without Illusion* বইয়ে উল্লেখ করেছেন, মানবেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ *Welfare* পত্রিকায় (ফেব্রু, ১৯২৫) সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ প্রতিবাদ সমেত আবার ছাপা হয়েছিল। অবশ্য এ বিতর্ক বেশি দূর গড়ায় নি তখন।

গোপন বিপ্লবী উদ্যোগের ধারাটি ক্রমে স্তিমিত হয়ে গেল। রইল জেলে জেলে বন্দী বিপ্লবীদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনে সর্বদাই রবীন্দ্রনাথ শামিল হয়েছেন। জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে তিনি সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হন (১৯৩৬)। বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ গণভিত্তিহীন সন্ত্রাসের রাজনীতি ছেড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গতভবেই গোত্রান্তরিত এই বিপ্লবীদের প্রসঙ্গও এসেছে এ বইয়ে।

হিজলি রাজবন্দী হত্যার প্রতিবাদসভায় রবীন্দ্রনাথ

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যময় বিপ্লবের ফলাফল দেখেছিলেন। সভ্যতার চরম দুর্দিনে কবির জীবন শেষ হল। সেই সঙ্কটের অন্ধকারে কবি শেষ ভরসা রেখেছিলেন রাশিয়ার পরিত্রাতা ভূমিকায়। বলেছিলেন, "পারবে ওরাই পারবে।" (পৃঃ ১৪৫)। পৃথিবীর বড় দেশগুলির শক্তি-সামর্থ্য এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার পটভূমিতে এই উক্তির মর্ম বুঝতে সাহায্য পাওয়া যায় চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' বই থেকে।

৩.

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

দেশ বিশ্বের বাইরে নয়, দেশ এবং বিশ্ব—দুটি বিরুদ্ধ ধারণা নয়, বিখ্যাত এ গানটির শুরুতে প্রকাশ পেয়েছিল এই এক শুদ্ধ নির্দ্বন্দ্ব আবেগ। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশ ভারতে জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে এমন নির্দ্বন্দ্ব আবেগ অবিচল থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, ভারতীয় আধুনিকের চেতনায় 'বিশ্ব' মানে দাঁড়ায় আধুনিক য়ুরোপ, যে য়ুরোপের পুষ্টি তখন নির্ভর করত এশিয়া-আফ্রিকা থেকে নির্মমভাবে শুষে নেওয়া শাঁস জলের উপরে। আবার এই য়ুরোপ, বা য়ুরোপের সেরা জাত ইংরেজদের ব্যবহারবিধি থেকেই লেখাপড়া শেখা ভারতীয় "ভদ্রসাধারণ" (রবীন্দ্রনাথের চয়ন করা শব্দ) ন্যায়বিচারের, উদারনীতির পাঠ নিতেন। সচেতন ভারতীয়দের পক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনতত্ত্বে এবং প্রাচ্যে সে জীবনতত্ত্বের ফলিত চেহারায় গড়মিল হবারই কথা। আশ্চর্য এই যে, সে আমলের বাঘা বাঘা জাতীয় নেতাদের কথায় বা লেখায় এ চেতনার বিশেষ পরিচয় নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "যেসব মহারথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি তাঁরা কি সত্যিই এমন বড় ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ও-টুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়!" আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের এই পটভূমিতে ১৮-১৯ বছরের সদ্য যুবক রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' (ভারতী পত্রিকায় ১৮৭৯-৮০ সালে প্রকাশিত) "বিলাতী সমাজজীবনের দ্রুতলয়, মানস দিগন্তের প্রসার, বস্তুনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, স্ত্রী-স্বাধীনতা" এবং গ্লাডস্টোনের বাগ্মিতা, জন ব্রাইটের উদারনীতি সম্পর্কে মোহ সত্ত্বেও শাসক ও শাসিতের বেলায় ন্যায় বিচার আর উদারনীতির হেরফের সম্পর্কে স্পষ্ট কথায় অবাকই হতে হয়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশের মন্তব্য, "অর্থাৎ আজ থেকে ১০৪ বছর আগে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী শাসনের খাস লীলাক্ষেত্রে বসে ১৮ বছরের তরুণ অন্তত কিছুটা আঁচ করেছেন গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্য রক্ষার মধ্যকার অনিবার্য স্বার্থ-সংঘাত।" (পৃঃ ১৬)। এর দু-বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন চীনে ইংরেজদের আফিং-এর ব্যবসা সম্পর্কে 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধ। লেখেন, "এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল 'আমি অহিফেন খাইব না।'

ইংরেজ বণিক কহিল, 'সে কি হয় ?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল ; দিয়া কহিল 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও' ।... ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকট মরণ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছেন ।" সমীক্ষার এই তীক্ষ্ণতা এবং ভাষার ধার সে সময়ে ভাবা যেত ? বঙ্কিমচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে precocious বলতেন, রাজনীতিক ভাবনার বেলায়ও কথাটা সদর্থেই খেটে যায় । নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে ভেবেছেন, যদিও রাজনীতিকে তিনি নিজের কাজের এলাকা মনে করতেন না । চিন্মোহন সেহানবীশ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার বিকাশ চারটি পর্বে ভাগ করেছেন ।

উনিশ শতকের শেষ অবধি প্রথম পর্ব, যার প্রধান লক্ষণ ক· বিদেশী আধিপত্যের নৃশংসতা সম্পর্কে ক্রমে বেড়ে ওঠা তীব্র অনুভূতি খ· বৈষয়িক স্বার্থ এবং জাতিবৈরিতার মিশ্রণে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপীড়নের ভয়াবহতা সম্পর্কে চেতনা, গ· য়ুরোপের গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘাত এবং ঘ· মানবিক সম্পদের দিক থেকে বর্তমান সভ্যতার রিক্ততা সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ ।

২· দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার ১৯১২-১৩ অবধি । এই পর্বে কবির চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক· প্রবল জাতিগুলির বিরোধী স্বার্থের লড়াই ক্রমেই বাড়বে, খ· স্থূল এই লোভকেই আড়াল করা হয় ন্যাশনালিজম বা জাতিপ্রেমের আড়ালে, গ· দুর্বলকে উদরস্থ করার জন্য প্রবল জাতিগুলির ইম্পিরিয়লিজম তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা, ঘ· উগ্র জাতিপ্রেমের বিষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনেও মিশছে এই ধারণা ।

তৃতীয় পর্ব ধরেছেন ১৯২৯ পর্যন্ত, অর্থাৎ রাশিয়ায় যাবার আগে পর্যন্ত, যে পর্বের প্রধান লক্ষণ ক· বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ; খ· জাতি বিশেষের দুর্বুদ্ধি নয়, ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শোষণের অধিকার রক্ষাই যুদ্ধের কারণ—এই বোধ, গ· জাতিপ্রেমের মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার এবং এই জাতিপ্রেমের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতনতা ; ঘ· প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায়শ্চিত্তে সভ্যতা কলুষমুক্ত হবে এই বিশ্বাসে ভাঙন ; ঙ· আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে আলাদা করে নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এই চেতনা ; চ· সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা ; ছ· ফ্যাশিজমের চরিত্র ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হবার আগ্রহ ।

৪· অন্তিম পর্বের সূচনা ধরা হয়েছে ১৯৩০ থেকে, ১৯৩০য়েই কবি সোভিয়েত দেশে যান । রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশ বছর সভ্যতার ইতিহাসে এক অন্ধকার, সঙ্কটময় পর্ব—যার পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে । এ পর্বের মূল লক্ষণ ক· সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় স্বদেশ ও বিশ্ব-পরিস্থিতির নতুন মূল্যায়ন । সোভিয়েত সমাজ যে অন্য কোনো দেশের মতোই নয়, "একেবারে মূলে প্রভেদ" এবং এখানকার বিপ্লবের বাণী যে বিশ্ববাণী, এই একটি দেশ যে "স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে"—মূল্যবান এই অবলোকন পাওয়া গেল তাঁর লেখায় এবং মন্তব্যে । খ· সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে একটা জবরদস্তির ব্যাপার তাঁর নজরে আসে এবং তার সমালোচনায় এমনও বলেন, "যে নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব ।" (জারতন্ত্রের জের !) তা সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনে সর্বসাধারণের মনের মুক্তি এনে দেওয়া এবং "নিষ্ঠুরাচারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন" জবরদস্তি শাসননীতির যে একেবারে বিপরীত এবং "আর কিছু না-হোক, অদ্ভুত ভুল বলতে হবে ।" (অবশ্য মানুষ শিক্ষিত হলেই যে নিষ্ঠুর শাসনবিধি সম্পর্কে প্রতিবাদ করবে এমন না হতেও পারে । খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসে তার প্রমাণ প্রচুর) । গ· ধনতন্ত্র অনিবার্যত সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয় এবং তার পরিণতিতে আসে যুদ্ধ—আধুনিক সভ্যতার এই ব্যাধির কথা রবীন্দ্রনাথ আভাসে এর আগেও অনেক জায়গায় বলেছেন । রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় এই ধারণা স্বচ্ছ হল । সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করে বললেন, এ ব্যাধির প্রতিকারের জন্যই সাম্রাজ্যের মুঠি থেকে এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি জরুরি । তাঁর ভাবনার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, "এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবান ।" সঙ্কটাপন্ন বিশ্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্যই দুর্বল জাতিগুলির উঠে দাঁড়ানোর সাহসকে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন মনে হয় তাঁর । পারস্য ভ্রমণের স্মৃতিকথায় ইতিহাসের এই ক্রান্তিকাল সম্পর্কে উদ্দীপনাময় মন্তব্য করেন, "য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো-বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে । এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল । মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে—এই মুক্তির দৃশ্য ।" (এই বইয়ের পৃঃ ৯২) । ঘ· ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বময় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এলেন । স্পেনে গণতন্ত্র বাঁচাবার লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য তাঁর আহ্বান—"Help the People's Front in Spain, help the Government of the people, cry in a million vioces 'Halt to reaction, come in your millions to the aid democracy, to the success of civilisation and culture." (পৃঃ ৯৬) । বৃহৎ শক্তিগুলির মিউনিক চুক্তির ভাঁড়ামি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার উপরে হিটলারের হামলার ঘটনায় নিজেদের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত "cowardly guardian"-দের ধিক্কার দিয়ে চেক জাতির উদ্দেশে বলেন, "I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this..... My words have no power to stay the onslaught of the maniacs... ।" একইভাবে তিনি জাপানি সামরিকচক্রের চীনের উপরে হামলার প্রতিবাদ করেন । অনিবার্য যা-সে ঘটে গেল, শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ । এ যুদ্ধের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ মন্তব্য, "একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার শুরু হল শিকারী এবং শিকারীর পালা ।" সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘাতে ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ানো পৃথিবীতে কবির আয়ু শেষ হল । একেবারে শেষের দিনগুলিতে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সাক্ষ্য অনুযায়ী, কবি গভীর উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত রাশিয়ার খবর শুনতে চাইতেন । রণাঙ্গনে রুশ পক্ষের ভালো খবর পেলে বলতেন, "হবে না ? ওদেরই তো হবে । পারবে । ওরাই পারবে ।" (পৃঃ ১১৬) ।

এ রবীন্দ্রনাথকে সমকালীন বিশ্বের বাস্তব দ্বন্দ্বে প্রগতি-শক্তির পক্ষে একজন পার্টিজান বলতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই ।

এই পর্ব বিভাগ অবশ্য "কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট" নয়, এক পর্বের জের অন্য পর্বেও অনেক দূর চলে এসেছে বা পুরানো ঝোঁক ফিরেও এসেছে পরের পর্বে । চিন্মোহন সেহানবীশের দাঁড় করানো রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার এই রূপরেখাটি স্পষ্ট করে তোলে, তরুণ বয়সে এক ভাবুকতার ঘোরে "বিশ্ব", "বিশ্বজনীনতা" তত্ত্বগুলো নিয়ে কবি উদ্বেল হতেন । ক্রমে অভিজ্ঞতার জমিতে সে তত্ত্বকে দাঁড় করাতে গিয়ে কেবলই দেখা দেয় কল্পিত তত্ত্বে এবং বাস্তবে বিরোধ । দেশের মাটি বিশ্বেরই অংশ হলেও বিশ্ব যাদের কব্জায় তাদের সঙ্গে মিলতে পারার মতো বিশ্বজনীনতা তাঁরও অবাস্তব মনে হয়—যদিও তিনি ঐকতত্ত্বকেই আধুনিক সভ্যতার মর্মবাণী মনে করতেন । এ মিলনের বাধা দুদিক থেকে । এক দিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যায় এগিয়ে যাওয়া জাতিগুলির লোভ, অন্য দিকে শোষিত জাতিগুলির ভীরুতা । দুটিই, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, মানবধর্মের পরিপন্থী । ইতিহাসের কুটিল আবর্ত ঠিক ঠিক চিহ্নিত করায় কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথ ভুল করেন । ন্যাশনালিজমের খোলশের আড়ালের সাম্রাজ্যলালসার বিকট রূপ উন্মোচন করেন (Nationalism, 1917) কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কারণ স্পষ্ট হয় না তাঁর বিশ্লেষণে (পৃঃ ৬১) । ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির চালে মোহগ্রস্ত হন । এমন বিচ্যুতির নজির ছোট এই বইখানিতে অনেক নির্দেশ করা আছে । কিন্তু রাজনীতির এলাকার ভারতীয় মনীষীদের মধ্যেই বা এই কালে অভ্রান্ত দৃষ্টির অধিকারী কজন ছিলেন ? আর, ৭০ পেরিয়ে যখন চেতনার ধার মরে আসার কথা, জীবনের সেই শেষ দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে অভ্রান্ত নির্ণয়ন রয়েছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে, লেখায়—তার তুল্য নজিরই বা কতটা ছিল এদেশে তখন ?

বইখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের আঁকা নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীর ছবি, মস্কোয় আঁকা । নিশ্চিতই এটি সমকালীন বিশ্বে সভ্যতার এক নতুন বনিয়াদ নির্মাণে সোভিয়েতের অপরাহত পৌরুষের চিত্ররূপ । বইয়ের ভেতরের আর-একটি ছবি, মুসোলিনীর কার্টুনটিও তাৎপর্যময় । খড়ের তৈরি এক কাকতাড়ুয়ার আকৃতি এই মুসোলিনীর চেহারা মনে করিয়ে দেবে, এঞ্জেলিকা বালাবোনোভাকে (কমিন্টার্নের সাধারণ সম্পাদিকা) কবি ভিয়েনায় বলেছিলেন, "...the impression he (মুসোলিনি) made upon me—a coward and an actor." (রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ পৃঃ ১১৬-১৯) । সেই বিতর্কিত ইতালি পর্ব সম্পর্কে আলোচনায় এ দুটি তথ্য একটা ভিন্ন মাত্রা এনে দেয় । ৫৬ পৃষ্ঠার সামনে ছাপা ফোটো কপিতে পাওয়া যাচ্ছে লেনিনের জন্য তৈরি ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বইয়ের তালিকা । তালিকায় বিশেষভাবে নজরে পড়বে তিলক, গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, চিত্তরঞ্জন দাস, লাজপত রাই, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতির বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *cult of Nationalism* । লেখক ক্রেমলিনে লেনিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে *Nationalism* বইটি দেখেছেন, দাগ দিয়ে দিয়ে পড়া । "আন্তর্জাতিকতা, মানবমৈত্রী, জাতীয়তা ও সমাজ প্রগতি" বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির ১৮৭৫ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একটি সাল-ওয়ারি তালিকা আছে পরিশিষ্টে । পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কিছু লেখারও উল্লেখ রয়েছে এই তালিকায় । নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয়, তবুও এ বিষয়ে পড়াশুনো শুরু করায় কাজে আসবে তালিকাটি । □

চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ । বিশ্বভারতী ।
চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা । নাভানা ।

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কবির ইস্কুল

'Siksha-Satra...should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment. of manhood complete in all its various aspects.

কবি-শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বগত দিক নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু কাজ হয়েছে এবং সেই সমস্ত লেখালেখির মধ্যে মূল্যবান গ্রন্থও রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়। সেই জাতীয় কাজের মধ্যে রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বগত দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ ও সমাজজীবনে কবির সেই শিক্ষাচিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে তেমন কিছুই কাজ হয় নি বাস্তবিকপক্ষে এই অনালোচিত বিষয়টির যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা শুধু যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাধারার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে, তা-ই নয়, সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়ক মানব-দরদী কবি-শিক্ষাবিদের সদাজাগ্রত মানসিকতারও সত্যকার পরিচয়টি স্পষ্টতর হবে। আমরা আজ যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার (activity-centric education) কথা শুনি, রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তায় মানবীয় শক্তির যথাযথ বিকাশে তার সার্থকতা তাকে শুধুই বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামান্তর মনে করলে ভুল হবে। উৎপাদনমুখী বৃত্তিমূলক যে শিক্ষা পরবর্তীকালে গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র অর্থকরী সেই বিদ্যাকে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের চিত্তের স্ফূর্তি ও বিকাশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন নি। কবি যে শিল্পগুরু নন্দলালকে ছবি আঁকা মডেলিং ইত্যাদি শেখাবার জন্যে শিক্ষাসত্রে নিয়ে এসেছিলেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয় অর্থোপার্জনকেই তিনি শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেন নি। শিক্ষাসত্র-প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে কথাটা মনে রাখা উচিত। প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেবের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে, অথবা অহমিকাবশত যদি একে কবির খেয়াল বলে অস্বীকার করি, তবে কবির শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য।

অবশ্য আমাদের অনেকেরই তাতে কিছু যায় আসে না ; কারণ আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আলোচনা-গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত খণ্ডিত ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই যখন কোনো লেখকের রচিত শিক্ষাচিন্তাবিষয়ক কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগের দিক নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না, অথবা যখন গ্রামীণ সমাজজীবনের উন্নতির প্রয়োজনে কবি কী চিন্তাভাবনা করেছিলেন সে-বিষয়টি কোনো গ্রন্থে অনালোচিত থেকে যায়, তখনও তা আমাদের বিশেষ ভাবনার কারণ হয় না। আমরা সকলেই জানি, এমন অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যায় কবি স্বয়ং সন্তুষ্ট হতেন না। সেই অসন্তোষের কথা তিনি বারেবারেই বলেছেন তবু আজও আমরা সেই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের অজ্ঞতা এমনই ঔদ্ধত্যপূর্ণ যে আজও, শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠার (প্রতিষ্ঠা-তারিখ ১ জুলাই ১৯২৪) ষাট বছর পরেও, কবির প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষাসত্র' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা জানি না ; জানি না গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্যে কবির দরদ ও সহানুভূতি ছিল কত গভীর।

আমরা শহরের মানুষেরা কবির শিক্ষা-চিন্তার তাত্ত্বিক আলোচনা করে হয় তা এড়িয়ে যাই, নাহলে তথাকথিত জনদরদী রাজনৈতিক নেতাদের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে কবিকে 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর প্রতিনিধি ভেবে আত্মসন্তোষ লাভ করি। কল্পিত রাজনৈতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা মনে করি, কবি সম্ভব হচ্ছে না, মুষ্টিমেয় শহরবাসী মানুষই তার সুফল ভোগ করছে আর গ্রামের অগণিত সাধারণ মানুষ হচ্ছে বঞ্চিত, গড্ডলিকা-প্রবাহের বলে লোকের কিছুটা স্বাভাবিক কুণ্ঠা কিছুটা চিরকালীন কুসংস্কার তাদের কবি-পরিকল্পিত শিক্ষা-গ্রহণে বাধা দিচ্ছে, তখনই আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের (বাংলা ১৩০৮ সনে ৭ পৌষ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা) তেইশ বছর পরে কবি এমনই এক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যেখানে সকলের থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার, যেখানে বিনা বাধায় শিশুর আন্তর শক্তির বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।
এই বিদ্যালয়টিই শিক্ষাসত্র—যার বয়স আজ ষাট বছর পেরিয়ে গেছে।
শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন অথবা যাঁরা শিক্ষক তাঁরা সকলেই জানেন,
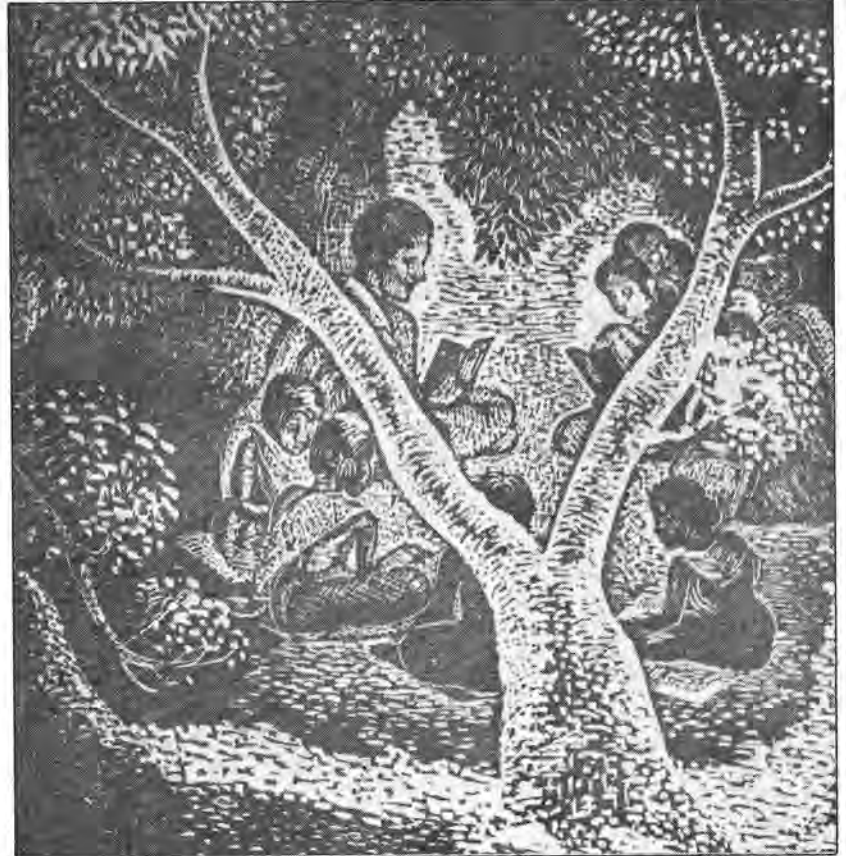
পিয়ার্সন সাহেবের ক্লাশ। শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বুঝি সমাজ-বর্জিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষ, সাধারণ মানুষের জন্যে যিনি কিছুই ভাবেন নি। 'নকল শৌখিন মজদুরি'-কে কবি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন আর আজ যাঁরা সেই জাতীয় কাজে ব্যস্ত, তাঁরাই কবিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখানোর অপচেষ্টায় ও তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যায় অভ্যস্ত।
রাজনৈতিক অথবা অন্যতর কোনো ঘোলাটে চিন্তায় আচ্ছন্ন না হলে আমরা বুঝতে পারব, কবির শিক্ষাচিন্তার মূলেও আছে মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা। 'মানুষ' বলতে শহরের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীই নয়, গ্রামীণ পরিবেশে দেশের যে বিপুলসংখ্যক মানুষের বাস, তাদের কথাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে কবি ভেবেছেন। তাই যখন কবি দেখলেন, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ে

শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে থাকে এই তিনটি বিষয়

ক. শিক্ষার উদ্দেশ, যার সঙ্গে দেশ ও কাল যুক্ত।
খ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষক।
গ. পাঠক্রম।

শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ যখনই এইসব বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, অথবা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন, তখনই তিনি সম্পূর্ণ মানুষের কথা, অমেয় চিৎ-শক্তির আধার শিশুর কথা ভেবেছেন। পরিপূর্ণ মানবতার চিন্তা যা পারিবারিক শিক্ষার সূত্রে অর্জিত অথবা উপনিষদ্-পাঠের অনিবার্য পরিণাম অথবা এই দুয়েরই রাসায়নিক মিশ্রণ, তা কবির কাব্যে যেমন, তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ভাবনাচিন্তাতেও তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ। কবির

সমকালীন কাব্য তথা সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই তা বোঝা যাবে। কবির সমকালীন রচনা মুক্তধারা (১৯২২) ; A Poet's School (১৯২৪) ; পূরবী ; রক্তকরবী (১৯২৯)। মনস্বী সমালোচকের মতে, "[এ] সবের সঙ্গেই শ্রীনিকেতন ও শিক্ষাসত্রের গভীর ভাবগত আত্মীয়তা আছে।" মানবদরদী তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননায় যেমন মর্মাহত হন, তেমনি সেই মানুষকে সত্যকার পথের সন্ধান দেন।

কবির শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা শিক্ষার

শ্রী নিকেতন শিক্ষাসূত্রের প্রথম কার্যালয়। শিল্পী শিশিরকুমার ঘোষ

প্রয়োগগত দিকটির পরিণতি তথা সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে বুঝতে হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত কবির চিন্তা-ভাবনা স্মরণ করা দরকার। কবি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন :

> যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ করিব, আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে ; আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই ; যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে, সেই সমাজের কোনও উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে স্থান পায় না ; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনও সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না ; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনও স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই : উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না ; আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শতহস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে ; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে, সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনও-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনও ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।
>
> ...আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ('শিক্ষার হেরফের', শিক্ষা)

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের এই কথাটাই পরবর্তীকালে 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়টিকে সামনে রেখে কবি বলেছিলেন এইভাবে

> ক. I am therefore all the more keen that Siksha-Satra should justify the ideal that I have entrusted to it, and should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects.... (লেনার্ড এল্‌মহার্স্টকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭)
>
> খ. The primary object of an institution of this kind should be to educate one's limbs and mend not merely to be in readiness for all emergencies, but also to be in perfect tune in the symphony of response between life and the world. (বিশ্বভারতী বুলেটিন ২১ নম্বর। জানুয়ারি ১৯৪৯)

ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করার প্রয়োজনে অথবা ভাষান্তরে শিক্ষার্থীর জগৎ ও জীবনকে এক সুরে বাঁধার কাজে শিক্ষাসত্রের মতো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার আলোকবর্তিকা ব্যতিরেকে দেশের যে বিরাট জনগোষ্ঠী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের বাদ দিয়ে যাঁরা দেশহিতৈষিতায় মত্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের প্রতি কবির গভীর অশ্রদ্ধা। 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন

> আমরা লোকহিতের জন্য যখন একটি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমনস্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।
>
> হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনও অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায়—তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।
>
> ...লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে, এইটেই গোড়াকার কথা। ('লোকহিত', কালান্তর)

'স্বদেশী সমাজ' নামক বিখ্যাত রচনায় কবি বলেছেন আমরা ইংরেজী-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের

লোক বলিয়া জানি—আপনার সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুলি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, একথা আমরা মনেও করি না।

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ('স্বদেশী সমাজ', আত্মশক্তি)

কবির মতে, লোকহিত তথা দেহহিতের একটাই পথ আর তা হল শিক্ষা। দেশের অগণিত মানুষকে অজ্ঞ মূর্খ করে রেখে দেশের কোনো হিত-সাধন সম্ভব নয়। আর তাই, কবি-শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে তাদেরই কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন যাদের পরীক্ষা-পাশের কোনো তাগিদ নেই। তিনি অনুভব করেন, ডিগ্রি-লাভের উচ্চাশাহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভব। শিক্ষাসত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিতে সেদিন যারা কবির শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করতে শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিল, তারা স্বাভাবতই গ্রামের মানুষ এইসব শিক্ষার্থীদের মানসিক পুষ্টিসাধনে শিক্ষাসত্র সেদিন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তার সম্যক মূল্যায়ন আজও হয় নি। অথচ এই মূল্যায়ন ব্যতিরেকে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কিত ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। সেদিনের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় বা আজকের পাঠভবনকে বাদ দিয়ে কবির শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে গ্রামের জীবন ও গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্যে শিক্ষাসত্রের মাধ্যমে কবি যা করতে চেয়েছিলেন তার আলোচনাটা আরও বেশি জরুরি। কারণ 'শিক্ষাসত্র' কবির শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিণত রূপ। একদিকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শ আর অন্যদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষার আদর্শ—এই দুয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছে কবির শিক্ষা-পরিকল্পনায়। তপোবনের শিক্ষার আদর্শ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে সেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন জ্ঞানের আলোটি গুরুর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। আধুনিক যুগে পুথিকে অস্বীকার করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে বই মুখস্থ করে পাশ করা তথা ডিগ্রি অর্জন করাটাই শিক্ষার চরম সাফল্য বলে কবি মনে করেন না। সকল দিকে পরিপূর্ণ হয়ে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনেই শিক্ষার সার্থকতা। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে শিক্ষার্থীকে প্রধানভাবে সাহায্য করবে গুরুর সান্নিধ্য। আদর্শ গুরুর জীবনযাপনেই শিক্ষার্থীকে সত্যকার পথের সন্ধান দেবে।

স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের মতে, একালের গুরুকেও প্রাচীনকালের ঋষিদের মতো অনলস জ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগের দ্বারা ছাত্রদের বিভিন্ন বিদ্যার সাধনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তবেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর

অধ্যাপনারত রবীন্দ্রনাথ

মিলিত প্রয়াসে শিক্ষার একটা যথাযথ আদর্শ পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ থাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 'ভূত-প্রেত-ওঝা' নিয়ে—তাদের চিত্তোন্নতির প্রয়োজনে চাই বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা। আধুনিককালের গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের অনুন্নত মান, তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলেও সে-বিষয়ে আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত যা করা হয়েছে, তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তার দ্বারা গ্রামের মানুষের পরিবেশগত অথবা অর্থনৈতিক কোনো পরিবর্তনই সম্ভব নয়। সত্যদ্রষ্টা কবি-শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ তাই জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর (দ্রষ্টব্য 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'পল্লীসেবা' শীর্ষক প্রবন্ধ)। কবি যা করতে চেয়েছিলেন তা শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; গ্রামের মানুষ বলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি এই অতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের। বরং শিক্ষাসত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিতে যারা পড়তে আসবে, তাদের তিনি হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখানোর কথাই বলেছেন

আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন, এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটে ফোঁটা শেখানো না—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।...কলম ধরা ছাড়া সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে খোচানো চাই। (কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে উদ্ধৃত। তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। দ্রষ্টব্য 'শিক্ষাসত্র' (বিশ্বভারতী ১৯৮৪)/সম্পাদনা রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনকুমার দাস)

অন্যত্র লেনার্ড এল্‌মহার্স্টকে লেখা চিঠিতে কবি এই মত প্রকাশ করেছেন

...Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation. Sriniketan should be able to provide its pupils an atmosphere of rational thinking and behaviour, which alone can save them from stupid bigotry and moral cowardliness. ('Pioneer in Education Essays and exchanges between Rabindranath Tagore & L.K. Elmhirst')

কবি সেদিন লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল বসু প্রমুখ নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক-কর্মী পেয়েছিলেন যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা 'শিক্ষাসত্র' নামক প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। প্রতিষ্ঠার শুরুতে কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ইত্যাদি না থাকলেও শিক্ষার্থীর চাহিদা মতো বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর পাঠক্রম-ভিত্তিক শিক্ষাদানের কার্যক্রম কালক্রমে গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, পাঠক্রম-প্রণয়নে কবির প্রধান সহযোগী ছিলেন এমন কিছু মানুষ যাঁরা এসেছিলেন হয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে, নয় অন্তরের টানে মহত্তর কর্মের অনুপ্রেরণায়।

বাস্তবিকপক্ষে, ১৯২৪ সালের ১ জুলাই যে বিদ্যালয়ের সূচনা, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ১৯২৫ সালে সেই শিক্ষাসত্র পরিদর্শন করতে এসে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্ম লক্ষ করে মহাত্মা গান্ধী এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়োজনে শিক্ষাসত্রের তৎকালীন প্রধান শিক্ষককে ধার নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এল্‌মহার্স্ট তাঁর 'Rabindranath Tagore Pioneer in Education' গ্রন্থে লিখেছেন

...Gandhi paid a visit to this school and was so impressed that he urged Tagore to loan him the service of the headmaster of Siksha-Satra to help him plan an all-India revolution in primary education. Tagore laughingly volunteered on the spot to be Gandhi's first Minister of Education.

মহাত্মা গান্ধীর Basic Education-এর শুরু ১৯৩৭ সালে। প্রায় তের বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির কাজকর্ম গান্ধীকে তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনুপ্রাণিত করে থাকলে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। এটা সহজেই অনুমেয় যে, মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাসত্রের শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম দেখে এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার দিকটি শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা বিশ্লেষিত ও প্রচারিত হলে এই স্বল্প পরিচিত বিদ্যালয়টিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কিত অনালোচিত এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হতে পারে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে যাঁরা আজও অনবহিত, তাঁরাও রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণার অধিকারী হতে পারেন। □

স্বপনকুমার ঘোষ

পুলিনবিহারী সেন সম্পাদক ও সংগ্রাহক

সংকলন-সম্পাদনা এবং পুস্তকাকারে প্রকাশ যে কত সুসম্পূর্ণ হতে পারে আমাদের দেশে পুলিনবিহারী সেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।
রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য অনুপুঙ্খ জানার দাবি কোনো ব্যক্তি এককভাবে করতে পারেন না। পুলিনবিহারীর সঙ্গে সামান্য পরিচয় যাঁদের হয়েছিল তাঁরা জানতেন এ বিষয়ে তিনি কতটা বিনীত ও সচেতন। সেই সূত্রে তাঁর পূর্বসুরি গবেষকদের ও সমকালীন অনেকের কথা তিনি সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করতেন।
রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের তথ্য সংগ্রহের সম্পূর্ণতার প্রতি প্রায় ত্রুটিহীন কর্মপদ্ধতি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল—একথা বলা সম্ভবত সুবিচার হবে না। ধারাটি যে লুপ্ত হয় নি, এ কৃতিত্ব তাঁর।
আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত গবেষকদের মতো তিনি আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না—এটা আমাদের সৌভাগ্য।
পুলিনবিহারীর প্রধান কর্ম সংকলন-সম্পাদনা, গ্রন্থপঞ্জীকরণ। তিনি যে প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে শ্রমজীবন বেছে নেন, বিভিন্ন সময়ে সেই প্রতিষ্ঠান নানা অজুহাতে তাঁকে দূরে ঠেললেও পুলিনবিহারী তাঁর অন্তরের যোগসূত্রটি কখনই ছিন্ন করেন নি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকার জন্যই তিনি দূরে যেতে পারেন নি।
পুলিনবিহারীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার যেকোনো উচ্চকোটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে অপরিমেয় সম্পদ বিশেষ। শিল্পের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগের ফলে তিনি এককালে বাংলা ইংরেজি সাহিত্য পত্রে শিল্প সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র সম্বন্ধে গ্রন্থ সম্পাদনায় উদ্‌বুদ্ধ হন। তেমনি অকৃপণ অর্থব্যয়ে অনেক মূল ছবি শিল্প-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখেন। এ সমস্তই বিশ্বভারতীর ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্যই তাঁর আজীবনের প্রয়াস।
তাঁর জীবিতকালেই তিনি কয়েক হাজার অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সাময়িক পত্রাদি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে দান করেছিলেন। সেই দানের বৈশিষ্ট্যটি চমকপ্রদ। প্রয়াত নীহাররঞ্জন রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘরূপে পুলিনবিহারী এই সমস্ত গ্রন্থ বিশ্বভারতীকে দান করেন।
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় পুলিনবিহারী সেন-উপহৃত রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি, ঠাকুর পরিবারের নানা ব্যক্তির মূল পত্র, বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য কিছু দ্রব্যের নির্বাচিত অংশ গত ২৬ শ্রাবণ থেকে ৩২ শ্রাবণ প্রদর্শিত হল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীনিমাইসাধন বসু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনী নানা দিক থেকেই অত্যন্ত সময়োচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন ছিল ১১ আগস্ট পুলিনবিহারীর জন্মদিনে। ঐ দিনেই এর উদ্‌বোধন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নীরবে শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই শোভন ভঙ্গি ব্যবস্থাপকদের সুরুচির পরিচায়ক। এই প্রদর্শনীতে দ্বারকানাথের নির্দেশপত্র, দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত হাতির দাঁতের গ্রাস-চামচ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্যক্তির রচনার পাণ্ডুলিপি

পুলিনবিহারী সেন

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

মংপু

কল্যাণীয়েষু,
"শিশু"র উপযুক্ত কবিতা শিশুতে ও "কথা ও কাহিনী"র উপযুক্ত কবিতা "কথা ও কাহিনী"তেই প্রকাশ করা উচিত হবে।
[illegible] "শ্লোকের" প্রথম সংস্করণের পাঠই ভালো।
"মানসীর" প্রথম কবিতা "উপহারটি" গ্রন্থারম্ভের পূর্বেই দিলে।
"শ্রাবণের পত্র" এবং "[illegible]" কবিতাগুলি ছিন্নপত্র থেকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করে "মানসী"তেই দিয়ো। ছিন্নপত্রে তাদের আর পুনরাবৃত্তি করবার দরকার নেই। ইতি
১৩/১০/৩৯
শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

EDITORIAL DEPARTMENT
THE MODERN REVIEW
120/2, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA   TELEPHONE: BURRA BAZAR 3281

Dated, the 12/3/ 1936

শ্রীচরণেষু,

প্রণতি

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধস্ফুট চক্ষুর দ্বারে আনে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই আবরণ ভেদ করে সে আপন বিশুদ্ধ শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় আলোক জগতে।
তেমনি মানুষের প্রথম আবির্ভাব নানা মোহের বাহিরে, কত বৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংবৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ।
অবশেষে নিজেই সেই আচ্ছাদন যবে সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
নির্মলতার মানুষের সহজ মহিমায়॥

পুলিনবিহারী সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি   **রবীন্দ্রনাথকে লেখা পুলিনবিহারী সেনের চিঠি**

বিন্যস্ত হয়েছিল। পুলিনবিহারীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলির মধ্যে বহুখ্যাত জনগণমন সংগীত-বিষয়ে সেই সুদীর্ঘ পত্রটিও ছিল। অন্য পত্রগুলি অধিকাংশই সম্পাদকীয় কর্মে নিযুক্ত পুলিনবিহারীকে লেখক রবীন্দ্রনাথের পত্র। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পুলিনবিহারীর সংগ্রহ সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন এটা আনন্দের বিষয়। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত কয়েক হাজার বই ও পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির যদি একটি তালিকা ভবিষ্যতে করা যায় তাহলে এই উপহারের পরিমাণ এবং মূল্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

এখন কাজ হল তাঁর আরব্ধ অসমাপ্ত কর্ম সম্পূর্ণ করা। এখনো তাঁর সংগৃহীত বইপত্র যা বাকি আছে সেগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র বিশ্বভারতীতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে পুলিনবিহারীর জন্মদিনে ১১ আগস্ট কলকাতায় শিশির মঞ্চের দোতালায় একটি সভার আয়োজন হয়। এই সভার আহ্বায়ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য অকাদেমি, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রমুখ কয়েকটি সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, যার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার পুলিনবিহারী সেনের হাতে, আপাতত তাঁকে স্মরণ করে কোনো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবেন বলে জানা নেই। তবে Visv Bharati Quarterly শ্রীঅশীন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। Visva Bharati News যথাসাধ্য এরূপ একটি সংখ্যা প্রকাশ করবেন বলে জানা গেল। পুজোর অব্যবহিত পরেই "কণ্ঠস্বর" পত্রিকা তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। এসবই সংকলক-সম্পাদক পুলিনবিহারীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ সন্দেহ নেই। তবে তাঁর আরব্ধ কর্ম, বিশেষ করে "রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী" সম্পূর্ণ করা এবং তাঁর সংকলিত বিভিন্ন রচনাপঞ্জীগুলি একত্র করে মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করলে যে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন হবে আশা করি এতে মতভেদ হবে না। যোগ্য প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে তৎপর হলে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। □

ছবি ও চিঠিদুটি

শ্রী অনাথনাথ দাসের সৌজন্যে

সুধীর চক্রবর্তী

একুশের শতকে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ

প্রথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইয়ে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, শেষপর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিকিবে। অনেকে বলেন তাঁর গান কেবল শিক্ষিত সমাজেরই গান। এ দেশে এখন পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিধি বিস্তৃত হইলে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসারও অনিবার্য।" কথাগুলি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের। আর আজ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত সমাজের পরিধি যখন খুব বিস্তৃত তখন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'জার্নাল' বইয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের একটি খেদোক্তি

> দুঃখ করলেন শৈলজারঞ্জন এবারকার শান্তিনিকেতন নিয়ে। কমাসের দায় নিয়ে আছেন এখানে, শেখাতে যান সকালে তিনদিন, বিকেলে তিনদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে নিয়মিত আসে এমন নয়। কোনোদিন হয়তো ভরে গেল সব, কোনোদিন ফাঁকা। উনি বলছেন, আর আচমকা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 'বিসর্জন'-এর লাইন, একটু ভিন্ন অর্থে 'জানো কি একেলা কারে বলে ?... দিতে চাই, নিতে কেহ নাই !'

এই তাহলে এখনকার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রগানের পরিবেশ। অথচ এই শৈলজারঞ্জনই কত ভরসা নিয়ে আগের একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রসংগীতের পীঠস্থান কবির আশ্রম শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে যেন গান ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য সেখানে রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক পরিমণ্ডল বিরাজমান।... আশ্রমবাসীদের কণ্ঠে সেই রাবীন্দ্রিক জগৎ অটুট থাকবেই।"

কিন্তু দেখাই যাচ্ছে অটুট নেই। শুধু শান্তিনিকেতনেই নয়, কলকাতাতেও। আকাশবাণী কলকাতার প্রতিদিনের অনুষ্ঠানসূচিতে রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার অনেকটা কমে গেছে। কর্তৃপক্ষ জানান এ তাঁদের স্বৈরসিদ্ধান্ত নয়, শ্রোতাদের দাবি। রেকর্ড কোম্পানিগুলি নতুনদের দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করাতে যতটা আগ্রহী তার চেয়ে প্রয়াসী নামীদের গাওয়া পুরনো গানের দীর্ঘবাদন বিন্যাসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা যায় কলকাতার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের পরিবেশন অনুষ্ঠানে আজকাল নাকি বেশ কিছু দর্শকাসন ফাঁকা থাকছে।

এর পাশে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়বহুল উচ্চারণ যে,

> জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক, সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারি নে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবুও বাকি থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।

এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর গানের উত্তরাধিকার বর্তাবে শুধু বাঙালিদের ওপর। এ উক্তির প্রসারণে আমরা বুঝে নিই, বিদেশ বা ভিন্নপ্রদেশে যে রবীন্দ্রসংগীত চলবে না তার একটা কারণ বাণীর মহিমা। কীর্তন ও রামপ্রসাদের গানের যুগ থেকে বাংলা গানে কথা ও

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শান্তিদেব ঘোষ

সুরের যে একটা সহজ অনুপাত ছিল সেই গীত সংস্কার মেনে নিয়েই তাকে আরও ব্যঞ্জনাময় বাণীসংসর্গে দীপ্ততর করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এখানে 'আমাদের' মানে সামগ্রিক বাঙালি নয়, শিক্ষিত বাঙালি। আর যেহেতু বাংলার গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ এমনকি সাক্ষরও নয় তাই রবীন্দ্রনাথের গানেই রয়েছে একধরনের পতনের বীজ।

এবারে দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর গানগুলি লিখেছিলেন ও গাইয়েছিলেন তখন কোন সব বাঙালি তাঁর চারপাশে ছিলেন। প্রথমযুগে ঠাকুরবাড়ির অভিজনতা আর মার্জিত মননসংসর্গ তাঁকে উৎসাহিত করেছে। প্রতিভা-অভিজ্ঞা-ইন্দিরা, সরলা অবনীন্দ্র ও দিনেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর, জগদানন্দ, নিতাই-বিনোদ, নন্দলাল, প্রভাতকুমার, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেবরা। কলকাতা-শান্তিনিকেতনের দু কেন্দ্রেই যাঁরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন তাঁরা প্রশান্ত মহলানবিশ, অমিয় চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার, অমল হোমের মতো রুচিমান বিদগ্ধ বাঙালি। তাঁর জীবিতকালে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন ও শেখাতেন ইন্দিরা দেবী, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, অমিতা সেন, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব, অনাদিকুমার, পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর আশ্রমিক পরিবেশে গান শিখে নেন সুচিত্রা, কণিকা, সুবিনয়, অশোকতরু, নীলিমা সেন এবং খানিকটা ঘনিষ্ঠ যাতায়াতের সূত্রে দেবব্রত বিশ্বাসও। রবীন্দ্রনাথ কি বাঙালি বলতে এঁদেরই বোঝেন নি ? এঁরা সবাই নিঃশর্তভাবে রাবীন্দ্রিক, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসর্গীকৃত, বিদেশী সংক্রামকে প্রতিহত করে এঁরা চেয়েছিলেন সবরকম ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবন। রবীন্দ্রনাথ কি এই পর্যায়ের উন্নত বাঙালিদের কথা মনে রেখেই এডওয়ার্ড টমসনকে লেখেন

> I know the artistic value of my songs. They have great beauty. Though they will not be known outside my province, and much of my work will be gradually lost, I leave them as a legacy.

এই মহৎ রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরাধিকার তাহলে কাদের জন্য রেখে যান তিনি ? ঐসব স্তরের প্রশিক্ষিত নন্দনবোধসম্পন্নদের জন্য, নাকি এখনকার মিশ্র ও অহংকারী বাঙালিদের জন্য, যাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত জার্নালে শঙ্খ ঘোষ লেখেন "সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন" বলে ?

এবারে তাহলে, ভয়ে ভয়ে, প্রসঙ্গটা তুলেই ফেলি। একুশ শতক পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত টিকবে তো ? এ আমার আত্মদংশকরা সশংক প্রশ্ন।

সমস্যা এই, যে কোনো প্রসঙ্গের দুটি স্পষ্ট দিক থাকে। একটা তার সংখ্যাতত্ত্বের দিক, আর একটা গভীর সঞ্চারী সত্যের দিক। এখনকার সংখ্যাতত্ত্ব বলছে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার মতো ছেলেমেয়ে অনেক বেড়েছে, রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর বিদ্যালয় সারা বাংলায় সম্ভবত অগণন। দিন দিনই প্রসারিত হচ্ছে শহর আর মফস্বলে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। নামী শিল্পীদের দক্ষিণাও বেশ মোটা অঙ্কের এখন। কৃতি ও সম্ভাবনাপূর্ণ রবীন্দ্রসংগীত গায়কগায়িকা এখন পান বৃত্তি। বেতার ও দূরদর্শনে দরকার হচ্ছে অনেক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর। পুরোপুরি রবীন্দ্রগীতির পাঠক্রম নিয়ে সচল রয়েছে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী।

এবার সংখ্যাতত্ত্বের উলটো পিঠের যে সত্য তার রূপটি দেখা যেতে পারে। তাতে দেখা যায়, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সাড়াজাগানো গান গেয়ে চলেছেন শান্তিদেব, সুবিনয়, সুচিত্রা, অশোকতরু। সবচেয়ে বেশি রেকর্ড বিক্রি হয় হেমন্ত, দেবব্রত, সুচিত্রা, কণিকা, সুবিনয় ও রাজেশ্বরীর। আমরা সর্বদাই কান পেতে রই কবে শুনব কণিকা বা নীলিমার গান। এইসব শিল্পীদের গড়পড়তা বয়স ষাট। অথচ পঁচিশ বছর বয়স থেকেই এঁরা তারিফ পেয়ে আসছেন। এঁদের মতো বিপুল জনপ্রিয়তা, গায়ন সামর্থ্য ও গানের ভাণ্ডার কি আছে ঋতু গুহ, বনানী ঘোষ, অঘ্য সেন, সুমিত্রা সেন, পূর্বা দাম, শৈলেন দাস বা গীতা ঘটকদের ? এঁদেরও পরে যারা সেই অগ্নিভ, অভিরূপ, শ্রীনন্দা, রীতা বা সংঘমিত্রারা কি খুব প্রত্যাশা জাগাচ্ছেন

গানের একটা মস্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, সৃজনের মান যত উন্নতই হোক সবরকম গানের ভবিষ্যৎ কিন্তু নির্ভর করে গায়নের ওপরই প্রধানত, বিশেষত তরুণতরদের কণ্ঠবাদনে। কেননা গান হল একরকম পারফর্মিং আর্ট। তাই তার পারফরমেন্সে স্খলন বা নিচু মান

দেখা দিলে কাল নিরবধি বিপুলা পৃথ্বী বলে সান্ত্বনা মিলবে না। নতুন যুগের শ্রোতারা তাকে সমূলে খারিজ করবে এবং প্রকৃতি যেহেতু কোনোরকম শূন্যতাকে মানে না তাই নতুন গান জাঁকিয়ে বসবে। সেই নতুন হতে পারে অনুপ জলোটার গিমিক, স্বৈরনির্মাণের নজরুলগীতি এবং এমনকী নতুনের নামে রামকুমারের পুরাতনীও। এসব গান একদশক রাজত্ব করে সরে যাবে, আবার আসবে রবীন্দ্রসংগীতের মহিমান্বিত উজ্জ্বল উদ্ধার—এমন বিশ্বাস বা ভরসা ইতিহাসসম্মত নয়। বরং ভাবা যাক অন্যতর দিকগুলো। ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশের সময়কার রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা কেন এত ভালো গান করেন, এতখানি কর্তৃত্ব নিয়ে, ব্যক্তিত্ব দিয়ে, আর কেন সত্তর আশির সমকালের শিল্পীরা তা পারেন না। তার জবাবে শৈলজারঞ্জনেরই আরেকটি উক্তি ব্যবহার করে বলা চলে "রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্রতার মধ্যে স্বচ্ছন্দ

অনাদিকুমার দস্তিদার

পরিক্রমণ করতে হলে সংগীত-সাধকের জ্ঞানের সীমা বহু বিস্তৃত হওয়া দরকার।"

সেই বিস্তার নতুন প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের নেই কারণ তাঁদের সাধন-সিদ্ধির আগেই খ্যাতি ও সুযোগ এসে যায় খুব সহজে। আরেকটা ঘটনা এই যে প্রথম থেকে রবীন্দ্রগীতির আভিজাত্য, তার শান্তিনিকেতনী সংবৃত মাহাত্ম্য এবং জনতোষের উলটোস্রোতে মুখ ফেরানো ঘাভিমান মহিমা বরাবর রবীন্দ্রসংগীতকে এক গজদন্তমিনারে রেখে দিয়েছে। স্বরলিপির আঁটাআঁটি, মিউজিক বোর্ডের কর্তৃত্ব আর সুরবিহার বর্জিত রবীন্দ্রগানের গায়নরীতি এ-গানের পালে কখনও হালকা বাতাস লাগাতে দেয় নি। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের গায়ক ও শ্রোতা মিলে এখন গড়ে তুলেছে এক মার্জিত চিহ্নিত শ্রেণী, সেই শ্রেণীর নিরুচ্চার দাবি : আপামর জনগণের সামগ্রী নয় এই গান। অথচ পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস এবং সুচিত্রা মিত্রও তাঁদের উদার স্বয়ম্ভর গায়নে বুঝিয়েও দেন যে কেমন করে রবীন্দ্রসংগীত হতে পারে সকলের হৃদয়ে সমবাদী। খেদ তাই জাগে এই ভেবে যে কেন সবাই এঁদের পথ নিলেন না। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যতখানি কণ্ঠের ঐশ্বর্য থাকলে, পারফরমেন্সের সাবলীলতা থাকলে এবং ব্যক্তিত্ব থাকলে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে সনিষ্ঠ থেকেও তাকে বিস্তারিত করা যায় এমন করে সকলের কাছে, ততখানি প্রতিভা নতুনদের অনেকেরই নেই। সত্যজিৎ রায় তাঁর একটি বিরল নিবন্ধে ('রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা', এক্ষণ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) এই দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন

> রবীন্দ্রনাথের গান যে আজকাল খুব ভালোভাবে গাওয়া হচ্ছে না তার একটা সোজা কারণ অবশ্য হচ্ছে এই যে ভালো গাইয়ে ছাড়া ভালো গান ভালোভাবে কেউ গাইতে পারে না। এসব গাইয়েদের অধিকাংশই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মাঝারির দলভুক্ত। অথচ এই মাঝারিদের মধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন, এই মাঝারিদের মধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

এই মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী কিন্তু ভেতরে রয়েছে এক বেদনাদায়ক সত্য। শৈলজারঞ্জন

দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রসংগীতের গায়কসাধকদের জ্ঞানের সীমা বিস্তারের দাবি তুলেছিলেন, আর সত্যজিৎবাবু তুললেন ভালো গাইয়ের দাবি। এই ভালো গাইয়ে বলতে বোঝায় প্রথম শ্রেণীর কলাবৎ শিল্পী, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কণ্ঠলাবণ্যে গুণী। কে না জানে বাংলার এমনতর শিল্পীরা চিরকাল রবীন্দ্রসংগীত থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন বা তাঁদের রাখা হয়েছে। শচীনদেব বর্মন, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দিলীপকুমার রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, অনুপ ঘোষাল বা অজয় চক্রবর্তী যদি আন্তরিকভাবে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন তবে রবীন্দ্রসংগীত নিশ্চয়ই মাঝারিদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচত এবং রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে চাইতেন তাঁর গানে চিরজীবিতের অঙ্গীকার তাও মিলত। মনে পড়ে যে, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া একটি-দুটি রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড আমাদের অসামান্য সঞ্চয়। কেন তাঁরা আরও গাইলেন না ? অভিযোগের তীর শুধু গ্রামোফোন কোম্পানির দিকে উদ্যত করলে হবে না। আমাদের নামকরা বাঙালি গায়করা রবীন্দ্রসংগীতকে সম্ভ্রম করেন কিন্তু ভালোবাসেন না সম্ভবত। ভালোবাসতেন যদি তবে সারাজীবন তৃতীয় শ্রেণীর লিরিকে কিম্ভূত সুরতালে অদ্ভুত যন্ত্রানুষঙ্গের গান গেয়ে প্রতিভা নষ্ট করতে হত না। সগর্বে গাইতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিরিক—রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছাপূরণ হত।

এইখানে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন, রবীন্দ্রনাথের গান নাকি সকলের গাইবার অধিকার নেই। একমাত্র যাঁরা সতর্ক ও সাবধানী রবীন্দ্রগীতিচর্চার পাঠশালায় পাঠ নিয়েছেন তাঁরাই গাইতে পারেন, অন্যেরা নয়। এইখানে সেই স্টিমরোলার চালানোর পুরোনো কথাটা উঠে পরে। সত্যিসত্যি রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে কী বলেছিলেন সেটা বরং শোনা যাক। বলেছিলেন

> একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে, গান শিখিয়ো। এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর তোমরা যদি স্টিমরোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চ্যাপটা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তাল থাকে, দরদ থাকে, মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।

এখানে তাঁর গানের সম্ভাব্য শিল্পীদের কাছে যে সতর্কতা দাবি করেছিলেন তা কিন্তু স্বরলিপির শুদ্ধতা নয়, যন্ত্রানুষঙ্গ বিষয়েও কোনো ছুঁৎমার্গী নির্দেশ নয়। সত্যজিৎ রায় এই মন্তব্যটির সম্প্রসারে যে বিশ্লেষণ করেন তা আমাদের বোঝা দরকার। তিনি জানান সঠিকভাবেই

> দরদ, রস, তাল, মীড়—এগুলোর কোনোটাই প্রধানত স্বরলিপির জিনিশ নয়। সত্যি বলতে কি, স্বরলিপিতে অধিকাংশ গানেরই যে চেহারাটা পাওয়া যায়, সেটাকে চ্যাপটা বললে বোধহয় খুব ভুল হবে না। সেটাকে হুবহু অনুসরণ করে যদি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যে গুণগুলোর কথা বলেছিলেন, তার কোনোটাই গানে পাওয়া যাবে না। গায়ককে সব সময়ই তার ক্ষমতা অনুযায়ী গানের মূল কাঠামো ও ভাব বজায় রেখে ওই চ্যাপটা চেহারায় প্রাণসঞ্চার করতে হয়

খুব ভালো গাইয়ে দরদ রস তাল মীড় সহযোগে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে যেমন তার সত্যিকারের রূপটা ফোটে তেমনই তা জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিশেবে আমাদের মনে পড়বে না কি 'মুক্তি' ছবির কথা ? সায়গল কাননদেবী পঙ্কজ মল্লিক তাঁদের দরদী কণ্ঠে কেমন করে ত্রিশ আর চল্লিশ দশকে রবীন্দ্রনাথের গানকে সাধারণ মানুষের ভালোলাগার দরজায় এনে দিয়েছিলেন তা কি ভোলবার ? পঞ্চাশের দশকে হেমন্ত ও দেবব্রত-র সাফল্যও কি আমরা দেখি নি ? এবারে স্বীকার করতে হবে এঁরা সবাই বড় মাপের ভালো গাইয়ে এবং খুব খুঁৎখুঁতে বিচারে এঁরা কেউই শুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত গান নি অথচ তাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন, মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রগীতির রস।

তাহলে কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে একুশ শতকে রবীন্দ্রসংগীতকে স্বমহিমায় সরসভাবে উত্তরণ করাতে গেলে দরকার শুদ্ধ সতর্ক সাবধানী মাঝারি গাইয়ে নয় বরং ভালো গাইয়ে। যাঁদের দরদ আর রসিক মন শুধু নয়, সেই সঙ্গে আছে গলার রেঞ্জ। আর বহুরকমের গান গাইবার দক্ষতা। এখন সুচিত্রা কণিকা শান্তিদেব সুবিনয়কে বাদ দিলে বেশিরভাগ গাইয়ের রবীন্দ্রগায়ন যে যান্ত্রিক একঘেয়ে পৌনঃপুনিক লাগে, তার কারণ প্রতিভার মাঝারিয়ানা ও চেষ্টাকৃত পরিমার্জনা, সেইসঙ্গে পেশাদারি কৃত্রিমতা। বহুবিচিত্র রবীন্দ্রগীতের সঞ্চয় যেমন তাঁদের নেই, তেমনই নেই গায়নের সাধ্য। এঁরাই যদি থাকেন রবীন্দ্রগানের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী হয়ে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুনতে পাবে না তার নির্মাণের ব্যাপকতা, অফুরন্ত বিচিত্র ও নিরীক্ষার সংবাদ। যা সমুদ্রের মতো উদার ও প্রেরণাদায়ী তা নিরুদ্ধ থাকবে কূপজলের বদ্ধতায়। ফলে কয়েকশো মাত্র গানের পুনরাবর্তনকে ভবিষ্যৎ

শ্রোতারা কানে শুনতে পাবেন। একটা বৃহৎ ব্যাপারকে ছোট করে দেখানো এক মস্ত অপরাধ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতে এই অন্তর্ঘাতের ভাবনাটা আসে নি। তিনি শুধু ভেবেছিলেন 'যুগ বদলায় কাল বদলায়'। কিন্তু এটা ভাবেন নি যে শিল্পীর একাগ্রতা বদলে যায়, বদলে যায় মনোবৃত্তি। গানে প্রাতিষ্ঠানিকতা এসে যায়, আসে ফাঁকি। তিনি তাঁর গান গাইতে দেখে গেছেন দিনুকে, সাহানাকে, নুটুকে, খুকুকে, যাঁরা বিভোর হয়ে গাইতেন। ভাবেন নি সেখানে এসে যাবে নতুন বাঙালি, যার কণ্ঠ আয়ত্তে আসার আগে সভাশোভন চটকদার পোশাক তৈরি হয়ে যায়। তালিম শেষ হবার আগেই যারা দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে অডিশন দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যাদের অস্থিরচিত্ততা ও স্বৈরস্বভাব সুযোগ্য শিক্ষকের ক্লাশ একদিন ভরিয়ে দেয়, আরেকদিন শূন্য রাখে। রবীন্দ্রনাথের গানকে বরং মরণের মুখে রেখে দূরেই

ইন্দিরা দেবী

চলে যাবে এই ধরনের শিল্পীর দল।

এই সূত্রে আমরা ভাবতে বাধ্য হই নতুন যুগের সম্ভাব্য শ্রোতাদের দিকটাও। অর্থাৎ কারা শুনবে রবীন্দ্রনাথের গান ? সে তো আমরা নই। আমরা, যারা অনেকটাই রবীন্দ্রযুগকে পেয়েছি, দেখেছি রাবীন্দ্রিকতার মহিমা তারা একুশ শতকের বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব না। আমরা যারা প্রভাতকুমার, পুলিনবিহারী, শোভনলাল, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেবদের মতো অস্খলিত রবীন্দ্রপূজারীদের দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা আমাদের কাছে উপস্থিত করে দিয়েছেন স্তবমন্ত্রের মতো শুদ্ধতায় তাঁদের তো দেখবে না নতুনযুগের মানুষ। তারা দেখবে রবীন্দ্র ব্যবসায়ীদের, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে যারা পুঞ্জিত করে শুধু 'রবিশস্য দগ্ধস্তূপ'।

সেই সঙ্গে এটাও প্রশ্ন যে নতুন কালের বৈদ্যুতিক বিশ্বে দ্রুত ধাবমান স্বতোশ্চলতায় নিক্ষিপ্ত ছেলেমেয়েরা তাদের সিলেবাস, ইঁদুরদৌড়, সাফল্যের সিঁড়ি আর আন্তর্জাগতিক চিন্তা-বৈপরীত্যে তেমনভাবে কান পেতে শুনবে তো রবীন্দ্রসংগীত ? পাবে কি তারা আমাদের মতো অন্তর আস্বাদনের স্নিগ্ধ অবকাশ ? রবীন্দ্রসংগীত হয়ে থাকবে না তো কেবল তাদের অবসরের গান, আনুষ্ঠানিকতার অঙ্গ বা পুরাতনী মহিমার চর্বণমাত্র ? ভয় হয়, কেবলই জানতে ইচ্ছে করে কে তারা, কেমন তারা, কী তাদের মর্জি। এখন যেমন দেখছি সবচেয়ে ঝকঝকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বারো আনাই মেট্রোপলিটন মন নিয়ে ইংরেজিমাধ্যম আর কারিগরি বিদ্যায় উদ্গ্রীব—তারা সংখ্যায় এমন হারে বাড়লে রবীন্দ্রসংগীত তার মর্মে গভীর হৃদয়ক্ষত নিয়ে সরে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই। দেশ ও সংস্কৃতির শিকড়-আলগা, নির্জন, স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব কি ভবিষ্যতে আরও বাড়বে ? ভয় হয়, সমাজবিজ্ঞানী মামফোর্ড আশঙ্কা করেছেন নতুন কালের মানুষ নাকি কেবলই এগোবে লক্ষ্যহীন অর্জনের দিকে, নির্বাধ বস্তুগত ব্যাপ্তির দিকে, অসংগঠনের ভয়াবহ বিস্তারে। রবীন্দ্রনাথের গানে তো এই দিকটা একেবারে নেই। গহন ঘুমের ঘোরে বৃষ্টি নামা তিমির নিবিড় রাত, সায়ন্তনের অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের গূঢ়তা, মাটির কলস ছাপিয়ে যাবার উদ্বৃত্ত উপচিতি, দিনফুরানো সংসারীর ঔদাস্য, স্বপ্নে মনে হওয়া দ্বারে আঘাতের রহস্যসৌন্দর্য—এসবের মর্ম তারা তেমন করে শুনতে চাইবে কি ? বরং তারা এমন কথা শুনতে চাইবে

নীলিমা সেন

হয়ত

He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land.
Making all his nowhere plans
For nobody.
Doesn't have a point of view.
Knows not where he's going to.
Isn't he a bit like you
And me?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রতিদিন যে জীবনস্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াতে চান আস্তিক্যে, ভালোবাসায় তার এতখানি খর্বতা যদি নতুন গানের প্রসঙ্গ হয় তবে কোন আশ্বাস তাদের বাইরে চলার সাহস দেবে কিংবা ডাক দেবে ভিতরপানে ? এসব আশঙ্কা জাগে। সেই সঙ্গে এই ভাবনা জাগে, রবীন্দ্রনাথ যে দাবি করে গেছেন 'শোকেদুঃখে সুখে আনন্দে' বাঙালি তাঁর গান গাইবেই সেই অমিশ্র বাঙালি কি থাকবে আদপে ? নাকি আন্তর্জাতিক কৃৎকৌশলের সর্বাধুনিক মাপে তৈরি হবে কতকগুলি মনুষ্যদেহধারী অস্তিত্ব, যাদের হয়ত কোনো বিশেষ জাতিসংস্কৃতিগত পরিচয় থাকবে না। শঙ্খ ঘোষ এখনই যে সীন প্রজন্মকে বলেন 'সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন', তাদের ভবিষ্যৎ সন্ততিরা হবে আরো কতটা আত্মবৃত্তে বন্দী, নির্বিকার ও সংখ্যাতত্ত্বনির্ভর তা ভাবলে দুশ্চিন্তা জাগা স্বাভাবিক এবং সেইসূত্রেই রবীন্দ্রসংগীতের অস্তিত্বের ভাবনাও।

সেই ভাবনার প্রসঙ্গে গায়ক ও শ্রোতার পরে এবারে উঠবে রবীন্দ্রসংগীতের বোদ্ধা ও রসিকদের দিকটা। এই নিবন্ধ লেখার সময়ে আমার সামনের বইয়ের তাকে দেখছি রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে প্রায় তিরিশখানা গ্রন্থ বা সংকলন। তার এক অংশ পি. এইচ. ডি. প্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ, আরেক অংশ প্রতিষ্ঠিত গায়কগায়িকা ও সংগীতশিক্ষকদের রচনা, আরেক অংশ রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বোদ্ধা ও গুণীজ্ঞানীরসজ্ঞদের বিশ্লেষণঘটিত। এ আলোচনায় গবেষণার বইকটি বাদ দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। গায়কগায়িকা ও শিক্ষকদের মধ্যে বই লিখে নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সন্তোষ সেনগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, শান্তিদেব ঘোষ, শুভ গুহঠাকুরতা, দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্গে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), নীলিমা সেন (সঙ্গে অমিয় কুমার সেন), সনজিদা খাতুন। রসজ্ঞ ও বোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক বা একাধিক বই লিখেছেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, কালিদাস নাগ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুকুমার সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কিরণশশী দে, অরুণ ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ। বই না লিখলেও নানাসময় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে দিকনির্দেশী নিবন্ধ লিখেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য নাম দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজ্যেশ্বর মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সত্যজিৎ রায়, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অশ্রুকুমার সিকদার, পবিত্র সরকার, সুভাষ চৌধুরী। আশ্চর্য যে, এই বিপুল লেখকসংঘের মধ্যে শৈলজারঞ্জন বাদে সকলেই ছিলেন মানবিকী বিদ্যার ছাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বোদ্ধা ব্যক্তিদের মধ্যে কলম ধরেন কেবল সাহিত্য বিভাগের লোকজন। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বস্তুবিদ্যাব্রতীরা রবীন্দ্রসংগীতবিষয়ে লেখনী চালাতে এতটা উদাসীন জেনে ভাবতেই হয় একুশ শতকে রবীন্দ্রসংগীতের সপক্ষে লিখবেন কে ? অথচ ভয়ে ভয়ে এখানে এই তথ্যটুকু পেশ করতেই হয়, গত দশবছরে (এবং আগামী দশবছরেও নিশ্চয়ই) খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান বাঙালি ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশ চলে গেছে ও যাচ্ছে কম্প্যুটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যানবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কারিগরি ও বাস্তুবিদ্যায়। বৃত্তিকেন্দ্রিক এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিকীবিদ্যার চটকদারিদের ভবিষ্যৎ খুব ধূসর, তাই নিজের সন্তানকে কলাবিভাগের স্নাতক করতে খুব কম অভিভাবক এখন স্বেচ্ছায় রাজি। তাই খানিকটা পরাজিতের মনোভাব নিয়ে অস্পষ্ট জীবিকার আশঙ্কায় সৃষ্ট হয়ে এখন যারা মানবিকীবিদ্যার চর্চা করছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁদের হীনমন্যতা থেকে কি সম্ভব হবে মুক্তবুদ্ধি রসজ্ঞ সংগীতবোদ্ধার উদ্ভব ? রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে খুব নবীন ভাবনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ কি আমরা পাব আর ? অথচ নবীন ভাবনাই যুগে যুগে শিল্পবোধের দরজা খোলে। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত এমন এক সূক্ষ্ম ও ক্রমোন্মোচন যোগ্য বিষয় যে আগামী বহু দশক তার বিশ্লেষণ-বিতর্ক-সংশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু করবে কে সেই কাজ ? বিজ্ঞান ও অন্যান্য বস্তুবিদ্যাধারীরা তো এখনই নীরব নিষ্ক্রিয়, মানবিকীবিদ্যাব্রতীরা হতমান ও শঙ্কিত।

রবীন্দ্রসংগীতের নতুন সৌন্দর্য, তার ভেতরের নিত্যজায়মান রহস্যের কথা তাহলে কোন লেখনীমুখে নির্গত হবে, ভবিষ্যৎ শতকে এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক।

শ্রোতা বোদ্ধা ও শিল্পীর এমনসব ভাবী শূন্যতার শঙ্কা থেকে পরিত্রাণের একটা বড় উপায় হল ভালো শিক্ষক ও উন্নতমানের শিক্ষণব্যবস্থা। আমার ভাবনা যে, এই দুটো কেবলই পেছনের দিকে টানছে আমাদের। কিন্তু সত্যিই তো দিনেন্দ্রনাথের মতো, শৈলজাবাবু অনাদিবাবুর মতো রবীন্দ্রসংগীত শেখাবার নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক নেই আমাদের। তবু তো সুবিনয় রায় আছেন, শুভ গুহঠাকুরতা আছেন, সুচিত্রা মিত্র আছেন নিদেনপক্ষে সুধীর কর আছেন, আছেন কিরণশশী দে। এখনও কি শিখতে পারি না আমরা কনক বিশ্বাস, গীতা সেন, কমলা বসুর কাছে? নীলিমা সেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এখনও শেখাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু এঁদের পর? প্রশ্নটা আরও গুরু এইজন্যে যে ১৯৯২ সালের পর রবীন্দ্রসংগীতের বাণী ও সুরের স্বত্ব আর থাকবে না বোধহয় বিশ্বভারতীর সংগীত পর্ষদের হাতে। তখন তো সুর ও গায়নের মাথাতথ্য ও শুদ্ধরূপের জন্য আমাদের অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হবে শিক্ষকদের ওপরেই। তার ব্যবস্থা এখন থেকে কিছু হচ্ছে বলে শুনি নি। কিন্তু তলায় তলায় অন্তর্ঘাতের একটা চোরাস্রোত চলছে তার খবরও আমরা তেমন করে রাখি না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক, কেননা রোগাক্রমণের গোড়ার দিকে বাইরে থেকে কিছু ধরা পড়ে না, সচকিত হতে হয় ক্ষরণ ও পচনের কালে। প্রশ্ন হল এতবড় পশ্চিমবাংলায় কয়েক হাজার রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থী এখন কাদের কাছে শেখে? সবাই কি বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রভারতীতে শেখে অথবা দক্ষিণী গীতবিতান ইন্দিরা রবিতীর্থের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে? নিশ্চয়ই নয়, অথচ তারা কেউই বসে নেই। তারা শিখে চলেছে এবং পেয়ে যাচ্ছে ডিপ্লোমা। এর জন্যে পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় সব শহরে গঞ্জে ও শহরতলিতে, নতুন-গড়ে-ওঠা উপনিবেশে ও ইস্পাতনগরে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষালয়, বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়ছেন অদক্ষ গৃহশিক্ষক। তাঁদের কতটুকু জ্ঞান আছে, শিক্ষা আছে, বোধ আছে বা কণ্ঠসম্পদ আছে এ প্রশ্ন কেউ তোলে না। তুললে ডিপ্লোমা মিলবে না। কিন্তু মুশকিল যে রবীন্দ্রসংগীতের ডিপ্লোমা মানে তো গ্রামসেবক বা ফার্স্ট এড ট্রেনিংয়ের ডিপ্লোমা নয়, এ যে জীবনের এক মহৎ অর্জন, এ যে রসলোকের চাবি! তাতে কি সেইজন্যেই সাবধানতা বা খুব বিচারবুদ্ধির সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নয়? এর পরের প্রশ্ন রবীন্দ্রসংগীতের এই পাইকারি ডিপ্লোমা-ব্যবসা কার হাতে? রবীন্দ্রভারতী নয়, বিশ্বভারতীও নয়? আশ্চর্য যে, বাঙালির সন্তানকে রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমা বিতরণ করে এলাহাবাদের 'প্রয়াগ সংগীত সমিতি' আর চণ্ডীগড়ের 'প্রাচীন কলাকেন্দ্র'। এদের প্রণীত শিক্ষাক্রমে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাচ্ছেন রাম শ্যাম যদু মধু এবং এই শিক্ষাক্রমের বশে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বেস্ট সেলার বই লিখছেন হরি বিশু রতন। এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ভবিষ্যতের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে সারা দেশে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবেন এই শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে-ওঠা গায়কগায়িকা। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবাংলা মানে শুধু শান্তিনিকেতন বা কলকাতা নয়, সেটা এক মস্ত ভূখণ্ড। সেই ভূখণ্ডের গরিষ্ঠসংখ্যক যারা তারাই প্রশাসন চালু রাখে, তারাই কলকাতার রাজনৈতিক সভায় জনসমাবেশ ঘটায়, তারাই খবরের কাগজের জনমত গঠন করে, তারাই ভোট দিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলের পালাবদল করে। তাদের সন্তানসন্ততিরাই রবীন্দ্রসংগীতকে বধ করবার জন্য গোকুলে বাড়ছে—সব রকমের রুচিদৃষ্টতা দূষণ ও মিশ্রণের আতঙ্ক ছড়িয়ে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচিত্রা মিত্র

সুবিনয় রায়

তাই ভয় হয়, দেবব্রত বিশ্বাসকে অনুশাসনে স্তব্ধ করে অথচ আশা ভোঁসলে ও কিশোরকে দিয়ে গাইয়ে যাঁরা ভুল করে চলেছেন, ভালো গাইয়েদের ছুঁৎমার্গের অজুহাতে রবীন্দ্রসংগীতের ধারে কাছে আসতে না দিয়ে যাঁরা আত্মতৃপ্ত, মাঝারিদের পালিশ করা সংবৃত গানকে যাঁরা বলতে চাইছেন শুদ্ধ, গানের চেয়ে স্বরলিপিকে যাঁরা বড় করতে চাইছেন—তাঁদের সকলের জন্যই হয়ত উদ্যত হয়ে আছে এক যুযুধান যদুবংশ। রবীন্দ্রসংগীত তবে কি সত্যিসত্যিই একুশ শতকে পৌঁছবে সেই করুণরঙিন অবরোধে, নাকি কোনো দৃপ্ত অভিজিৎ তার গায়ে পরম অভিমানের আঘাত হেনে খুলে দেবে মুক্তধারার তরঙ্গ অর্থাৎ আমাদেরই প্রাণের উৎসমুখ? □

তুমি যে গানটি পাঠিয়েছ

তুমি যে গানটি পাঠিয়েছ সে গানে প্রদীপশিখার ও কবির চিত্তে কোনো প্রভেদ আছে বলে মনে করি নে। উতল হাওয়া যাকে বলা হচ্ছে সেও একান্ত বায়ব্য পদার্থ না হতে পারে। অবশ্য ব্যাপারটা আত্মজীবনীর একাংশ নয়। মানুষের একটা কাল্পনিক আত্মজীবনী আছে, সেখানে তার নানা অনুভূতির অবাস্তব লীলা। এ না থাকলে কেবলমাত্র কবিজীবনীর সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করে গীতিকাব্য লেখা অসম্ভব। অন্তরে অনেকবার যেসব ভাব নানা উপলক্ষ্যে ভাবিত হয়েচে, বিস্মৃত হয়েচে, প্রেতশরীরীর মতো তারা ঘুরে বেড়ায় মনের কোণে কোণে, তাদের সূক্ষ্মসত্তা নিয়ে। এই সূক্ষ্মতাবশতই বিবিধরূপ দিয়ে তাদের আবদ্ধ করা সহজ। প্রদীপশিখার সঙ্গে ভোরবেলাকার তারার স্বাভাবিক সখিত্ব। উভয়েরই জীবনের চরম কথাটি সেই সময়ে আসন্ন আলোকে বিলীন হবে, অন্তিম মুহূর্তের জানাশোনা হবে দুজনের। সেই যে তাদের বাণী মরণদূতের জন্যে অপেক্ষা করচে—উতল হাওয়ার কানে কানে সেই কথাটি দেখার ইচ্ছা আছে শ্রীমতী দীপশিখার। অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অকথিত বাণীর বেদনাগান একে বলা যায়। এ গান কত ঘরে, কত কুণ্ঠিত হৃদয়ে বসন্ত নিশীথে গুঞ্জরিত হয়ে উঠচে—কবি তাকেই সুর দিয়েচে। যার প্রয়োজন সে একে গ্রহণ করতে পারে, যার প্রয়োজন নেই সেও হয়তো দেখবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তারো মনের কোথায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ইতি

'ধীরে ধীরে ধীরে বও' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

শঙ্খ ঘোষ

প্যারিস প্রদর্শনীর দিন

বিদেশভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী থাকতেন যাঁরা, তাঁদের বিষয়ে কখনো কখনো কবির অনুযোগ ছিল যে তাঁদেরই অনবধানে এসব ভ্রমণের অনেক জরুরি বৃত্তান্ত গেছে হারিয়ে। অনুযোগটি যে খুব সংগত, তা অবশ্য নয়। চিঠিপত্রে অথবা সাধারণ রিপোর্টে দেশে যে তাঁরা খবর পাঠাতেন সাধ্যমতো, তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। তবে এও ঠিক যে সেইসব রিপোর্ট বা চিঠিপত্রে পাওয়া ছবিগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার হয় নি আজও, প্রবাসের দিনগুলির সম্পূর্ণ ছবি আজও তাই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় সবসময়ে।

সেইরকম অব্যবহৃত কয়েকটি চিঠিপত্রের সাহায্য নিয়ে, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো প্যারিস-প্রদর্শনীর দিনগুলিতে একবার পৌঁছতে পারি আমরা। প্রদর্শনীর কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এলেন প্যারিসে, স্টেশনে এসেছেন আঁদ্রে-র স্বামী হগ্‌মান আর ভিক্টোরিয়া। হোটেলে অধীর অপেক্ষায় আছেন সদ্যরোগোত্তীর্ণ আঁদ্রে। এথনোগ্রাফিক মিউজিয়ামের সহাধ্যক্ষ তরুণ শিল্পসমালোচক রিভিয়ের-কে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ভিক্টোরিয়া, কয়েকটি ছবি দেখে কবির দিকে ফিরে বলছেন তিনি 'আপনি যে বড়ো কবি তা জানতাম, কিন্তু জানতাম না যে আপনি এত বড়ো শিল্পীও!' পরদিন সমস্ত সকাল জুড়ে নূতন-নূতন ছবি আঁকছেন রবীন্দ্রনাথ ; বিকেলবেলা এলেন জিদ। কয়েকখানি ছবি জিদের এতই পছন্দ হলো যে ফরাসি 'গীতাঞ্জলি'র একটা শোভন সংস্করণের প্রস্তাব করলেন তিনি, যেখানে এ-রকম কয়েকটি ছবির ব্যবহার করা যাবে। ভেবে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কথা উঠেছিল যে প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ভূমিকা লিখে দেবেন জিদ, কিন্তু পরদিনই তাঁকে জার্মানিতে চলে যেতে হচ্ছে বলে সম্ভব হলো না সেটা। কঁতেস দ্য নোয়াই লিখবেন ভূমিকা, এইরকমই ঠিক হলো শেষে।

হঠাৎ একদিন এসে পৌঁছলেন এজরা পাউন্ড। কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করে চলে গেলেন তিনি, তেমনি হঠাৎ। ইতিমধ্যে প্যারিসের গোটা গুণীসমাজকে ভিক্টোরিয়া জড়ো করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, এই পরিধিবিস্তার দেখে মঁসিয়ে কান্ ঈষৎ হতচকিত। প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কবিও একটু চঞ্চল আর চিন্তিত। পল ভালেরিকে নিয়ে এসেছেন ভিক্টোরিয়া। অভিভূত ভালেরিকে রবীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছেন দেশের খবর, তার হালফিল দশা। 'শান্তি আর যুদ্ধ' নামে যে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করেছেন কান্, ফরাসি মাটিতে প্রাণ-লুটিয়ে-দেওয়া হাজর হাজার ভারতীয় সৈনিকের কোনো উল্লেখমাত্র নেই তাতে, এই নিয়ে অনুযোগ করছেন কবি। এ আলোচনা থেকে সরিয়ে এনে ভালেরিকে ছবি দেখাতে শুরু করলেন ভিক্টোরিয়া। উত্তেজিত ভালেরি জানালেন যে প্যারিসের শিল্পীদের পক্ষে এই প্রদর্শনী হবে যথার্থ এক দীক্ষার মতো। সমস্তরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, এর একটি আলোচনা লিখবেন বলেও জানিয়ে যান।

কোন্ কোন্ ছবি দেখানো হবে তার নির্বাচন করছেন ভিক্টোরিয়া নিজেই। ছবির সঙ্গে দাম লিখে দেবারও প্রস্তাব ছিল তাঁর, ছোটোগুলির জন্য ২০০০ ফ্রাঁ আর বড়োগুলি ৫০০০। কিন্তু মানা হলো না সেটা। কঁতেস দ্য নোয়াই ভাবছেন কোন্ পোশাকে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ইচ্ছে ধবধবে শাদা পোশাক। একটাই তার মুশকিল যে শাদা টুপি নেই সঙ্গে। আঁদ্রে তখন তাড়াতাড়ি বানাতে বসলেন টুপি।

তিনটের সময়ে শুরু হলো প্রদর্শনী। ধূসর ভেলভেটে ঢাকা দেয়াল, অদৃশ্য উৎস থেকে স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ছে, অদ্ভুত একটা সিঁড়ি উঠে গেছে যেন স্টিমারের ডেকে, আর তার ওপাশে প্রদর্শনীঘর। সুনির্বাচিত সুবিন্যস্ত ছবিগুলি এমনভাবে রাখা আছে সেখানে যে আঁদ্রেরও মনে হয় যেন নতুন দেখছেন সেগুলি। রেখার দৃঢ় টানে, গভীর অর্থের ব্যঞ্জনায় যেন নতুনভাবে ঝলসে উঠছে তারা। ভিড় জমে উঠছে ক্রমে। শাদা পোশাকে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন, পাশেই ভালো পোশাকে কঁতেস দ্য নোয়াই। 'প্রফেট' বললেন কেউ কেউ। চীন থেকে, সিংহল থেকে, পেরু থেকে এসেছেন দর্শকদের মধ্যে অনেকে। নিউইয়র্ক থেকে হঠাৎ চলে এসেছেন গ্রেচেন গ্রীন। সবাই পছন্দ করছেন মুখোশ, জীবজন্তু আর নিসর্গের ছবিগুলি। নিসর্গচিত্রগুলির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভিক্টর হুগো-র ছবির। কখনো শোনা যাচ্ছে গগ্যাঁরও নাম। একটা-কোনো তুলনার ভর না পেলে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতাকে যেন নিতে পারে না সবাই। সোরবোনের অধ্যাপকেরাও আছেন। 'ক্যালকাটা স্কুল বা অবনীন্দ্রনাথের কাজের মতো একেবারেই নয়'—বললেন একজন মহিলা। 'সারাজীবন তবে ছবিই এঁকেছেন ইনি' বললেন আরেকজন। আলোচনায় উত্তেজনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আছে ঘরের আবহাওয়া। সাড়ে ছটার সময়ে কবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পাশের ছোটো একটা ঘরে, বিশ্রামের জন্য। লোকেরা কেবলই দেখা করতে চাইছে, কথা বলতে চাইছে তাঁর সঙ্গে। কথা বলার জন্য এগিয়ে দেওয়া হলো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে কিংবা গ্রেচেন গ্রীনকে।

রাত্রে, কবি আবার তাঁর নিজের ঘরে একা, বুঝতে পারছেন না যে অন্যেরাও এসেছেন ঘরে, হিমশৃঙ্গের শুভ্র শান্তি নিয়ে ঝুঁকে আছেন টেবিলে, আঙুলের সুচারুছন্দে শাদা কাগজের ওপর ফুটে উঠছে আরো কোনো কোনো স্বপ্নশরীর, তিনি নিজে যাদের নাম দিয়েছিলেন 'জিপসিজ অব্ আর্ট'। □

প্যারিসের প্রদর্শনীতে কঁতেস দ্য নোয়াই, রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

পূর্ণেন্দু পত্রী

টাউন হল ও রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনোই পায় নি আদর্শ এবং আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্য ভূখণ্ডের সম্মান। এ-শহরে জন্মেও এবং আকৈশোর লালিত হয়েও, স্বাধীন যৌবনে পৌঁছবার পর থেকেই বারবার উপভোগ করতে চেয়েছেন এখান থেকে পালিয়ে-যাওয়ার সুখ। চিঠিপত্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে কলকাতা সম্পর্কে তাঁর বীতরাগের নানান টুকরো। অথচ এও এক আশ্চর্য যে কলকাতার কোনো ডাকেই সাড়া দিতে দেরি হয় নি তাঁর এতটুকু।মুখে অবশ্য অনীহার উক্তি ফুটেছে প্রায়শই। আবার যখন এসেছেন, অসুস্থ শরীরের পিছুটানকে ছেঁড়া কাগজের মতো ছুঁড়ে দিয়েছেন দূরে। দায়িত্বের বোধে অবনত অবয়বও তখন ঋজুরেখ।

কলকাতা তার নির্বোধ দাঁতে কামড়ে খেয়েছে একদিন তার শ্রেষ্ঠতম সৌধকে, যার নাম সেনেট হল।। আরও একটা ঐতিহাসিক চরিত্রের পৌরুষশালী সৌধকে কবে কখন গলাধঃকরণ করবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন, যার নাম টাউন হল। এতদিন পরে, কলকাতার শুকনো আগুনে-পোড়া বাতাসে হঠাৎ মৌসুমী হাওয়ার ঝলকের মতো মিশে গেছে এক অবিশ্বাস্য সুসংবাদ যে, অবধারিত মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়েছে ঐ অট্টালিকা। রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মদিনের পুণ্য প্রভাবে টাউন হলের দরোজা আবার সেই আগের মতোই চিরউন্মুক্ত করে দেওয়া হবে কলকাতাবাসীদের প্রয়োজনে। এখন দ্রুত চলেছে সংস্কার-পর্ব, আবার তাকে রাজকীয় মহিমার পোশাক পরিয়ে দিতে। এই সুযোগে আমরা যদি শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই টাউন হলের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার দিকেই তাকাই, তাহলে এক সঙ্গে দেখতে পেয়ে যাব দুটো রবীন্দ্রনাথকে। এক রবীন্দ্রনাথ যিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না কলকাতার যে-কোনো আন্তরিক আহ্বান। আর এক রবীন্দ্রনাথ যিনি সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিয়ত মার-খাওয়া দেশের সমস্ত প্রবল প্রতিবাদে মেলাতে চান নিজেরও বিবেকী কণ্ঠস্বরের যুক্তি-তর্ক এবং বেদনা-বিক্ষোভ। রাজনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক সংকটের পর্বে-পর্বান্তরে কলকাতা উৎকর্ণ হয়েছে তাঁর সুপরামর্শের প্রয়োজনে। কবির মুখে শুনতে চেয়েছে দেশনেতার ভাষণ। আর কবিও হয়ে উঠেছেন মুক্তির পথপ্রদর্শক।

৭ অগস্ট, ১৯০৫। গোটা কলকাতা সেদিন টাউন হলের দিকে। গোটা কলকাতার রাজপথে শুধু কালো মাথা আর কালো পতাকা। মিছিলে মিছিলে শহর সেদিন মানুষের সমুদ্র। আর প্রত্যেক মিছিলের আগে নীল ফেস্টুন কেবল জ্বলজ্বলো দুটো শব্দ, বাংলা অখণ্ড। কার্জনী চক্রান্তে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলকাতায় সেদিন সংগ্রামের মহড়া। টাউন হল একটা। কিন্তু জনসমাগম এমনই যে দশটা টাউন হলেও জায়গা হবে না সকলের। অতএব তিন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হল সমাবেশ। প্রথম সভা টাউন হলের দোতলায়। সভাপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। দ্বিতীয় সভা টাউন হলের একতলায়। সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তৃতীয় সভা টাউন হলের সামনের মাঠে। সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার। বিদেশী বয়কটের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা। না, শুধু কলকাতা নয়, অখণ্ড বঙ্গ। কেননা, সে সমাবেশে হাজির ছিলেন গোটা বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় সকলেই। কোনো জেলার কোনো নেতাই অনুপস্থিত নন সেখানে। রবীন্দ্রনাথ তখন বোলপুরে। দেশের মর্মমূলে কোন ধরনের অগ্ন্যুৎসব জন্ম নিতে চলেছে, তা টের পেয়ে যাচ্ছেন দূরে থেকেও। আর ভাবছেন এই নঞর্থক রাজনীতির আরম্ভে যতই থাকুক বজ্রনির্ঘোষ, শেষ পরিণাম পৌঁছবে কোন সুফলের বর্ষণে? বাংলাদেশের মুকুটহীন রাজা তখন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁকে এবং তাঁর রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষিত সহযোগীদের জানিয়েও দিলেন নিজের অভিমত এবং আশঙ্কা। কিন্তু রাজনীতিবিদরা কবির কণ্ঠস্বরকে কবে আর দিয়েছে যোগ্যতর সম্মান! শরীর অসুস্থ। তবুও সপ্তাহখানেক পরেই চলে এলেন কলকাতায়। একটু সুস্থতাবোধের সঙ্গে সঙ্গেই টাউন হলের সভায়। তারিখ, ২৫ আগস্ট। পড়লেন 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামের প্রবন্ধ। আচমকা রাগের ঘোরে স্বদেশী হওয়ার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে জোর দিলেন দেশের মধ্যেকার যথার্থ ঐক্যের বাঁধনকে শক্ত করতে।

কলকাতা থেকে চলে গেছেন গিরিডিতে। শহরের উত্তেজনা থেকে দূরে। অথচ যেখানেই থাকুন, স্বদেশী আন্দোলনকে উত্তেজনা জোগানোর গান লিখে চলেছেন নিয়মিত। গিরিডিতে থাকতে থাকতেই কলকাতার ডাক। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষণার সরকারি

দিন ১৬ অক্টোবর। তাঁকে আসতে হবে তার আগে। এলেন ৩:৯অক্টোবর বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ির বিজয়া সম্মিলনী-র অনুষ্ঠানে প্রস্তাব করলেন ঐ দিনটিকে রাখী বন্ধনের দিন হিশেবে উদযাপিত করতে। লিখে ছিলেন সেই বিখ্যাত গান 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। আর বঙ্গভঙ্গের সেই বিশেষ দিনটিতে নিজে শহরের রাস্তায় রাস্তায় কীভাবে গান গেয়ে পথ পরিক্রমা করেছেন, রাখী বেঁধে দিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের হাতে, তার খানিকটা ইতিহাস আমাদের জানা।

বয়কয় আন্দোলনের সঙ্গে

এর পর জুড়ে গেল এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির বিপুল কর্মোদ্যম, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশকে গলা টিপে মারার কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে কলকাতায় সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রপাত সেই থেকে। ক্রমে আন্দোলনের মুখটা বেঁকে গেল সরকারি বিদ্যালয় বর্জন করে জাতীয় শিক্ষালয়ের দিকে। তা নিয়ে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিপুল জনসভা। তার অধিকাংশেই রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ উপস্থিতি।

১৯০৬-এর আগস্ট, সদ্য গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম স্কুল শুরু হওয়ার আগের দিন টাউন হলে পরিষদ-প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন সভা। সভাপতি রাসবিহারী বসু। বক্তাদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ আর রবীন্দ্রনাথ। লিখিত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পড়লেন

"অনেকদিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল।... আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহাই নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।"

অল্প পরে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বক্তৃতামালা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষায় তিনি সংযোজিত করলেন কমপারেটিভ লিটারেচরের ধারণা। সেদিনের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বীজ থেকে আজকের বহুশাখাময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১১। 'প্রবাসীর' ফাল্গুন সংখ্যায় ছেপে বেরল এই রকম একটা সংবাদ "টাউন হলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাঁহারা অল্পেমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, অথবা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।" উপলক্ষ, তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

১৯১৩-য় আরো একবার দেশবাসীর শ্রদ্ধানিবেদনের সভায় টাউন হলে আমরা উপস্থিত হতে দেখতাম তাঁকে। নোবেল পুরস্কার অর্জনের সুবাদেই কলকাতা আয়োজন করতে চেয়েছিল সে-সভা। রবীন্দ্রনাথ সে-সভা সম্পর্কে অনিচ্ছুক। প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন "শুনতে পাচ্ছি ছুটির পরে নভেম্বর মাসে আমাকে সং সাজিয়ে টাউন হলে একটা সমারোহ করবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং চাঁদা আদায় চলেছে।" টাউন হলে সে-সভা হয় নি। দেশবাসীর সম্মান তিনি গ্রহণ অথবা বর্জন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের বিশাল সমাবেশে। এর চার বছর পরে টাউন হলের আর এক জরুরি সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্মত ছিলেন অংশগ্রহণে। উপলক্ষ, অ্যানি বেশান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। কিন্তু সে সভা হয় নি। ইংরেজ সরকার পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, অন্য কোনো প্রাদেশিক সরকারের কাজের সমালোচনার জন্যে তাঁরা সরকারি বা আধা-সরকারি বাড়িতে সভা করতে দিতে নারাজ। টাউন হলের সভা ঠাঁই পাল্টে চলে এল রামমোহন লাইব্রেরিতে।

রবীন্দ্রনাথ পড়লেন তাঁর সেই তিক্ত বিদ্রূপের প্রবন্ধ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

১৯৩১। টাউন হলকে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক ভূমিকায়। এতদিন সে শুধু ছিল সভাক্ষেত্র। হঠাৎ হয়ে গেল শিল্পক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের পূর্তি উৎসব উদযাপন করবে কলকাতা। সেই উপলক্ষে টাউন হলে আয়োজন করা হচ্ছে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী। সেই সঙ্গে জুড়ে আছে সম্বর্ধনা সভাও। প্রধান উদ্যোক্তা অমল হোম। প্রদর্শনী আর মেলার দায়িত্বে, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। উৎসব উদযাপনের যে প্রাথমিক আহ্বানলিপি, সেখানে প্রথম স্বাক্ষর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। সম্বর্ধনার অভিনন্দন-বাণীর লেখক শরৎচন্দ্র। তা ছাড়াও দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে যাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিশেবে বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রতিভাদেবী, রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশ বসু নিজে অবশ্য পাঠ করতে পারেন নি তাঁর ভাষণ। অসুস্থ থাকায় সেটা পড়েন কবি কামিনী রায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির হাতে উপহার হিশেবে তুলে দেন 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'। ক্ষিতিমোহন সেন, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-পরিচয় সভার পক্ষ থেকে, উপহার দেন 'জয়ন্তী-উৎসর্গ'। কবিসংবর্ধনার তারিখটা ছিল ২৭ ডিসেম্বর। ছবির প্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে তার দুদিন আগে। উদ্বোধক, ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য। সেদিন বিকেলে ঐ টাউন হলেই কবির সম্মাননায় আয়োজন করা হয়েছিল এক সাহিত্য সম্মেলনের। সভাপতি শরৎচন্দ্র।

এরই পরের বছরে সত্তরে পা দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ডিসেম্বরের ১১ তারিখে টাউন হলে সম্বর্ধনা। সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে জানালেন "বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার থেকে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহানিহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি বিচারশক্তি, বোধশক্তি।"

১৯৩৬। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা-র সমস্যা হঠাৎ নাড়া দিয়েছে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের শাসন নীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশে দেশবাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বিচলিত। ভারতসচিবের কাছে পাঠানো আবেদনে তাই প্রথম স্বাক্ষরটি তাঁরই। তাতেও সুফল ফলে নি কোনো। সরকার পক্ষ অনড়, অটল। তাই টাউন হলে আবার এক প্রতিবাদসভা। তারিখ ১৫ জুলাই। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ছুটে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, আর তুলসীচরণ গোস্বামী, তাঁকে ঐদিনের সভায় উপস্থিত করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের শুরুতেই জানালেন

"আমি রাজনীতির লোক নই। আজিকার আলোচ্য বিষয়— সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—মুখ্যত রাজনীতিরই প্রশ্ন। স্বভাবত এ কথা সত্ত্বেও এ আলোচনায় আমি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের জাতীয় ঐক্য-বোধকে বিচূর্ণ করিবার জন্য যে শক্তি আজ উদ্যত হইয়াছে তাহার প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী সুদৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন।"

১৯৩৭-এর ২ অগস্ট। আবার জনসভা। এবং আবার সভাপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীরা শুরু করেছে অনশন ধর্মঘট। জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতির সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলাটাই ছিল সভার উদ্দেশ্য। মৌখিক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা জানালেন তার মর্মার্থ এইরকম এক সপ্তাহেরও বেশি প্রায় দুশো বন্দী আন্দামানে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। অথচ সে সংবাদ গোপন করে রেখেছে ভারত সরকার। জনসাধারণের সেন্টিমেন্টের প্রতি এই সরকারি ঔদাসীন্য আমাদের জাতীয় অসহায়তারই প্রতীক। ইংলন্ড বা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এটা ছিল অসম্ভব। বন্দীদের দাবি অত্যন্ত সামান্যই। ভারত থেকে হাজার মাইল দূরে রেখে বন্দীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পর্কে দেশের মানুষের আশঙ্কা নিতান্তই স্বাভাবিক। অতএব তাঁদের ভারতেই রাখার ব্যবস্থা করা হোক। তাতে আর কিছু না হোক, কারাগারের অমানুষিক রূঢ়তার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন ঘটবে কিছু পরিমাণে।

ঠিক এই রকমই আরেক ঘটনায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর তিরস্কার ঘোষিত হওয়ার তারিখ ছিল ১৯৩১-র ২৬ সেপ্টেম্বর, হিজলি জেলে রাজবন্দী-হত্যার আর নির্যাতনের প্রতিবাদে। কিন্তু অসম্ভব জনসমাগমের ফলেই সম্ভবত সে সভার জায়গা বদল হয় মনুমেন্টের পাদদেশে। রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে পৌঁছেছিলেনও। সেখানকার শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে, তাঁর অসুস্থ শরীরের দিকে তাকিয়ে, গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসা মনুমেন্টের মুক্ত পরিবেশে।

জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত অট্টালিকার ইতিহাস লিখতে শিখি নি এখনো আমরা। শিখলে কোনো একদিন টাউন হলকে আদ্যোপান্ত জানতে পারব আমরা। আর সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের চেনা হবে আরেক রবীন্দ্রনাথ হিশেবে, যিনি পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতিদিনের বিদ্রোহ-বিপ্লবের বেদনার্ত বিশ্লেষকই নন শুধু, আলোড়িত সমর্থক ও সংগঠক। □

দেবেশ রায়

ফিরে আসার প্রত্যাশায়

নোবেল প্রাইজই হয়ত আমাদের এই প্রচারের এক বাস্তব সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছিল, যে, আমাদের এই বাংলা ভাষার নেহাতই এক বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীর পক্ষেই পড়বার মত কিছু কবিতা লিখেছেন. কিন্তু ও- প্রাইজ পাওয়ার আগেই বিশ্বসাহিত্যের তেমন কিছু রসজ্ঞ বাংলাভাষী ছিলেন যাঁরা কথাটা বিশ্বাস করতেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ফলে এ বিষয়ে কারো আর কোনো সন্দেহেরও জায়গা থাকল না—প্রায় হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল। এই এমন প্রমাণটি না পাওয়া গেলে এক দিক থেকে, বা, হয়ত সব দিক থেকেই ভাল হত। তা হলে বাংলা পাঠককে রবীন্দ্রনাথ পড়ে-পড়ে ও বিশ্বসাহিত্যের পাঠ নিয়ে-নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ এক আত্মপরীক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে হত।

কিন্তু তেমনটি যে ঘটল না, তার ফলে আমাদের এক ক্ষতি ত হয়েই চলেছে যে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের পড়া হল না, কিন্তু আরো বড় এক ক্ষতি আমাদের বইতে হচ্ছে যে বিশ্বসাহিত্যের কোনো নিজস্ব নিরিখ আমাদের সাহিত্যে তৈরি হয়ে উঠল না। বিশ্বের সঙ্গে যিনি আমাদের সেতু, তিনিই বিশ্বের সাহিত্য থেকে আমাদের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন। বা, তাঁকে আমরা সেতু হিশেবে ব্যবহার করার চাইতেও বিচ্ছিন্নতার পরিখা হিশেবে ব্যবহার করে ফেললাম বেশি। আমাদের ত রবীন্দ্রনাথই আছেন—সেই সনদের জোরে আমরা আমাদের প্রাদেশিকতাকেও আন্তর্জাতিকতা বলে চালিয়ে দিতে চাই।

বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বাংলা সাহিত্যের পথ দিয়েই ঘটেছিল কি না, সে সংশয় আমাদের এখনো কাটে নি। তাই, এখনো পুথিপত্র ঘেঁটে বাংলা ভাষার গবেষক প্রমাণ করেন নোবেল প্রাইজ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন নিজের জোরে। একই পরিমাণ পুথিপত্র ঘেঁটে বাংলার বুদ্ধিজীবী তাঁর মৌলিকতা প্রমাণ করেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রাইজ পেয়েছিলেন খুঁটির জোরে আর, এই সব মামলা-মোকদ্দমাতে সাহেবদের লেখালেখি চিঠিপত্র মত-মন্তব্য স্মৃতিকথা, এই-সবই ত একমাত্র দলিল-দস্তাবেজ।

মামলাটা যে বরাবরই ওঠে ও কোনো দিনই শেষ হয় না, তার কারণ, নোবেল প্রাইজ দেয়ার ঘটনাটা, যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে, একটা তথ্যমাত্র, সে-তথ্য বাড়েও না, কমেও না ; কিন্তু আমাদের কাছে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ঘটনাটা, রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতখানি ঠিক ভাবে নিয়েছি বা নেই নি তার সামাজিক মনস্তত্ত্বের অংশ। রবীন্দ্রনাথকে বেশি গ্রহণ করে ঠকে যাচ্ছি না ত—বেশ বাঘা-বাঘা বুদ্ধিজীবীর এই সংশয় কখনোই কাটে না। নিজের লাভ ক্ষতির হিশেব যদি অন্যের খাতা দেখে মেলাতে হয়, তা হলে সে হিশেব বারবারই ফিরে-ফিরে দেখতে হয়.

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই যদিও শুরু, তবু ব্যাপকভাবে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবোধের বিপদটাই সেখানে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজন ও সাহিত্যের আবেগ থেকে আমরা বিশ্বের কাছে যাই নি। আমরা বিশ্বের কাছে, আধুনিক বিশ্বের কাছে গিয়েছি—কারণ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ঘাড়ে ধরে, বা বেয়নেটে গেঁথে সেই বিশ্ববাজারে বসিয়ে দিয়েছিল। অনেকে মনে করেছেন তাতে আমাদের পেছনে পড়া জীবনে একটা গতি এসেছিল। ইতিহাসে সেটা সত্যও বটে। কিন্তু সাহেবদের বেয়নেটের খোঁচায় যে গতি আমাদের জীবনে এসেছিল তা নিশ্চয়ই কোনো দিক দিয়েই, আগে চলার গতিতেই যে জাতি বা দেশ, বিশেষ করে পশ্চিম মহাদেশের, এগিয়ে গেছে, তার গতির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

কিন্তু এই তুলনা আমরা বারবার করে থাকি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি করে থাকি। যেন, আমাদের কাছে আন্তর্জাতিকতার একমাত্র প্রসঙ্গ ইয়োরোপ, আরো নির্দিষ্টভাবে ইংল্যান্ড, আরো নির্দিষ্টভাবে এমন-কি চীন-জাপানও নয়।

প্রায় বছর বিশ-পঁচিশ আগেই শিবনারায়ণ রায় বা বুদ্ধদেব বসু যখন রবীন্দ্রনাথকে এই পশ্চিম মহাদেশের সংস্কৃতির নিরিখে তুলনা করেছিলেন, তখন তাঁদের আপাত যুক্তিসঙ্গত কথাকেও দেশের মানুষের মনে হয়েছিল ভুল কথা। সমষ্টির প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র কোরাসে সেদিন শিবনারায়ণবাবু বা বুদ্ধদেববাবুকে হয়ত অনেক কুকথাই শুনতে হয়েছিল আর আমাদের মত অক্ষরজ্ঞানহীন সংখ্যাগুরুর দেশে সেই প্রতিক্রিয়ার বেশির ভাগটাই ছিল সংস্কারান্ধতা থেকে। পরে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যা খুশি তাই লেখা হলেও যে প্রতিবাদ হয় না, তারও কারণ, সংস্কারের প্রতিক্রিয়ার শক্তি বারবার ধাক্কা খেলে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শিবনারায়ণবাবু ও বুদ্ধদেববাবুর বক্তব্য আর সেই বক্তব্যের সেদিনের বিরোধিতা মতাদর্শের দিক থেকে একই প্যারামিটারে ছিল—পরিস্থিতির এটাই ছিল কৌতুক। ইয়োরোপীয় রেনাসাঁসের বিশ্বসাহিত্যবোধ থেকে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিচারে একটি বিশ্বনিরিখ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সেই বিশ্বসাহিত্যবোধ থেকে প্রতিবাদও উঠেছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথের সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের ঐ নিরিখেই প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছি

জাতীয় প্রয়োজন ও সাহিত্যের আবেগ বিশ্ববাজার ও বিশ্বসাহিত্যে আমাদের যদিও নিয়ে যায় নি, তবুও, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে সেখানে আমাদের উপস্থিত করা হলেও, তারও ত একটা দ্বান্দ্বিক গতি আছে। ইয়োরোপের যে রেনাসাঁসের প্রতিক্রিয়ায় আমরা সাম্রাজ্যের প্রজা ও তার আনুষঙ্গিক বিশ্বসাহিত্যবোধের শরিক হয়েছি, সেই রেনাসাঁসের বিপরীত বিক্রিয়ায় ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সৃষ্টি ও মননের আন্দোলনও হয়ত আমাদের কাউকে-কাউকে প্রেরণা দিয়েছে। তাই আমাদের এই বিশ্বসাহিত্যবোধে গেটেও যেমন এক উপকরণ, বোদলেয়রও তেমনি, র‍্যাঁবোও ত অনেকখানি। আবার প্রায় বিপরীতেই জার্মান ভাষায় টোমাস মান, ফরাসিতে এলুয়ার-আরাগঁ, স্পেনীশ ভাষায় নেরুদা আমাদের বিশ্বসাহিত্যবোধের অন্তরঙ্গ হয়ে যান।

ইয়োরোপের ইতিহাসে এই কবিলেখকদের ভিতর সময় ও দেশের পার্থক্য, এমন-কি শতাব্দীর পার্থক্য—বা মহাদেশের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েই আমরা ওঁদের আমাদের বিশ্বসাহিত্যবোধের উপাদান করে নিয়েছি। অস্বাবলম্বন, অনুগ্রহজীবিতা, পরাশ্রয়িতা ও সেই পরের প্রয়োজনেই বারবার ব্যবহৃত হওয়ার দৈনন্দিন অপমান আমাদের পরাধীন অস্তিত্বের ভিতরে-ভিতরে যে-জ্বালাগ্নি লেলিহান রেখেছে নিয়ত, তারই তাপে আমরা ইয়োরোপের পাঁচ-ছশ বছরের ইতিহাসকে গলিয়ে নিয়েছি, তাদের বিচিত্র ও বিবিধ ভাষা ও সাহিত্যরূপকেও গালিয়ে নিয়েছি।

বাঙালি-ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে যে ইয়োরোপ সংহত হয়ে আছে, সে ইয়োরোপের অস্তিত্ব কোনো ইয়োরোপীয় মানুষের মনে নেই, থাকা অসম্ভব। আর, গেটে থেকে নেরুদা—এই সব কিছু মেলানো বিশ্বসাহিত্যে আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ বোদলেয়ারের আধুনিকতা তাই রবীন্দ্রনাথেই আমাদের খুঁজতে হয়, পেতে হয়, অথবা না-পেয়ে বিলাপ করতে হয়। র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' রবীন্দ্রনাথের ভগ্নতরী কল্পনার উপমান হয়ে ওঠে। নেরুদার আসক্তি বা আরাগঁর প্রতিবাদ বা এলুয়ারের সন্ধ্যাভাষাও আমরা অগত্যা রবীন্দ্রনাথেই চাই!

পরাধীন দেশের মানুষ বলেই আমরা ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবিরোধী প্রতিবাদী মননের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি বেশি। রোলাঁ, বারবুজ, লুকাচ সেই মননের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিশেবে আমাদের কাছে এসেছেন। তাই, যখন আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি— রোলাঁ তাঁর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত জার্নালে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা রংকানা ছিলেন আর তাঁর সঙ্গীতের বোধও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তখন আমরা রোলাঁর কথাটাই বেশি মেনে ফেলতে চাই যেন! লুকাচ যখন 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় ব্রিটিশের পরোক্ষ সমর্থক বলে তিরস্কার করেন, তখন, লুকাচের ফাসিস্তবিরোধিতা আর আমাদের রাবীন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার অন্তর্বর্তী এই ব্যবধানে কাতর হয়ে পড়ি যেন! সম্প্রতি কালে আমরা এও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের চীনদেশ ভ্রমণে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তরুণ মাও-ৎসে-তুঙ ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা। অথচ চীনদেশের প্রবীণতর আর নবীনতর পরিবর্তনকে ভারতের পক্ষে এমন ঘনিষ্ঠ এক বিষয় করে তুলেছিলেন ত রবীন্দ্রনাথই এই সব সাম্প্রতিক সাক্ষ্যের সামনে আমরা যে এখনো ফুঁসে উঠি না—সেও ত সেই ইয়োরোপীয় সাহিত্যবোধ বা বিশ্ববোধেরই ভুল ফল। এমন কি রোলাঁও রবীন্দ্রনাথকে বিচার করে ফেলেছিলেন ইয়োরোপীয় নিরিখেই। রং আর সুর বলতে রোলাঁ যে নির্দিষ্টতা চাইছিলেন, তা ভারতীয় চর্চার বাইরের জিনিশ। রোলাঁও ত তাঁর জার্নালে কোথাও এমন সাক্ষ্য রাখেন নি যে তিনি ভারতীয় সুর ও ছবির পেছনকার ইতিহাস ও ব্যবহারের বিধি জানতেন। যেমন, লুকাচ বোঝেন নি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বৈততাকে। রবীন্দ্রনাথের গান্ধী-বিরোধিতাকে তিনি ভুল করেছিলেন গান্ধী সমর্থন বলে! আর চীন দেশের তরুণ কমিউনিস্টরা তাঁদের দেশের ভাষা-সাহিত্যসংক্রান্ত এক রাজনৈতিক লড়াইয়ের পক্ষপাত দিয়ে বুঝে নিতে চাইছিলেন প্রতিবেশিতা সত্ত্বেও সুদূর এক দেশের অজানা এক ভাষার কবিকে। বাঙালি কবি থেকে বিশ্বকবি হয়ে ওঠায়, 'বিশ্ব' বলতে যে ইয়োরোপকেই একমাত্র বোঝানো হত, সেই ইয়োরোপের নিরিখেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চেয়ে আসছি—তাঁর জন্মের ১২৫ বছর পর তাঁকে আবার নেহাতই বাংলা ভাষার কবি হিশেবে পুনরাবিষ্কারের তাই এমন কঠিন প্রয়োজন। □

ত্রিদিবকুমার বসু

গিরি অভ্রভেদী তাদের বিজয়বেদী

১৮৮৩-র মার্চে ডব্লু ডব্লু গ্রাহামের নেতৃত্বে হিমালয়ে প্রথম পর্বতাভিযান শুরু হলেও ১৯৫৩য় এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের পরই সাধারণ বাঙালি তরুণদের মধ্যে প্রথম পর্বত অভিযানের ব্যাপারে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ১৯৬০-এ নন্দাঘুন্টি অভিযান আর একটি সাড়া জাগানো ঘটনা—যার প্রভাবে গত কুড়ি-বাইশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ-তরুণী পর্বত অভিযানের বিস্তৃত আঙিনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখনো করছেন। পর্বতারোহণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন কম করে প্রায় ৫০টি পর্বতারোহণ সংস্থা আছে যার অধিকাংশই বছরে অন্তত একবার কোনো এক শৃঙ্গ অভিযানের জন্য তাদের সদস্যদের হিমালয়ে পাঠিয়ে থাকে।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে পর্বত অভিযানের মতো শিলারোহণ বা রক-ক্লাইম্বিং কোর্সও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একটা কি দুটো রক-ক্লাইম্বিং কোর্স করার পরে-পরেই আবার কিছু ছেলেমেয়ে যান হিমালয়ে ট্রেক করতে। অনেকে দার্জিলিং, উত্তরকাশী বা মানালির পর্বতারোহণ শিক্ষণ সংস্থায় শিক্ষা নিয়ে ক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হন। কোনো রকম প্রশিক্ষণ না নিয়েও এখন অনেক তরুণ-তরুণী এমনকী বয়স্করাও হিমালয়ে ট্রেক করতে বেরিয়ে পড়ছেন। এ সব খুবই উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সন্দেহ নেই।

কিন্তু শিলারোহণের নাম মাত্র প্রশিক্ষণ আর তুষারমৌলী হিমালয়ে অভিযান ছাড়াও আর একটি বিশেষ দিকে কলকাতার এবং কলকাতার বাইরেও বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দু-একটি সংস্থার সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়। ইংরেজিতে একে ক্যাম্পিং বলা হয়ে থাকে। এই সব ক্যাম্পে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাহাড় নদী জঙ্গল ইত্যাদির মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। গাছপালা, পশুপাখি, আকাশের তারা যতটা পারছে এরা চিনছে, ম্যাপ কীভাবে পড়তে হয় এরা শিখছে, ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ক্যাম্পের জায়গা তৈরি করছে, তাঁবু খাটাচ্ছে, রান্না করছে; পাহাড়ে জঙ্গলে বিপদে পড়লে তার থেকে কী করে রক্ষা পেতে হয় তা শিখছে; শিলারোহণও খানিকটা শিখছে সুযোগসুবিধা মতো। এই সব সংস্থার কর্মপদ্ধতি যে সমস্তই সমালোচনার উর্ধ্বে তা নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এঁরা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সেই ভালোবাসার আগুনকে ব্যাপক করতে চান। এদের ভয় ভাঙাতে চান। এক সাথে কাজ করার মনোবৃত্তিকে সুষ্ঠু ও ছন্দোবদ্ধ করতে চান।

পর্বতারোহণ, ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিং প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের এই যে বিশাল পটভূমি এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে রবীন্দ্রনাথকে একবার স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে নামেই খ্যাত হন না কেন, জীবনের এই বিশেষ দিক সম্বন্ধেও যে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং সেই আদ্যিকালেও যখন বাংলায় পর্বতারোহণ বা এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল তখন তিনি এক ভিন্ন পথের পথিক হয়েও এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

এ বিষয়ে প্রথমেই যে উল্টো সুরটি আমায় গাইতে

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবি

হবে তা হল—রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু কবি সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদপেই পাহাড় পর্বত ইত্যাদি-ভালোবাসতেন না। তাঁর বক্তব্য : "পাহাড়ে…গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহাড়াওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি।" ('ভানুসিংহের পত্রাবলী' পৃঃ ৩০০)। এ তো গেল সোলনের কথা। আলমোড়া থেকে লিখছেন—"প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে, পর্বতকে আমি এখনো হৃদয় দিতে পারি নাই।" ('রবীন্দ্রজীবনী', ৩য়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৮) ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ঘুরেও তাঁর মন ভরল না। তিনি লেখেন, "আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভালো লাগল না।" (ঐ। পৃ ৪০৩) মংপুর অভিজ্ঞতা আরোও খারাপ। ('চিঠিপত্র', ৪র্থ। পৃ ২০৬) একমাত্র কালিম্পংয়ে কিছুটা এবং নৈনিতালের কাছে রামগড়ে তিনি সব থেকে বেশি তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে পর্বত ভালো না লাগলেও তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ ভ্রমণ কিন্তু হয়েছিল এই হিমালয়ের কোলেই। প্রথম হিমালয় দেখেছিলেন বারো বছর বয়সে বাবার সাথে ডালহৌসিতে এসে। শেষ ভ্রমণ মৃত্যুর কিছু পূর্বে কালিম্পংয়ে। হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে তিনি কম করেও পঁচিশ বার এসেছিলেন। উত্তর আমেরিকার রকি এবং ইউরোপের আল্পস দেখা ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আণ্ডিজ পর্বত দেখার এক সুযোগও তাঁর এসেছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনা অবধি যাবার পর স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে আর আণ্ডিজ পেরিয়ে পেরু যেতে দেওয়া হয় নি। চীন ভ্রমণের সময় পিকিং-এর পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলও তিনি ঘুরে দেখেছেন। যাই হোক, নেই নেই করেও পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়। এই সব ভ্রমণ যে তিনি সব সময় রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্যে সেরেছেন তা নয়। ৫৩ বছর বয়সে সদ্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবিও ১৬ মাইল পথ হেঁটে রামগড় থেকে কাঠগুদাম এসেছিলেন। ('রবীন্দ্রজীবনী', ২য়। পৃ ৩৫৫)। রবীন্দ্রনাথের মানস সরোবর যাওয়ারও ভীষণ ইচ্ছা ছিল। ('নির্বাণ', প্রতিমা দেবী। পৃ ২)। কিন্তু যাওয়া হয় নি।

হিমালয়ের পথে পথে নিজে না ঘুরতে পারলেও নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে একবার কেদারনাথ পাঠিয়েছিলেন। আজ কেদারনাথ যাওয়া অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। কিন্তু তখনকার দিনে সেই বিপদসঙ্কুল পথে রথীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ভীষণভাবে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। কিন্তু "একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে, অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা…শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ" বলে তিনি জানতেন তার থেকে রথীন্দ্রনাথকে "স্নেহের ভীরুতা বশতঃ বঞ্চিত" করেন নি। ('আশ্রমের রূপ ও বিকাশ')। পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথ পদব্রজে বদ্রীনাথও গিয়েছিলেন। এই রথীন্দ্রনাথ যখন ছোট ছিলেন তখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "শিলাইদহের বিশ্বপ্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে" ছেড়ে দিতেন এবং রথীন্দ্রনাথ যেভাবে শিলাইদহের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন তা "তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত।" (ঐ) রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার সাথে তাল রেখে সেই যুগে কেন এ যুগেও অনেকে চলতে পারতেন না। পদে পদে ভয় এবং বিপদের আশঙ্কা তাদের চিন্তাকে
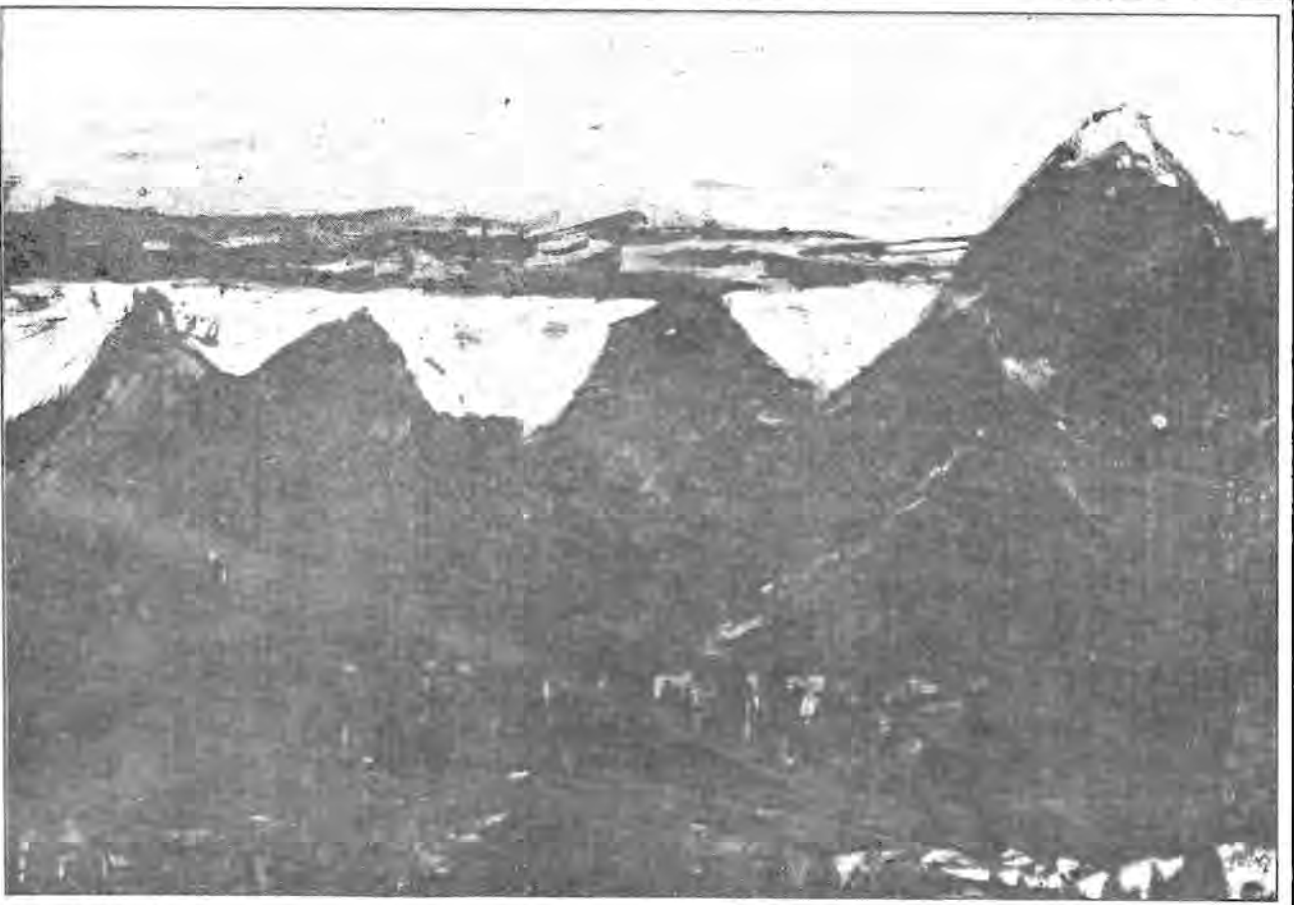
রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবি

আচ্ছন্ন করবে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন সে না হয় হল, কিন্তু আজ 'মাউন্টেনিয়ারিং' বলতে আমরা যা বুঝি তিনি তার কতটুকু জানতেন ? এর উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, সেই যুগে বই আর খবরাখবর পড়ে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা সম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তা জানতেন। তা না হলে তিনি লিখতে পারতেন না, "তুষরাবৃত আল্পস গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়।...বন্দিশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়।" ('পরিচয়' র-র-, ১৩শ। পৃ ১৫৩)। পর্বতারোহণ সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা না করলেও এ বিষয়ে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল ছোটবেলা থেকেই চার দেওয়ালের বন্ধন তিনি মানেন নি—কি স্কুলে, কি শিলাইদহে, কি শান্তিনিকেতনে। তাঁরই একথা বলা সাজে যে—

...তোমাদের বাসাখানা সর্ব্বথা
ঘটাইছে আকাশের খর্ব্বতা
দৃপ্ত সে প্রস্তর প্রাচীরিক।
মোর মন অন্তরে অন্তরে
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সন্তরে ;
আশ্রয় খোলা তার চারিদিক...

জ্ঞান হবার পর থেকে নিজেকে তিনি প্রায় সময়েই রোমাঞ্চকর অভিযানের নায়ক হিশেবে কল্পনা করতেন। আর তাই লিভিংস্টোন তাঁর সব থেকে প্রিয় চরিত্র—এমনকী বৃদ্ধ বয়সেও। তাঁর বিভিন্ন লেখায় যেমন 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, কলকাতা করপোরেশন গেজেটে প্রকাশিত লেখার মধ্যেও বার বার লিভিংস্টোনের আবির্ভাব ঘটেছে। অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার তাঁর যে বিপুল আগ্রহ ছিল তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এত দেশ তিনি সারা জীবন বহুপী ভ্রমণ করেছেন তবু আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। তবু তিনি লেখেন "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"। আর সেই কারণেই "যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী, কুড়াইয়া আনি"। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের হেফাজতে কম করে ২৪০টি এই পৃথিবী এবং তার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান ও ভ্রমণ সংক্রান্ত বই ছিল। এছাড়া ২০টির মতো অ্যাটলাস এবং বেশ কিছু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ম্যাপও।

অথচ আশ্চর্য এই যে ইদানীং যাঁরা হিমালয়ে পা বাড়াচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই ম্যাপের সম্বন্ধে অজ্ঞ—জানার চেষ্টাও করেন না। যদিও ম্যাপের প্রয়োজনটা রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁদেরই বেশি। স্কুলের ছেলেমেয়েদের ক্যাম্পিং কোর্সে যদি বা কিছু ম্যাপের ক্লাশ হয়, কয়েকটি ক্লাব ছাড়া অন্যদের রক ক্লাইম্বিং কোর্সে, এমনকী মানালি-দার্জিলিং—উত্তরকাশীর ওজনদার কোর্সগুলোতেও ম্যাপের পাঠ খুব একটা নেই বললেই চলে। ফলে অভিযাত্রীদের বক্তব্যে অসংলগ্ন উচ্ছ্বাস, বিবরণে ঘাটতি এবং মানচিত্রধর্মী স্বচ্ছ রূপরেখার অনুপস্থিতি আমাদের পীড়ত করে। বিপদের এবং লজ্জার বিষয় হল এঁরা অভিযানে গিয়ে পথ হারান, ভুল শৃঙ্গে উঠে আসলের দাবি করে বসেন এবং অভিযানের যে বিবরণ দাখিল করেন তাতে বিস্তর অসংগতি থাকে। ফলে অভিজ্ঞদের প্রশ্নে গলদঘর্ম অভিযাত্রী অনেক সময় "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" অবস্থার সম্মুখীন হন। অধিকাংশ অভিযাত্রীই অন্ধের মতো হিমালয়ের বুড়ি ছুঁয়ে বাড়ি ফেরেন একরাশ অহংকার নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ এ চান নি। তিনি লিখেছেন "আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল।...যা কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না করে স্পর্শ করেই চলে যায়।" ('জাভাযাত্রীর পত্র') রবীন্দ্রনাথ বর্তমান পর্বতারোহীদের উদ্দেশ্যে এ কথা লেখেন নি ঠিকই, কিন্তু এ উক্তি সেক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যেন তেন প্রকারেণ "সিদ্ধির লোভ" আজকের তরুণ পর্বতারোহীদের অহেতুক শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, এমনকী মৃত্যুর আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে।

রবীন্দ্রনাথের একথাও মনে হয়েছিল, "ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, সকল বিষয়ই তার এত বৈচিত্র বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হন্টারের গেজেটিয়ার পড়ে হতে পারে না...পুঁথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রাকৃতিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তা হলে কোনো অভাব থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো এক সময় শিক্ষা পরিব্রজন চালাতে পারব।" ('রাশিয়ার চিঠি') রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নি, তাঁর মনের এই "অনেক কথা"-ও আমরা আর জানতে পারি নি। কিন্তু যেটুকু জানতে পেরেছি সেটুকুই কি আমরা এতদিন পরেও যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছি পুঁথির বিদ্যালয়ে আমাদের কিছু করতে গেলে অনেক

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবি

বাধা। বর্তমানে ইংরেজি না বাংলা, দশ না বারো, এই করতে করতেই সবুজ প্রাণগুলোকে আমরা প্রায় আধমরা করে এনেছি। এখনও যদি তাদের বাঁচাতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের কথা মতো "প্রকৃতির বিদ্যালয়ে" তাদের নিয়ে যেতে হবে। ছোটবেলা থেকেই যদি প্রকৃতির সঙ্গে এই সব কচি প্রাণের সংযোগ ঘটে তবে ভবিষ্যতে তারাও যেমন বাঁচবে তেমনি তাদের ভালোবাসার জোরে প্রকৃতিও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে।

রবীন্দ্রনাথ "ভ্রমণী" নামে তাঁর এক অপ্রচলিত কবিতায় তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন

মাটির ছেলের হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে
পোষ্যপুত্র করে।
ইঁট পাথরের আলিঙ্গনে রাখল আড়ালটিকে
আমার চতুর্দিকে।
মন রইত ব্যাকুল হয়ে দিবস রজনীতে
মাটির স্পর্শ নিতে।

তিনি লিখেছেন বই পড়েই সেই স্পর্শ তাঁকে পেতে হয়েছে। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস লড়াই করে যারা দেশ জয় করেন "ভূপতি নয় তারা"। বরং

পলে পলে পার যারা হয় পাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি—
...অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা—
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।

রবীন্দ্রনাথ সবশেষে এঁদেরই "ভূমির বরপুত্র" এবং "পৃথ্বীজয়ী" হিশেবে বরণ করেছেন ('ভ্রমণী' 'ছড়ার ছবি')।

পরিতাপের বিষয় এতদিন পরেও নিজেদের সেই সম্মানের যোগ্য করে তুলতে পেরেছি বা কবির অভিষ্ট পূরণে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছি এ কথা বলার সময় এখনও এল না। □

লেখক ভূগোলে স্নাতকোত্তর উপাধি পাওয়ার পর এখন 'ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যাণ্ড থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন'-এ কর্মরত। ১৯৭৬ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভৌগোলিক সমীক্ষা, ট্রেকিং ও শৃঙ্গ -অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন—যথা, সুন্দরডুঙ্গা ও পিণ্ডার উপত্যকায় ট্রেকিং, মণিরঙ্গ ও সুপিন উপত্যকায় অভিযান ইত্যাদি। 'ভোরুকা মাউন্টেনিয়ারিং ট্রাস্ট' ও 'হিমালয়াস বেকন' ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। 'ক্লাইম্বার্স সার্কল'-এর সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল, এখন সহ-সভাপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি· এইচ ডি-এর জন্য 'রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে ভৌগোলিক প্রবণতা' বিষয়ে গবেষণা শেষ করেছেন সম্প্রতি।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি চিঠি

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রায় একটা রহস্যময় ব্যাপার। কত চিঠি লিখেছিলেন তিনি ? শেষ নেই তার ? বাংলাভাষায় লেখা চিঠি দ্বাদশ খণ্ড বেরবার পরও আমরা জানি, কত অজস্র চিঠি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বই হয়ে বেরয় নি এখনো। তার বাইরে তো আরো কত ! কবে সব হাতের কাছে পাব আমরা জানি না। ইংরেজি ভাষায় লেখা চিঠির অবস্থা আরো খারাপ। রোম্যাঁ রলাঁ ও চার্লস এন্ড্রুজকে লেখা চিঠি ছাড়া প্রায় কিছুই বেরয় নি। অথচ এই চিঠিগুলোর গুরুত্ব তো সীমাহীন—বিদেশী লেখক, মনীষী, বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা ঐসব চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরো নানা তথ্যই শুধু জানা যায় না, আন্তর্জাতিক ঘটনার পটভূমিতে তাঁর মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জগৎটাও অনেক স্পষ্ট হয়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় সেসব চিঠি স্তূপীকৃত হয়ে আছে—ভাগ্যবান গবেষকদের বাইরে সাধারণ পাঠকের কাছে তা কবে পৌঁছবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। অথচ ৪৪ বছর আগে, ফরাসি লেখক আরনসন যিনি 'রবীন্দ্রনাথ থ্রু ওয়েস্টার্ন আইস' এবং 'ইওরোপ লুক্স অ্যাট ইন্ডিয়া' লিখে আমাদের কাছে পরিচিত, তিনি ইংরেজি চিঠি থেকে সংকলন করে যে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছিলেন—অমিয় চক্রবর্তীর লেখা ভূমিকা সহ—তা ছাপার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে ছাপা হল না জানা নেই। বইটি বের হলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যেত নিশ্চয়ই, কারণ সেটাই ছিল আরনসনের সংকলনের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার ক্যাটালগে ইংরেজি চিঠি যাঁদের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল তার যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তা আমাদের হতবাক করে দেয়, এবং এগুলো এখনো ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকসমাজের চোখের আড়ালে, তা ভাবলে শুধুই বিক্ষুব্ধ হতে হয়। এরকম কয়েকটি নামই মাত্র উল্লেখ করা যায় জে· ডি· অ্যাণ্ডারসন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অ্যানি বেসান্ত, জোহান বোজের, রবার্ট ব্রিজেস, স্টপফোর্ড ব্রুক, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দকুমারস্বামী, জি· লোয়েস ডিকিন্সন, উইল ডুরান্ট, আর্থার এডিংটন, এলবার্ট আইনস্টাইন, রেভারেন্ড ফিশার, জন গল্‌সওয়ার্দি, আঁদ্রে জিদ, আলডুস হাক্সলি, হিমেনেথ, মার্টিন লুথার কিং, স্টেলা ক্রামরিশ, টমাস স্টুর্জ মুর, গিলবর্ট মারে, সরোজিনী নাইডু, পল ন্যাশ, নোগুচি, ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো, এজরা পাউন্ড, বার্ট্রান্ড রাসেল, এলবার্ট সোয়াইৎসার, বার্নার্ড শ, আপটন সিনক্লেয়ার, সান-ইয়াৎ-সেন, এডওয়ার্ড টমসন, কাউন্ট ও কাউন্টেস তলস্তয়, এইচ· জি· ওয়েলস, ডবলিউ· বি· ইয়েটস। কয়েকজনের নাম মাত্র করা হল। এর বাইরে, বলা বাহুল্য, পত্রপ্রাপকের সংখ্যা আরো অনেক। দু-চারটি চিঠি ইতস্তত বেরিয়েছেও নিশ্চয়ই। বেরবার অপেক্ষায়ও হয়ত আছে কিছু। যেমন, শুনেছি, কেতকীকুমারী ডাইসন রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর পত্রবিনিময়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু যে সংখ্যাতীত চিঠি এখনো গোপন হয়ে আছে, তার তুলনায় এই উদ্যোগ অতি সামান্য।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা চিঠি প্রকাশের ব্যাপারেই যে ধীরগতি, তাতে ইংরেজি চিঠিগুলো কবে বেরনো শুরু হবে এবং কবে সব কটি বেরবে তা কল্পনা করাও যায় না। বিশ্বভারতীর এ ব্যাপারে কি কোনো দায়দায়িত্বই নেই ? □

সনৎকুমার বাগচী

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার কয়েকজন গভর্নর

১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই, পশ্চিমের এই স্বীকৃতিলাভের পর থেকে এদেশে সরকারি ও বেসরকারি সব শ্রেণীর মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের সমাদর বৃদ্ধি পায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আশ্রম-বিদ্যালয় অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে বাংলার গভর্নরদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কও বেশ লক্ষণীয়।

কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ার পর নতুনভাবে গঠিত বাংলা প্রদেশের জন্য পুরোপুরি গভর্নর পদের সৃষ্টি হয় এবং ১৯১২-তে লর্ড কারমাইকেল প্রথম এই পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার এবং রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়-সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের একজন অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হিশাবে কারমাইকেলের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ স্টকহোমে সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন নি। ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে এক বিশেষ সভায় রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারের পদক ও মানপত্র প্রদান করেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর কারমাইকেল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কারমাইকেল বলেন : "আপনি জানেন গত ১০ ডিসেম্বর (১৯১৩) স্টকহলম নগরীতে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের প্রতিনিধি আপনার হইয়া সুইডেনের মহামান্য রাজা বাহাদুরের নিকট নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন ও আপনার কথামতো আপনার বিনীত নমস্কার নিবেদন করেন। সেদিন সান্ধ্যভোজে বৃটিশ প্রতিনিধির নিকট আপনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' ২ খণ্ডে উদ্ধৃত। দ্র. চতুর্থ সংস্করণ চৈত্র ১৩৮৩, পৃ. ৪৫৩)।

সম্ভবত এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে লাটপত্নী মেরি কারমাইকেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। এর কদিন পর ৫ ফেব্রুয়ারিতে (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথকে লেখা মেরি কারমাইকেলের চিঠি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দু খানি কবিতার বই উপহার পাঠিয়েছিলেন। উপহৃত গ্রন্থে লাটপত্নীর নাম লিখে দেওয়ার জন্যও রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ ছিল এই চিঠিতে।

এই চিঠি লেখার প্রায় এক বছর পরে ১৯১৫ সালের ২০ মার্চ লর্ড কারমাইকেল তাঁর পত্নী সহ শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শন করেন। এ ধরনের বিশিষ্ট কোনো রাজপুরুষ ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন নি। কিন্তু কারমাইকেলের পর গভর্নর হয়ে এসে রোনাল্ডশে (১৯১৭), লিটন (১৯২২), জ্যাকসন (১৯২৭), অ্যাণ্ডারসন (১৯৩২) এবং ব্রাবোর্ন (১৯৩৭)—সবাই রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে অতিথি হয়েছিলেন।

কারমাইকেল ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে সাদর অভ্যর্থনা পান। আম্রকুঞ্জে তাঁদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের জন্য যে বেদি নির্মিত হয় তা আজও 'কারমাইকেল বেদি' নামে পরিচিত।

আমরা জানি ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সেইসময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দেশে ফেরার পর পুলিশের সন্দেহ ও উপদ্রবে দেবব্রত বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে যান। লর্ড কারমাইকেলের ৫ মে (১৯১৫) তারিখের চিঠি পড়লে বোঝা যায় দেবব্রতকে পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ লাটসাহেবকে লিখেছিলেন। দার্জিলিং থেকে কারমাইকেল এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : "আশা করি এতক্ষণে আপনার বন্ধু দেবব্রত মুখার্জি বোলপুরে পৌঁছেছেন। তাকে ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।" এই ব্যবস্থা করার জন্য কারমাইকেলকে প্রশাসনিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি এই চিঠিতে আশা করেন, দেবব্রত মুখার্জি যেন কিছু দিনের জন্য প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ না করেন। সেটা তাঁর দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। কারণ বিদ্বেষ এবং অজ্ঞতা অনেক সময়েই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে : বিশেষ করে যখন সত্যানুসন্ধানের কোনো প্রয়াসই নেই

শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতি রোমন্থন করে চিঠির শেষে কারমাইকেল লিখেছেন

"Both my wife and I will always look back to that morning as one of the happiest we have spent in India.

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই সংবাদ যখন এদেশে পৌঁছয় তখন লর্ড কারমাইকেল রংপুর (বর্তমানে বাংলাদেশে) ভ্রমণ করছিলেন। সেখান থেকে তিনি ১৫ নভেম্বর (১৯১৩) জোড়াসাঁকোতে টেলিগ্রাম করে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানান। গভর্নরের বার্তাটি ১৫ নভেম্বরই কলকাতার কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছয়। আবার নাইট উপাধি পাওয়ার সংবাদ পেয়েই ৩ জুন (১৯১৫) কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করেন "Hearty congratulations on honour conferred on you"। গভর্নর তখন ছিলেন দার্জিলিং-এ। সেখান থেকে তাঁর বার্তাটি বোলপুরে

পৌঁছয় সেদিনই অর্থাৎ ৩ জুন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপান হয়ে আমেরিকা ভ্রমণে বেরোন তখন লর্ড কারমাইকেল সাংহাই-এর ব্রিটিশ কনসাল-জেনারেল স্যার ই. ফ্রেজারকে চিঠি দিয়ে কবির যাত্রাপথে সৌজন্যমূলক সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেন। ১৭ এপ্রিল ১৯১৬-তে লেখা এই চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বন্ধু বলে পরিচয় দেন। সম্ভবত চিঠিটি ব্যবহার করার কোনো সুযোগ হয় নি। কারণ ফ্রেজারকে লেখা মূল চিঠিখানি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে।

কারমাইকেলের পরে আর্ল অফ রোনালডশে ১৯১৭ সালে এবং তারপরে দ্বিতীয় লর্ড লিটন ১৯২২ সালে বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। তাঁরা দুজনেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রোনালডশে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ তারিখে। আর লিটন দুবার এখানে আসেন—১৬ জানুয়ারি ১৯২৩-এ ও ২৪ নভেম্বর ১৯২৫-এ। রোনালডশে তাঁর 'হার্ট অফ আর্যাবর্ত' (১৯২৫) গ্রন্থে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের স্মৃতিকথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় দুই বিশিষ্ট অতিথির জন্যই অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে। রোনলডশে ও লিটন চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছিলেন অথবা রোনালডশের 'হার্ট অফ আর্যাবর্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন এবং শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী সম্পর্কে যে সুচিন্তিত মন্তব্য আছে তা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা সম্ভব।

দ্বিতীয় লিটনের পরে ১৯২৭ সালে গভর্নর হয়ে আসেন স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন। তিনি শ্রীনিকেতনে বাংলাদেশের সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। বিশ্বভারতীর কোনো অনুষ্ঠানে গভর্নরের উপস্থিতি এই প্রথম।

স্মরণ করা যেতে পারে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ এই জ্যাকসনকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবী বীণা দাস (পরে ভৌমিক)। কিছুদিন পরে বীণা দাসকে আন্দামানে নির্বাসিত করার প্রস্তাব হয়েছে জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। বীণা দাসকে যাতে আন্দামানে না পাঠানো হয় সেজন্য মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি লেডি জ্যাকসনকে ১৩ অক্টোবর (১৯৩২) টেলিগ্রাম পাঠান

"May I request your Excellency to immediately intervene and save Miss Bina Das from being transported to the demoralising and brutal atmosphere of the Andamans?

Your generous help will win enduring gratitude and admiration of our countrymen.

বীণা দাসকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

এই ঘটনার কয়েক মাস আগে কলকাতা আর্ট স্কুলে তৎকালীন অধ্যক্ষ মুকুল দে-র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী আয়োজিত হয়, ২০-২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। জ্যাকসন ও তাঁর পত্নী এই প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। লেডি জুলিয়েট জ্যাকসন প্রদর্শনী দেখতে গেলেও লাটসাহেব জরুরি কাজের চাপে যেতে পারেন নি। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথকে নিজের হাতে চিঠি লিখে জ্যাকসন সেজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে লেখেন, শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথা তিনি ভোলেন নি এবং এই ভ্রমণ তাঁর ভারতে কাটানো দিনগুলির সবচেয়ে সুখকর স্মৃতিসমূহের মধ্যে অন্যতম

আর্ট স্কুলের প্রদর্শনী চলাকালে রবীন্দ্রনাথ লেডি জুলিয়েট জ্যাকসনকে একটি ছবি উপহার দেন। সেই উপহার পেয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩২) লেডি জ্যাকসন নিজের হাতে সুন্দর একটি চিঠি লিখে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন

কিছু দিনের মধ্যেই বাংলার নতুন গভর্নর হয়ে আসেন স্যার জন অ্যান্ডারসন। 'অ্যান্ডারসনী নীতি' বা 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান নীতি' বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সাদর অভ্যর্থনা না পেলেও গভর্নর অ্যান্ডারসন ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫-এ শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলেন। সিউড়ি থেকে বিশেষ ট্রেনে সকাল সাড়ে এগারটায় তিনি পৌঁছন এবং এক ঘন্টা আশ্রমে কাটিয়ে আবার সিউড়িতেই ফিরে যান। উল্লেখ্য, ওই দিন শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বার্ষিক উৎসব। অ্যান্ডারসনের ভ্রমণ উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ শান্তিনিকেতনে নানা রকমের বিধিনিষেধ আরোপ করে যা রবীন্দ্রনাথ এবং আশ্রমবাসীরা পছন্দ করেন নি। কয়েকজন ছাত্রকে সাময়িকভাবে আটক রাখার প্রস্তাব আসে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-অধ্যাপক সকলকেই শ্রীনিকেতনের উৎসবে পাঠিয়ে দেন। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ছাড়া শান্তিনিকেতনে ছিলেন বিভাগীয় কয়েকজন কর্তাব্যক্তি। ছাত্রশূন্য বিদ্যায়তন অ্যান্ডারসনকে অভ্যর্থনা করে।

প্রসঙ্গত গভর্নর রোনালডশের শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। ৯ জানুয়ারি (১৯২০) গভর্নরের একান্ত সচিব গুরলে প্রথমে চিঠি লিখে প্রস্তাব করেন, "প্রতিদিন যে অবস্থায় চলে ঠিক সেই অবস্থায়ই রোনালডশে বিদ্যালয় দেখতে চান—রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে।" প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'-তে (৪ খণ্ড, ১৩৭১ পৃ ৩) আরও বলেছেন "রোনাল্ডশে ভুবনডাঙার বাঁধের নিকট আশ্রম চোখে পড়া মাত্রই মোটরকার হইতে নামিয়া পদব্রজে শান্তিকেতনে প্রবেশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতীয় আশ্রমে যাইতেছি, দেশের রীতি অনুসারে হাঁটিয়াই যাইব।' তখন আশ্রমের ভিতরে গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সহায়তা লওয়া হয় নাই।"

এই অ্যাণ্ডারসনকেও রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন সাহিত্য-সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে গিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি হিশাবে একটি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে। ১৯৩৭ সালে ২৪ জুলাই থেকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজনৈতিক বন্দীরা বিভিন্ন দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেন। এই সব বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার অথবা মুক্তির দাবিতে ২ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে বিরাট সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ১৪ আগস্ট সারা বাংলায় 'আন্দামান দিবস' পালিত হয়। ওই দিন শান্তিনিকেতনেও ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীরা একটি সভায় মিলিত হন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক দণ্ডনীতির সমালোচনা করে ভাষণ দেন যা পুনর্লিখিত হয়ে 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' শিরোনামে 'প্রবাসী'-র আশ্বিন ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ওই দিনই (১৪ আগস্ট) কবির পক্ষ থেকে অমিয় চক্রবর্তী গভর্নর অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আন্দামান বন্দীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এবং এই আলোচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বন্দীদের কাছে আবেদন করেন তাঁদের অনশন প্রত্যাহারের জন্য। ১৬ আগস্ট (১৯৩৭) এ বিষয়ে সব জানিয়ে অ্যান্ডারসনকে যে চিঠি লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন "I feel very strongly on these matters on humanitarian grounds and we should like Great Britain to take the lead in abolishing the system of maintaining penal settlements for political prisoners, entirely cut off from humanising contacts with society and we trust that in India the reform of prisons will follow the advanced technique now being adopted by all progressive countries.

এই চিঠির উত্তরে ১৮ আগস্ট (১৯৩৭) অ্যান্ডারসন জানান, বন্দীদের অনশন প্রত্যাহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চেষ্টা করেছেন জেনে তিনি বিশেষ আনন্দিত। তিনি ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে গোপন আলোচনায় আন্দামান বন্দীদের বিষয়ে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন তা ব্যক্তিগত। তাঁর মন্ত্রীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো ইচ্ছা তাঁদের নেই। এবং অনশন প্রত্যাহৃত হলে যুক্তিসঙ্গত যে কোনো প্রস্তাব বিবেচিত হতে পারে।

অ্যান্ডারসনের এই চিঠিতেই প্রকাশ পায় বাংলা থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে। কিছু দিনের মধ্যেই নতুন গভর্নর হিশাবে বাংলাদেশে আসেন লর্ড ব্রাবোর্ন। তিনি ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন ১৯৩৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সি. এফ. এন্ড্রুজ লর্ড ও লেডি ব্রাবোর্নকে সব বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান। পরে তাঁরা উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চা-পান করে কলকাতায় ফিরে যান। গভর্নর মহোদয় সব কিছু খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখেন এবং এখানে গ্রামোন্নয়নের কাজকর্ম ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনার জন্য পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দেন। অ্যান্ডারসনের মতো প্রায়-নির্জন শান্তিনিকেতন তাঁদের অভ্যর্থনা করে নি। সস্ত্রীক ব্রাবোর্ন স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক লেনার্ড এলমহার্স্ট পরের বছর (১৯৩৯) জানুয়ারি মাসে গভর্নর ব্রাবোর্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরাগী-সুহৃৎ এলমহার্স্টকে ব্রাবোর্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় অকস্মাৎ লর্ড ব্রাবোর্নের মৃত্যুতে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯) তাঁর দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। হাওড়া থেকে রেলওয়ের ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট মারফৎ বোলপুর স্টেশনে এই শোক-সংবাদ সেদিনই পৌঁছে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে জানাবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্র, কর্মী ও নিজের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানিয়ে লেডি জ্যাকসনকে তারবার্তা পাঠান।

ব্রাবোর্নের পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার আর কোনো গভর্নরের যোগাযোগ বা পরিচয় হয়েছিল কিনা জানা যায় না। □

বিষ্ণু বসু

পুরনো বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের গান

বাংলা সিনেমায় নাকি গান ঢুকে পড়েছে থিয়েটারের হাত ধরে। অন্তত সত্যজিৎ রায় তাই মনে করেন। কথাটা অস্বীকারও করা যায় না, যদিও মন্তব্যটিকে আরো প্রশস্ত করার সুযোগ আছে হয়ত। এমনও বলা যায় বাংলা থিয়েটারে গান এসেছে যাত্রার প্রভাবে এবং যাত্রায় গানের আধিক্য বাঙালির সাধারণ সংগীতপ্রীতির সূত্রে। একথা তো আর অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে গান। বাংলা সিনেমাতেও তাই গোড়ার যুগ থেকেই দর্শক আকর্ষণের জন্যেও গানের প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন পরিচালকরা। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিও তাই স্বাভাবিক কারণেই মনোযোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সেই গোড়ার যুগ থেকেই।

এখনকার কালে রবীন্দ্রসংগীত যেমন জনপ্রিয় (?), পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও তেমন ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ ও অনুরূপ কিছু গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা। অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমান জনপ্রিয়তার জন্য অনেকখানি দায়ী সিনেমায় তার প্রয়োগ।

প্রথম বাংলা সবাক ফিল্ম তৈরি হল ১৯৩১-এ, নাম তার 'জামাইষষ্ঠী'। তারপর ধীরে ধীরে সবাক চিত্র নির্মাণের জন্য এগিয়ে এলেন অনেকেই। সে ইতিহাস আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। এখানে শুধু লক্ষ্যথাকবে গোড়ার যুগে বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগের বিষয়টিতে। গোড়ার যুগ বলতে এখানে ধরা হচ্ছে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রথম সবাক ছবি তৈরির সময় থেকে দেশের স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে বিভক্ত করা হল দু-ভাগে। একভাগে থাকছে : রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে তৈরি ফিল্মে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ। দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হবে : অন্যান্য ফিল্মে কীভাবে প্রযুক্ত হত রবীন্দ্রনাথের গান।

দুই

১৯৪৭-এর মধ্যে মোট সাতটি রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে 'নৌকাডুবি' মুক্তি পায় ৪৭-এর সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে। এ ছবির পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। বোম্বে টকিজের এ ফিল্মের সুরকার অনিল বিশ্বাস হলেও রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্বাবধান করেছিলেন অনাদি দস্তিদার। স্বাধীনতার পরে মুক্তি পেয়েছিল বলেই আলোচনার পরিধিতে 'নৌকাডুবি' আসছে না। তবে এ ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন পাহাড়ী সান্যালও।

রবীন্দ্ররচনা যা প্রথম সেলুলয়েডে ধরা পড়ে সেখানি হল 'নটীর পূজা'। তবে এটি প্রচলিত অর্থে কোনো ফিল্ম ছিল না। সেকালের চিত্রসংবাদে জানা যাচ্ছে : "রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কয়েক রাত্রি ধরিয়া নটীর পূজা অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা ও কবিগুরু স্বয়ং এই অভিনয়ে পাদপ্রদীপের সামনে বাহির হইয়াছিলেন। অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স লিঃ সেই অভিনয়ের সবাক ছবি তুলিয়েছিলেন। শীঘ্রই কলিকাতায় প্রদর্শিত হইবে। আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।" 'নটীর পূজা' শ্যামবাজারের চিত্রা (বর্তমান মিত্রা) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ। এ ফিল্মের কপি এখনো রক্ষিত আছে কিনা জানা নেই। থাকলেও তার দাম অসামান্য। তবে এ ফিল্মে প্রযুক্ত গান নিয়ে আলোচনার অবকাশ সংগত কারণেই নেই।

এরপর মুক্তি পায় 'চিরকুমার সভা' ১৯৩২-এই। এ ফিল্মও তৈরি করেন নিউ থিয়েটার্স। পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং সঙ্গীত পরিচালক

পঙ্কজ মল্লিক

রাইচাঁদ বড়াল। কোন কোন গান এ ছবিতে রেখেছিলেন তাঁরা তা জানা নেই। তবে অক্ষয়, নীরবালা, নৃপবালা সেজেছিলেন যথাক্রমে তিনকড়ি চক্রবর্তী, সুনীতিবালা ও অন্নপূর্ণা। তাঁদের অবশ্য গান গাইতে হয়েছিল নিজেদেরই, কেননা প্লে-ব্যাক পদ্ধতি তখনো চালু হয় নি।

১৯৩৮-এ পর পর মুক্তি পায় দু-খানি রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ : 'চোখের বালি', ও 'গোরা'। 'চোখের বালি'র পরিচালক ছিলেন সতু সেন, সংগীত-শিক্ষক অনাদি দস্তিদার। এ ছবিতে গান ছিল মোট আটখানা সবগুলোই রবীন্দ্রনাথের লেখা। নেপথ্য সংগীত ছিল দু খানি— 'তবু মনে রেখো' এবং 'ও আমার মন যখন জাগলি নারে'। কে গেয়েছিলেন জানা যায় না কেননা তখন নেপথ্য-সংগীত শিল্পীদের নাম প্রকাশের রেওয়াজ ছিল না, এমনকী রেকর্ডেও তাঁদের ছাপা হত না নাম। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' গানখানি দেওয়া হয়েছিল জনৈক বৈরাগীর গলায়। তাঁর নামও জানা যায় না। আশা-র গলায় ছিল দুখানি গান : 'বাজিল কাহার বীণা' এবং 'আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে'। আশার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইন্দিরা রায়। গানগুলো তিনিই গেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। বিনোদিনীর ভূমিকায় ছিলেন সেকালের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। বিনোদিনীর ছিল তিনখানা গান : 'ওলো সই ওলো সই', 'চিনিলে না আমারে কি' এবং 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?'

'গোরা' পরিচালনা করেছিলেন নরেশ মিত্র। সংগীত-পরিচালক ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম ও কালীপদ সেন। এ ছবিতে গান ছিল ছ-খানা, বেশির ভাগই ছিল সুচরিতা ও ললিতার গলায়। ললিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রতিমা দাশগুপ্তা এবং সুচরিতা সেজেছিলেন রানীবালা। সম্ভবত রানীবালা নিজেই গেয়েছিলেন সুচরিতার গানগুলো, কেননা রানীবালা তখন গান গাইতেন সিনেমায়। সে-গানগুলি 'গোরা'য় ছিল তা হল : 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি', 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন', 'সখি প্রতিদিন হায়', 'ওগো সুন্দর মম গৃহ আজি', 'ঊষা এল চুপি চুপি' এবং 'রোদনভরা এ বসন্ত'।

'গোরা'র গান অনুমোদন নিয়ে একটি ছোট ঘটনা বলেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তিনি গিয়েছিলেন ফিল্ম স্টুডিয়োতে বিচারক হিশেবে। তাঁর বিশেষ করে 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানখানি ভালো লাগে নি, তাই অনুমোদন করেন নি তিনি। কিন্তু নরেশ মিত্র, সতু সেন ও নজরুল ইসলামের একান্ত অনুরোধে অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পরে নাকি 'গোরা' দেখতে গিয়ে গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেন নি।

নিউ থিয়েটার্সের 'শোধবোধ' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ চিত্রায়। পরিচালক ছিলেন সৌমেন মুখোপাধ্যায়, কণ্ঠসংগীত পরিচালনায় অনাদি দস্তিদার। এ ছবিতে গান ছিল মোট ছ-টি : পাঁচটি নায়িকা নলিনী তথা নেলীর কণ্ঠে, একটি গেয়েছিল তাঁর সখী চারু। নলিনী ও চারুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীলেখা ও শীলা হালদার। কিন্তু গানগুলো তাঁরা নিজেরাই গেয়েছিলেন অথবা প্লে-ব্যাক করেছিলেন অন্য কেউ তা জানা যায় না। নেলীর গলায় দেওয়া হয়েছিল এ গানগুলি : 'সে আমার গোপন কথা', 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা', 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে', 'উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল' এবং 'মনে রবে কিনা রবে আমারে'। চারু গেয়েছিল 'সে যে মনের মানুষ কেন

তারে রাখিস নয়নদ্বারে' গানখানি । 'শেষরক্ষা' মুক্তি পায় ১৯৪৪-এ । পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় । সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণামোহন ঠাকুর । এ ফিল্মে কোন গানগুলো ছিল সে খবর যোগাড় করা যায় নি ।
একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো । রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপে প্রযুক্ত রবীন্দ্রসংগীতগুলোর মধ্যে একটিও যাকে বলে 'হিট' তা হয় নি । বরং জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথের গানকে নির্ভর করতে হয়েছে মোটামুটিভাবে অ-রাবীন্দ্রিক ফিল্মগুলোর উপর এবারে আসা যাক সে-প্রসঙ্গে

তিন

রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক । একথা অন্তত বিশ্বাস করতেন একালেরই অপর একজন সংগীতগুণী সন্তোষ সেনগুপ্ত । এইসঙ্গে বোধ হয় যুক্ত করা যায় আরো দুজনকে কানন দেবী ও সায়গলকে । দুজন শিল্পীই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের কাছে । কিন্তু সেকথা পরে ।
রবীন্দ্র-ব্যতিরিক্ত যে-কাহিনীর চিত্ররূপে রবীন্দ্রসংগীত প্রথমে প্রযুক্ত হয়েছিল তার নাম 'মুক্তি' নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে ফিল্মখানি পরিচালনা করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক । গানের প্রতি বরাবরই আকর্ষণ ছিল বড়ুয়ার । তাঁর বেশ কিছু ছবি হিট হবার মূলে ছিল গানও 'দেবদাস', 'মুক্তি', 'অধিকার', 'শেষ উত্তর' প্রভৃতি ছবির গান একসময় মানুষের মুখে-মুখে ফিরেছে তখনো অ-রাবীন্দ্রিক ফিল্মে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ করার ব্যাপারটা পরিচালকদের মাথায় আসে নি 'মুক্তি'-র কাহিনী বড়ুয়ার কাছে শুনতে-শুনতে পঙ্কজ মল্লিকের মুখে গুনগুনিয়ে উঠেছিল—না, কোনো রবীন্দ্রসংগীত নয়,—একখানি কবিতা, রবীন্দ্রনাথেরই, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' যাতে সুর দিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক নিজেই । থিম-মিউজিক হিশেবে গানটি খুবই পছন্দ হয়ে যায় বড়ুয়ার এবং তাঁরই আগ্রহে ও অনুরোধে পঙ্কজ মল্লিক স্বয়ং যান রবীন্দ্রনাথের কাছে, এ 'গান'-খানি 'মুক্তি'-তে ব্যবহারের জন্য অনুমতি চাইতে । সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ "পঙ্কজবাবু সেদিন কবির সামনে বসে গান ধরতে গিয়ে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েন এবং ফলে সারেঙ্গির সুরের সঙ্গে কিছুতেই তাঁর কণ্ঠ সেদিন মিলল না তাতে ক্ষতি অবিশ্যি কিছুই হল না কারণ কবি সে সুর শুনে সহজেই সম্মতি দিলেন । ফেরার পথে গাড়িতে ওঠার পর সারেঙ্গিবাদক বল্লেন, পঙ্কজবাবু, এ আপনে কেয়া কিয়া হ্যায় ! পঙ্কজবাবু অপূর্ব হিন্দিতে উত্তর দিলেন, আরে বাপু তুমি কেয়া বুঝেগা, কিসকা গানামে সুর বসানা—আর গাইতে যে পারা, এই যথেষ্ট হ্যায় ।" এ গানের রেকর্ড উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্ল মহলানবীশকে বলেছিলেন, "বুলা, তুই পঙ্কজকে গিয়ে বলিস এ সুর আমার ভালো লেগেছে—কিন্তু লোকে তো biased, বলবে এখন—এ রবীন্দ্রনাথের সুর । যখন নয় তখন ভালো নয়—কিন্তু আমায় সত্যিই ভালো লেগেছে ।" এ গানখানি গাইবার জন্যই শেষপর্যন্ত পঙ্কজ মল্লিকের বিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল 'মুক্তি' সিনেমায় । ভাটিখানার মালিকের মুখে দেওয়া হলেও পরিস্থিতি, প্রয়োগ ও গাইবার গুণে গানটি প্রচণ্ড হিট হয়েছিল সেকালে ।
পঙ্কজ মল্লিক জানিয়েছেন, শুধু এ গানখানিই নয়, আরো গুটিকতক রবীন্দ্রসংগীত যাতে এ ছবিতে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই । বিশেষ করে বলেছিলেন, "আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে—গানটি আমার বড় প্রিয় । ওটা রাখা যায় কিনা ভেবে দেখো ।" ফলে এ গানখানিও দেওয়া হয় নায়িকা চিত্রার মুখে, যে-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কানন দেবী ।
উত্তরকালে কানন দেবী লিখেছিলেন, "পঙ্কজবাবুর গান শেখানোর ভঙ্গিটি ছিল বড় আকর্ষণীয় ।...ওঁর কাছে আমার প্রথম শেখা গান ছিল 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' । শেখাবার আগে কী দরদ দিয়েই

কানন দেবী

না উনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিতেন ।... উনি বলেছিলেন, গাইবার সময় একটা কথা সব সময় মনে রেখো, 'সবার রঙে' গানটি হোলির গান নয় । পুজোর গান । এখানে এ গান দেয়ার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য এইটেই বোঝানো যে প্রশান্ত (কাহিনীর নায়ক, এ ভূমিকায় ছিলেন বড়ুয়া) তোমার স্বামী, তার আনন্দেই তোমার আনন্দ, তার কৃতিত্বেই তোমার গৌরব । সেই রাতের স্বপন ভাঙা, আমার হৃদয় হোক না রাঙা—কেন রাঙা হবে ? না, তোমারই রঙের গৌরবে । এ রঙ তো খেলার রঙ নয়, এ হল প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসার রঙ ।" এ ছাড়াও বলেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, "'মুক্তি' বইতে তোমার মুখে প্রথম সবাই রবীন্দ্রসংগীত শুনবেন । দেখো কবির গানের মর্যাদা যেন এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না হয় ।" কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন কানন দেবী, "রবীন্দ্রসংগীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বোধহয় পঙ্কজবাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধান বাণীর দরুনই । 'মুক্তি'-তে পঙ্কজ মল্লিক গেয়েছিলেন আরেকখানি রবীন্দ্রসংগীত : 'আমি কান পেতে রই' । সবগুলোই সেকালে সুপারহিট । একটি কথা অবশ্য এখানে বলা যেতে পারে যে 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানখানি 'গীতবিতানে' পূজা পর্যায়ে নেই, আছে প্রেম-পর্যায়েই । 'মুক্তি' মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৩৭-এ ।
এরপর যে দুটি ফিল্মের রবীন্দ্রসংগীত সেকালে মাতিয়েছিল তা হল : 'অধিকার' ও 'জীবন মরণ' । দুটিই নিউ থিয়েটার্সের ফিল্ম । প্রথমটির পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে বড়ুয়া ও তিমিরবরণ । দ্বিতীয়টির পরিচালক ছিলেন, নীতিন বসু ও সংগীত-পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক । 'অধিকার'-এ অভিনয় করেছিলেন, বড়ুয়া, যমুনা, মেনকা, পাহাড়ী সান্যাল, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি শিল্পীরা । এ বইতে ছিল তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত : 'আমার এ পথ চাওয়াতেই আনন্দ', 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এবং 'মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে' । শেষ গান দুখানি পঙ্কজ মল্লিকের গায়কির গুণে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল সেকালে । তিনি নিয়েছিলেন বেহারীর ভূমিকা । 'জীবন মরণে' রবীন্দ্রসংগীত ছিল তিনখানি 'তোমার বীণায় গান ছিল', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' এবং 'ফিরবে না তা জানি' । প্রথম গান দুখানি গেয়েছিলেন নায়ক মোহনের ভূমিকায় সায়গল । ফিল্মে এই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন সায়গল । সেকালে গায়ক-নায়কের ভূমিকায় সায়গলের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া । অবশ্য সত্যজিৎ রায় একে অভিহিত করেছেন "জাতীয় বাতিক" বলে এবং মন্তব্য করেছেন "এই বাতিকই কুন্দনলাল সায়গলকে তার আড়ষ্ট বাংলা সত্ত্বেও নায়কের আসনে বসিয়েছিল এবং নিউ থিয়েটার্সের একাধিক ছবির আর্থিক সাফল্যের পথ সহজ করে দিয়েছিল ।"
'জীবন মরণ' ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখা যায় মোহনের বন্ধু বিজয় অর্গানের সামনে বসে গাইছে 'তোমার বীণায় গান ছিল' । বিজয়ের ভূমিকা নিয়েছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি একালের বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা নন । সম্ভবত তিনি ছিলেন চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের ভাই । সেকালে বহু ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইনি । গান মোটামুটি ভালোই গাইতেন । যাই হোক, ছবিতে আছে গানখানি প্রায় শেষ হবার মুখে মোহনরূপী সায়গল এসে বাকি অংশটুকু গেয়ে দেন । শোনা যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এভাবে আধখানা গান অন্তত সায়গলের সঙ্গে গাইতে চান নি । কেননা তাঁর ধারণা দর্শক নাকি ভানুর গানে বিরক্তি প্রকাশ করবেন । এতেই বোঝা যায় সেকালে সায়গলের গানের কী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা ছিল । শেষপর্যন্ত ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেও রেকর্ড করবার সময় গানখানি সায়গল একাই গেয়েছিলেন । নাটকীয় প্রয়োগ ও গাইবার গুণে দুখানি গানই, শুধু সেকালে কেন, এখনো জনপ্রিয় ।
এ গান সম্পর্কে একটি আকর্ষক খবর দিয়েছেন এ ছবির সংগীত-পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক । তাঁর বক্তব্যই উদ্ধৃত করা যাক : "ছবিটির প্রস্তুতির শেষে গানটি রেকর্ড করে নিয়ে কবিগুরুর কাছে আমি গিয়েছিলাম তাঁকে শুনিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে । গানটি যখন কবিকে বাজিয়ে শোনাচ্ছি, তখন দ্বিতীয় অন্তরার প্রথম কলিটি, বেশ কয়েকবার শুনে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'ফুল ফুরালো দিনের শেষে' এ কেমন করে সম্ভব ?' কবির কথায় হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর গানের বই খুলে দেখালাম যে ছাপার অক্ষরে 'ফুল ফুরালো'ই আছে । কবি তখন যেন একটু দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে উদাস বিষণ্ণ স্বরে বললেন—কি করে এটা হল জানি না, কিন্তু ওটা তো 'সুর ফুরালো দিনের শেষে' হওয়াই উচিত ছিল ।... গানটি কবি অবশ্য সানন্দে অনুমোদন করলেন । তবু ওই শব্দটি নিয়ে তাঁর বিষণ্ণতা যেন রয়েই গেল ।" গীতবিতানে কিন্তু 'ফুল ফুরালো দিনের শেষে'ই রয়েছে এখনো ।

শোনা যায়, গোড়ায় নাকি সায়গলের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বভারতী থেকে অনুমোদিত হয় নি। তখন সায়গল একদিন নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যান শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অনুমতির জন্য। গান শুনে রবীন্দ্রনাথ বেশ খুশি হয়েই নাকি অনুমতি দিয়েছিলেন গাইতে এবং জানিয়েছিলেন একটি ভিন্‌-প্রদেশী যুবক হয়েও সায়গলের আন্তরিক গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে। বরং একটু আড়ষ্ট ও অবাঙালি টান গানকে স্বতন্ত্র চেহারা দিয়েছে এমন কথাও নাকি বলেছিলেন কবি।
৪০ সালে মুক্তি পেল দুখানি ছবি 'ডাক্তার' ও 'পরাজয়'—যার গুটিকয়েক রবীন্দ্রসংগীত সেকালে খুব হিট হয়েছিল। 'ডাক্তার' ছবিতে বিড়ম্বিত নায়ক গেয়েছিল 'কী পাই নি তার হিশাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি'। নায়ক অমরনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর গাওয়া এ গানখানি রসিক চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। 'পরাজয়' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল চারখানা। তাদের মধ্যে 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি' এবং 'তোমার বাস কোথা-যে পথিক' গান দুখানি ছিল কোরাসে। বাকি দুখানা 'বারে বারে পেয়েছি যে তারে' এবং 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' গেয়েছিলেন নায়িকা অনীতার ভূমিকায় কানন দেবী। "পরাজয়ের গানগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষ করে 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' গানটি"—একথা জানিয়েছেন কানন দেবী নিজেই।

'পরিচয়' ছবি মুক্তি পেল ১৯৪১-এ। গায়ক-কবি নায়ক অনন্ত রায়ের ভূমিকায় ছিলেন সায়গল, নায়িকা সতীর ভূমিকায় কানন দেবী। এ ছবির পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু, সংগীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। এ ছবিতে সায়গল গেয়েছিলেন চারখানা রবীন্দ্রসংগীত—'একটুকু ছোঁয়া লাগে', 'আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে', 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' এবং 'আজ খেলা ভাঙার খেলা'। কানন দেবী গেয়েছিলেন 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' এবং 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে' গান দুখানি। কানন দেবী স্মৃতিচারণ করেছেন উত্তরকালে এভাবে, "এ ছবিতেও আমার বিপরীতে ছিলেন সায়গল। আর আমাদের দুজনের গান 'পরিচয়'-এর এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে'-এই সব রবীন্দ্রসংগীত 'পরিচয়' ছবির পরই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।" আর এ দুটি রবীন্দ্রসংগীতই নাকি প্রথম রেকর্ড করেন কানন দেবী।
এর পর আরো কিছু ছবিতেও ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কিন্তু তেমন খ্যাতি পায় নি সেগুলি। ৪৩ সালে মুক্তি পাওয়া ছবি 'সহধর্মিনী' ও 'দম্পতি'তে ছিল দুখানি রবীন্দ্রসংগীত। প্রথমটিতে 'যদি তারে নাই চিনি গো' এবং দ্বিতীয়টিতে 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও' গান দুটি সিনেমায় থাকলেও তেমন হিট করে নি, যদিও 'দম্পতি'-র বেশ কিছু গান সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরত। বরং ঐ বছরেই মুক্তি পাওয়া 'প্রিয় বান্ধবী' ছবির দুখানি রবীন্দ্রসংগীত সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি ছিল রেডিওতে প্রচারিত গান, গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গানখানি হল 'পথের শেষ কোথায়'। সম্ভবত এ গানটি দিয়েই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সিনেমার জীবন শুরু হয়েছিল। আরেকখানি গান গেয়েছিল লখিয়া—'তোমার আমার এ বিরহের অন্তরালে'। এ গানটি কে প্লে-ব্যাক করেছিলেন তার উল্লেখ রেকর্ডে নেই, কেননা

কে· এল· সায়গল

সেকালে প্লে-ব্যাক শিল্পীদের নাম থাকত না রেকর্ডে। নিউ থিয়েটার্সের লেবেল-মারা রেকর্ডে 'পথের শেষ কোথায়' গানের শিল্পী হিশেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও অপর পিঠে 'তোমার আমার' গানে কোনো নাম ছিল না। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনলে মনে হয় গানখানি গেয়েছিলেন রাজেশ্বরী বাসুদেব। সম্ভবত তখনো 'দত্ত' হন নি তিনি, যদিও কবি সুধীন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল সে-বছরেই। যদি এ অনুমান সত্য হয় তাহলে রাজেশ্বরীর প্লে-ব্যাকে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত বোধহয় এই একখানিই। এরপর যে ছবির রবীন্দ্রসংগীত সে-আমলে আসর মাত করেছিল, সেখানি মুক্তি পেয়েছিল ৪৪ সালে। ছবির নাম 'উদয়ের পথে'। পরিচালক বিমল রায় এবং সংগীত-পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এ ছবির প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের অভিনবত্ব ছাড়াও অভিনয়, বিশেষ করে গান খুবই সাহায্য করেছিল। নায়িকা গোপার ভূমিকায় ছিলেন বিনতা বসু। গায়িকা হিশেবেও তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। তাঁর গাওয়া তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত ছিল ছবিতে। অর্গান বাজিয়ে নিজের ঘরে বসে গাওয়া 'মালতী লতা দোলে' এবং স্টুডিয়োর কৃত্রিম সেটে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' ব্যাকুল করে তুলেছিল সেকালের দর্শকদের। তাছাড়াও তিনি প্লে-ব্যাক করেছিলেন বিনির একখানি গান—'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা'। নাচের সঙ্গে গানখানি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।
১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হেমেন গুপ্ত পরিচালিত 'অভিযাত্রী' ছবিতে 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গানটি নিয়ে অন্যতম অভিনেতা বিকাশ রায় কী বিপদে পড়েছিলেন তার রসালো বর্ণনা দিয়েছেন তিনি নিজেই। এ গানটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বিনতা রায়। জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে বিনতা তখন রায় হয়েছেন। ছবিতে বিকাশ রায় সেজেছিলেন তাঁর ভাই। ভাইবোনের দ্বৈত কণ্ঠে ছিল গানটি। এ ছবিতে আর কোনো রবীন্দ্রসংগীত ছিল কিনা তা আর বলা যাচ্ছে না।
সেকালে আরো কিছু ছবিতে থাকতেও পারে রবীন্দ্রসংগীত, কিন্তু সেগুলো যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ নেই বিশেষ। স্বাধীনতার পরে শুরু হল বাংলা সিনেমার নতুন পর্যায়। আমাদের আলোচনার পরিধিতে অবশ্য আসছে না সেকথা। □

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চয়িতা-স্মৃতি

আমার বড়দা শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ১৯৪৮ সালে। আমাদের আহিরিটোলার ২২ জয়মিত্র স্ট্রিটে পিতামহের বাড়িটি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক (পাবলিক ইউরিন্যাল অ্যান্ড বেদিং প্লেস সৃষ্টির কারণে) ধ্বংস হবার পর, ততদিনে বেশ ক-বছর হল আমরা হাওড়ায় পৈতৃক বাড়িতে চলে এসেছি।

পরের বছর ম্যাট্রিক দেব। ১৯৪৮ সালে দাদার বিবাহসূত্রে আমাদের বাড়িতে আসেন বড়বৌদি গীতারানী এবং তাঁর সঙ্গে আসে একটি মোটাসোটা বই। কোনো বই যে অত মোটা হতে পারে, আগে তা কল্পনাও করতে পারি নি (পরেও না)। স্বীকার করি,

কম বয়সে সব বড় জিনিশই প্রকাণ্ড দেখায়। খুব শিশুবেলায় ম্যান-অফ-ওয়ার জেটির কাছে দাঁড়িয়ে দাদার হাত ধরে প্রথম যে জাহাজটি দেখি, সেটাকে মনে হয়েছিল কলকাতার মতোই আর একটা ভাসমান শহর—চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দূরে হাওড়া ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। ব্রিজ পেরবার সময় সে যে কতক্ষণ ধরে বেজেছিল তার গম্ভীর ভোঁ। তার সেই ধীর ও নিশ্চিত গতি... জাহাজের ডেকে দেবদেবীর মতো সারবন্দি সাহেব-মেম...গ্রীষ্ম-বাতাসে তাঁদের চুল উড়ছে সোনালি...তা, সত্যিই কি আর অতটা সময় লেগেছিল ব্রিজটুকু পেরতে। হয়ত তত মোটা ছিল না বইটি,যতটা তখন দেখিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, বইটির নাম 'সঞ্চয়িতা'। এবং লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমবেশি এক হাজার পাতা, বাব্বা! এটাই নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম (গতর-জব্দ) কাব্যগ্রন্থ।

গরদবস্ত্র দিয়ে সাঁটা মলাটের ওপর কবির নিজের হাতে লেখা 'সঞ্চয়িতা', তার ব্লক, একটু নীচে স্বাক্ষর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-রকম অচেনা ক্যালিগ্রাফি প্রথম দর্শনে খুবই বিজাতীয় ঠেকেছিল এবং অনুসরণযোগ্য বলে মনে হয় নি। পঞ্চানন কর্মকার কৃত যৌথরফ-মালার অনুসরণে আমাদের হাতে-খড়ি, মাসের পর মাস ধরে শ্লেটে বুলিয়ে যা রপ্ত করেছি—এ তো সে জিনিশ, সেই 'মুক্তাক্ষর' নয়! ১৯১০ সালের ইংরেজির এম-এ ও ১২ সালের বি-এল, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট আমার শ্বশুর-মশায় শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু (মৃত্যু ১৯৮১) তাঁর নবাগতা শ্যালিকা তথা আমার পরলোকগতা মাসি-শাশুড়িকে দুমকা থেকে ১৯১৪ সালে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লেখেন 'বাঃ, খুকী! তুমি তো সুন্দর পত্র লিখিতে শিখিয়াছ! দেখিবে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লিখিবে। রবীন্দ্রনাথের মতো লিখিবে না।' আধুনিক পোস্টকার্ডের প্রায় অর্ধেক আকারের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবি-মারা সেই পোস্টকার্ড আমার কাছে আছে। প্রয়োজনে দাখিল করতে পারি।

তো, সেই আমাদের প্রথম রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, হিশেব মতো, বইটির বয়স তখন ১৬ বছর। তার আগে আমরা 'কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি'র সংস্পর্শেও আসি নি, কারণ, আমাদের হাতে-খড়ি, বলাবাহুল্য, একসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ও প্যারিচরণ দিয়ে...ক্রমে 'হাসিখুশি', 'Bani Reader'—এইসব।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে বড়বৌদির আগে আসেন নি, এটা হয়ত তথ্যত ভুলই কেন না, আমাদের বাড়িতে ছোটবেলার ঝি-এর নাম ছিল সুবর্ণ। তার বোনঝির নাম রাধা। কাকতালীয় হলেও এটা ঘটনা যে, আমাদের আহিরিটোলার বাড়ির দোতলার লাল মেঝের ওপর একদিন রাধা নেচেছিল। এবং সে নেচেছিল সেই গানটি গাইতে গাইতে যার মাঝখানের দুটি পঙক্তি ছিল

> শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে
> শেষ করে দাও আপনাকে যে...

তবে, এটা যে রবীন্দ্রসংগীত তা আমি কেন, নর্তকী কেন, আমাদের বাড়ির কেউই তখন জানত না। নাচতে নাচতে নিরক্ষর মেয়েটি নাকি খুব হাঁপাচ্ছিল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, এবং সে টলে পড়ে যায়। তাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল, পারিবারিক বৈঠকে এমনটাই পরে শুনেছি। আমার বিশ্বাস, নাচতে নাচতে গানের এইখানটাতে এসেই সে মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে—অন্তত এই গানটির সুরে ও বাণীতে ঠিক এইখানটাতে এমনই গুঁতো। আমি তো, ফ্রাঙ্কলি, এই পঙক্তি দুটির রহস্য আজও উদ্ঘাটন করতে পারি নি 'শূন্য' সাজাবার মেকআপম্যান যে কে বা কারা বা কোথায় মেলে তার সাজপোশাক আমি তার হদিশ কোনোদিনই পাই নি।

প্রসঙ্গত পার্থসারথি চৌধুরী তখন হাওড়ার জেলা-শাসক। এই তো ক-বছর আগের কথা। উস্তাদ আমির খাঁ সাহেব আমাদের একদিন তৎকালীন জেলা-শাসকের বাঙলোয় পান-পর্ব শুরু হবার আগেই বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ক্লাসিকাল গানের কিছুই জানতেন না।' শুনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তুমুল কোলাহল করেছিলেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, চুপ। কিন্তু খাঁ-সাহেবের ঐ এক কথা। আর নাচের ব্যাপারে এলেবেলে মণিপুরির যৎকিঞ্চিৎ পর্যন্তই যে তাঁর দৌড়, এ তো সকলেই জানেন।

যাক, 'সঞ্চয়িতা'র কথা বলি, যা বলছিলাম। 'সঞ্চয়িতা' প্রসঙ্গে আর যা মনে পড়ে তা হল এই আমার আমেরিকা-প্রবাসী ছোটভাই ডাঃ চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তখন ক্লাশ এইট-এ পড়ে, সেই ১৯৪৮ সালে, যখন বইটি আমাদের বাড়িতে প্রথম আসে। সে তখন 'অমলেন্দু স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'য় যোগ দিয়েছে। বিষয়, 'রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু'। আমি বাংলায় ফার্স্ট হই ও অঙ্কে ১০ পাই। আর, সে ঠিক তার বিপরীত। ভাইটি আমাকে একদিন বলল, 'ন-দা, এটা তুই লিখে দে।' উত্তরে আমি তাকে বলি, 'ঐ মোটা বইখানা উল্টে-পাল্টে দ্যাখ। দেখবি, মৃত্যু সম্পর্কে

প্রথমেই পাবি মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম-সমান। তারপর আর যা-যা মৃত্যু পাবি, তা থেকে কতকগুলো কোটেশান লিখে ফ্যাল। আর হ্যাঁ, মাঝখানে কিছু-কিছু ফাঁক রাখবি, কোথাও চার, কোথাও বা দশ লাইন। শেষ কোট-এর আগে পুরো একটা পাতা ছাড়া রাখবি, বুঝলি?'

সে তাই করে আনে। আমি মাঝখানগুলো দ্রুত-গদ্যে ভরিয়ে দিই এবং প্রতি কোট-এ পৌঁছনো মাত্র, 'তাই কবি বলিয়াছেন' লিখে থামি।

এতেই, আমাদের দ্বিবিধ হস্তাক্ষরে রচিত প্রবন্ধটি সেবারের অমলেন্দু স্মৃতি রৌপ্য পদক জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হায়, কালিফোর্নিয়ার এখন একজন নামকরা ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ তার নিষ্পাপ বাল্যকালে মৃত্যু-রচনার শেষ করেছিল 'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়/এইকথা বলে/যাব আমি চলে'—এমনই একটি মূঢ় দম্ভোক্তি দিয়ে! যদিও জীবনানন্দ রচিত মৃত্যু-স্তোত্রটি ছিল এ-রকম

> 'আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না, তবু,
> দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে
> আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই,
> মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।' □

ছবি সুব্রত চৌধুরী

দেবী খান

অনাবাসী

একাদশ পরিচ্ছেদ/২

আশ্চর্য ! যে মেয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে নিজের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্যকে স্মরণ করেছে, তার সারা কলেজ জীবন ধরে মাঝে মাঝেই সেই মেয়ে ফিরে এসেছে অর শেষ রাত্তিরের স্বপ্নে । কি লজ্জা !

স্বপ্নে সেই বেদেনীর নোংরা পোশাক থাকত না । সে এক ঝলমলে রাজস্থানী ঘাগরা পরে আসত । আলো ঝিকিয়ে উঠত চুমকিতে আর ছোট ছোট কাচের আয়নায় । পাশে বসে সে বেঁকে নিচু হয়ে জড়িয়ে নিত শরদিন্দুকে । তার সেই বুকের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসত । মনে হতো তার ঐ শরীরের চাপে মরে যাবে সে । অথচ এতটুকু প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হত না ।

ঘুম ভেঙে দেখত ঘেমে নেয়ে শরীর জবজব করছে, উরু চটচটে হয়ে গেছে । লজ্জায় ঘৃণায় রেগে উঠত সে । কিন্তু আবার কিছুকাল পরে ঝলমলে ঘাগরা দুলিয়ে সেই মেয়ে ফিরে আসত । শরদিন্দু অসহায়ভাবে দেখত, তার জাগরণের সময়ের বানানো যত ব্যারিকেড সেই মেয়ের নৃত্যশীল পায়ের তলায়, শোলার দেওয়ালের মতো পুট পুট করে ভেঙে পড়ছে । আবার সেউ উদ্ধত বুকের চাপ !

আজ হাসি পেল নতুন যৌবনের সেই ভয়, সেই ঘৃণা, সেই তালগোল পাকানো মনের অবস্থার কথা ভেবে। সেই মেয়ে বড় সোজা ছিল। তার হাতে মাত্র একটা সাপ ছিল। তার চোখে মাত্র দুটো ছুরি ছিল। সে মাত্র নিজের সুখ খুঁজত। অন্য লোক বেশি সুখ ভোগ করছে কি না, তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। যেমন বেলার আছে। জীবনে বা স্বপ্নে, কোথাওই তার মুখ ঈর্ষায় সবুজ হয় নি। বেলার মুখের রঙ সব সময়েই সবুজ হয়ে রয়েছে।

(৩)

সেই মেয়ে বড় দরিদ্র ছিল। তার পোশাক বড় নোংরা। রোমের এই উপবনের বেদেনীরা অনেক স্বচ্ছল। তাদের স্কার্ট তাদের ঘাঘরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এরা ভারতের রোদে পোড়ে নি। এদের চিবুক ডালিমফুলের মতো রাঙা। অনেকের মাথায় রঙিন রুমাল ফুরফুর করে উড়ছে সকালের মৃদুমন্দ হাওয়ায়। হাসি হাসি মুখে কৌতুকের চোখে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে।

জীবনে এই প্রথম বেদেদের ভালো লাগল শরদিন্দুর। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল তাদের ডেরা আরাম করে নিঃশ্বাস নিল সাইপ্রেসের হাওয়ায়। ঘরে ফিরে যেতে চায় না সে।

(৪)

দুপুরটা অসহ্য হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে ছটফট করল। তারপর বারে গিয়ে একটু পান করে এল। একবার ভাবল সিটি যাবে। পরে ভাবল, সারা রাত ট্রেন জার্নি। একটু শুয়ে পড়াই ভাল। কিছুক্ষণ পরই উঠে বসল। সিগারেট ধরাল। ব্যালকনিতে গিয়ে হাইওয়েতে মোটর যাতায়াত দেখল। ঘরে এসে টিভি চালাল। কয়েকটা চ্যানেল চেঞ্জ করল। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করল। আবার বিছানায় শুল।

এ'কদিন ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ছিল। না বাড়িতে না কর্মস্থলে। মনকে সংযত করার দরকার ছিল না। যা খুশি তাই ভাবছিল। মনে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কোনো ভার বোধ করছিল না।

কাল থেকে মনকে ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনতে হবে। একাগ্র করতে হবে।

হঠাৎ সে ভীত হয়ে আবিষ্কার করল, তার সারা জীবনে যা হয় নি, তাই হচ্ছে। তার মন একেবারেই তার আয়ত্তে নেই।

শুধু যে বানরের মতো মন লাফালাফি করছে তাই নয়। তার কাজ করবার ইচ্ছা একেবারে শূন্য। এইভাবে কি করে যে প্রফেসর হ্যারিংটনের সামনে দাঁড়াবে সে জানে না। শরদিন্দু হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়ল।

যার চিন্তাটা সে ক্রমাগত ঠেকাতে চাইছে, সে-ই সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। চোখের সামনে তার মুখই সে দেখতে পাচ্ছে। গতবারে কলকাতা থেকে আসবার সময় বিবির যে মুখ দেখেছিল, সে-ই মুখ এখন তার চোখের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবির সেই ক্লান্তি এখন তার দেহমনকে ক্লান্তিতে জর্জর করে তুলেছে।

(৫)

সেবার ফেজানে গিয়ে দশদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছিল, তার এত হুড়মুড় করে আসার কোনো দরকার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দেহ জেগেছিল। তার আসার ব্যাপারে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। এর পেছনে ঊর্মি-ঘোষদা আছেন ? না, হ্যামন্ডের কারসাজি ? না, তিনজনেরই মিলিত প্রয়াস ? যোগাযোগ করেছে কে ? ঘোষদা ? ফর ক্রাইং আউট লাউড ! গড ড্যাম ঘোষদা

এবারে তার মন ভয়ানক উদ্‌বিগ্ন উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। তাই ফেজান তার সঙ্গে কথা কয় নি। এবারের ফেজান শুধু মাইলের পর মাইল প্রসারিত বালির পাহাড়। দুপুরে হয়ে ওঠে এক বিশাল বিস্তৃত জ্বলন্ত ধাতুর পাত। রাত্রি এক বিরাট অব্যক্ত হাহাকার।

এবারে গিবলি উঠেছিল। মরুভূমির আঁধি। মনে হয়েছিল, তাদের দলটির এই শেষ। তাঁবু সুদ্ধ তাদের উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলবে তিরিশ মাইল দূরে। আঁধির পরদিন সকালে আকাশ নীল। বাতাস ঝরঝরে পরিষ্কার। সূর্য উজ্জ্বল। ফরাসিরা তাঁবু সারাচ্ছিল। শরদিন্দু হাঁটতে হাঁটতে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আধমাইল দূরে একটা ওয়াড়ি পেল। মরুপথে শুকিয়ে যাওয়া নদীর উপল খচিত স্রোতভূমি। তার এখানে ওখানে কাঁটা গাছের ঝোপ। একটি ঝোপে একটি মাত্র ছোট শাদা ফুল ফুটে আছে। শিশির এই মাত্র শুকিয়েছে তার পাপড়ি থেকে এখনও তাজা আছে।

শরদিন্দুর বিবির কথা মনে হল। তখনই উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবল, তার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা ফিরে যাওয়া চাই।

কিন্তু নতুন নতুন কাজের ফতোয়া আসতে লাগল ত্রিপোলি থেকে। সমস্ত কাজ শেষ করে যখন হুনে এল তখন তিন মাস কেটে গিয়েছে।

ঊর্মি আর কুহু ইতিমধ্যেই বাড়িতে এসে গিয়েছে। ঊর্মি বলল, বিবিদি ভাল আছে। শঙ্কর এসে গিয়েছে।

পরবর্তী কয়েকদিনে ঊর্মি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতবার বিবির প্রসঙ্গ আনল এবং জোরের সঙ্গে বলল 'বিবিদি ভাল আছে' যে শরদিন্দুর সন্দেহ রইল না, তার ফেজানে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের একপ্রান্তে ঊর্মি আছে।

শরদিন্দু মুখে কিছু বলল না। শঙ্কর যখন এসেছে, বিবি যখন ভাল আছে, তখন আর দুমাস কাটিয়ে ছুটির সময়ে কলকাতা যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু বিবির জন্যে উদ্‌বেগ জেগেই রইল মনে। মনে হল হয় ত দেরি করাটা ভুল হচ্ছে। তখন ছুটির জন্যে দরখাস্ত করল। ছুটি পেল না। এত তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভবও নয়। যত মনের ভেতরটা ছটফট করতে লাগল ততই ঊর্মির ওপর মনে মনে রেগে উঠল সে। ঊর্মি ত অবস্থাটা জানত। তার একটু ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়তা বজায় রাখা উচিত ছিল।

ঊর্মির পরিবর্তনটা বড় বেশি হল। এই বাড়ি ঘর এই সংসার যেন তার অস্থিমজ্জা দিয়ে তৈরি। বাড়ি সাজানো গুছানো ঝকঝক করছে। ছবির মতো। তবু নিজের হাতে এটা ওখানে সরাচ্ছে ওটা এখানে আনছে। রান্নাঘর পরিষ্কার করছে। খাট আলমারির ধুলো ঝাড়ছে। দিনরাত যখন তখন ভাকুয়াম ক্লীনার ঠেলে বেড়াচ্ছে এঘর থেকে ওঘরে। পার্টিতে যায় সে। শুধু সামাজিকতা রক্ষার জন্যে। পার্টির প্রতি সেই উদগ্র আগ্রহ ধোঁয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। কোনো ফাংশনের নেমন্তন্ন এলে বিরস বদনে হাঁ বলে। রোজ পার্থকে চিঠি লেখে। কুহুর খাওয়া-দাওয়া পড়াশুনো নিয়ে দিনরাত লেগে আছে। অনেক দিন রাতে ঘুম ভেঙে শরদিন্দু দেখে, ঊর্মি তাকে দুহাতে জাপটে ধরে ঘুমিয়ে আছে। যেন সে হারিয়ে যাবে।

এ সে ঊর্মি নয়, যাকে শরদিন্দু বিয়ে করে মনে করেছিল, তার পরমার্থ লাভ হয়েছে। এ সে ঊর্মি নয় যাকে কীর্তির সঙ্গে অত বাড়াবাড়ির পরও ফিরিয়ে নিতে শরদিন্দুর তিরিশ সেকেন্ডও সময় লাগে নি। কারণ শরদিন্দুর গভীর বিশ্বাস ছিল এই প্রাণোচ্ছলা তরঙ্গিনীতে কোনো মালিন্য আটকে থাকবে না। শরদিন্দু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। ঊর্মি তার স্রোত হারিয়ে ফেলছে।

শুধু অপচরিত্রের প্রতি দুরন্ত ঘৃণাটি ঊর্মির সমানে বজায় আছে। যে ঘৃণা একদিন কীর্তিকে পুড়িয়েছিল, সেই ঘৃণা আজ বেলার ওপর বর্তেছে। কিন্তু বেলার সঙ্গে লড়াই করার কোনো হাতিয়ার তার হাতে নেই।

আগে ঊর্মি বেলাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। এত বছরে তাদের দুজনের মধ্যে বেলাকে নিয়ে কথাই হয়েছে মাত্র দুচারবার। এখন ঊর্মি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেলার কথা তোলে। যেন সে বেলাকে আবিষ্কার করতে চাইছে। বেলাকে মাপজোখ করতে চাইছে।

একদিন ঊর্মি বলল, বেলা এম- এ তে ভর্তি হচ্ছে।

শরদিন্দু বলল, হ্যাঁ, ওটা তার দরকার। শিক্ষার মোহর তাকে আরও শক্তিশালী করবে।

ঊর্মি বলল, আজকাল বাড়ি-ঘর-দোর খুব ঘষা মাজা হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনে গম গম করছে বাড়ি।

শরদিন্দু বলল, হ্যাঁ, সে মিথ্যা, অর্ধসত্য, নির্বিচার কথাবার্তা যা বলবে, তার ধুয়ো ধরবার লোক চাই।

ঊর্মি অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত হয়ে রইল। তারপর বলল, আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, বেলা কখনও সুখী হবে ?

শরদিন্দু বলল, বেলা সারাজীবন ধরে সুখের উপকরণ জোগাড় করবে। কিন্তু কোনো দিনই সুখী হবে না। কারণ সুখের আসল উপকরণ মনের ভেতর মানুষকে আপন করার ক্ষমতা। বেলার তা নেই। সে পালিশ করে করে বাইরেটা ঝকঝকে করে ফেলবে। কিন্তু তার মন তার পুরানো মনই থেকে যাবে। তার মন শ্বাপদের মতো হিংস্র।

বেলা কথায় কথায় স্বভাবচরিত্রের কথা তোলে। এমন ভঙ্গি করে ঘুরে বেড়ায় যেন সে ভীষণ চরিত্রবতী আমরা সকলে ম্লেচ্ছ বজ্জাত।

সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, তার বাপ মা তাকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে তার বহুদিনের জলসিঞ্চনে পুষ্ট অহংকারে লাগছে। তার আবেগের অক্ষমতাকে সে চরিত্র বলে চালাচ্ছে। সে নিজেকে পাল্টাত। কিন্তু তাতে সামাজিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয় আছে। প্রতিপত্তি তার কাছে জীবনের জলবাতাস। যখন সে আরো চালাক হবে, তার সুযোগ সুবিধে আরো বাড়বে, তখন সে লুকিয়ে লুকিয়ে বদমাইশি করবে। কীর্তির মতো। তার আগে পর্যন্ত আমরা তার শত্রু। আমরা মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার মতো অপরাধ করেছি।

হঠাৎ সে ভালবাসার স্বাদ পেতে পারে ত।

সে পাবে না। কারণ সে ক্ষমতা তার নেই। শরদিন্দু কয়েক মিনিট চুপ করল। তারপর বলল, ছেলেবেলায় বিবির কাছে শুনতাম, ভালবাসা ভয়ানক কঠিন। খুব কম মানুষই ভালবাসতে সক্ষম। খুব আশ্চর্য লাগত। বিবির কথা হেঁয়ালি বলে মনে হতো। বুঝতাম না। এখন বুঝতে পারি, বিবি একশভাগই সত্যি।

ঊর্মির চোখে মুখে হতাশা ফুটে উঠল। বোঝা যাচ্ছে। বেলার দিক থেকে সমস্যাটার কোনো সুরাহা হবার আপাতত কোনো সম্ভাবনাই নেই।

বেলা [illegible] দুজনেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভবী ভোলবার নয় [illegible] বিরাট মুখব্যাদান করে ভেংচি কাটতে লাগল তাদের।

তোমাদের মতামত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন যাপন বেলার মতের ওপর বেলার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে নাকি ? তোমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা এত আর্ট-কালচার, এত দেশে বিদেশে ভ্রমণ, এত অর্থ উপার্জন, কি হল এসব করে ? দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে বুক চিতিয়ে ? জোর কোথা তোমাদের ?

দুজনের কেউই সেই প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করল না। ভয় চেপে রইল গলা পর্যন্ত। দুজনেই বুঝতে পেরেছে একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। মরে যাবে।

দুজনেই নিজ নিজ কর্তব্য নিয়মিত করে যেতে লাগল। হয়ত বা একটু বেশি জোর দিয়েই করতে লাগল। ছন্দে পতন হচ্ছে না। কিন্তু মাধুর্যটুকু চলে গিয়েছে। দুটি গীয়ারে-জোড়া মেশিন নিখুঁতভাবে গণিত অনুমোদিত তালে চলতে লাগল।

শুধু হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে একে দেখে অপরের চোখ জুড়ে অভিমান অভিযোগ, 'তোমার বুঝে কাজ করা উচিত ছিল।'

এই কম্পিউটার চালিত রোবটের ন্যায় চলাফেরা করা বেশি দিন সহ্য করতে পারল না ঊর্মি। বলল, চল, সামনের উইক এনডে ত্রিপোলিতে ঘোষদের ওখানে বেড়িয়ে আসা যাক।

ঘোষদার নামে শরদিন্দুর ভ্রূ কুঞ্চিত করে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, চল। ঘোষদারা ওদের নিয়ে সাব্রেতায় গেলেন। রাস্তার একদিকে মরুভূমি। অন্যদিকে মাটি ধাপে ধাপে নেমে গেছে ঘন নীল ভূমধ্যসাগরে। রোমান আমলের ভগ্ন মন্দিরের শ্রেণী। ভাঙা চোরা। মার্বেল ভেঙে গিয়েও হাজারো পদ্মফুলের মত বিকশিত।

শরদিন্দু ও ঊর্মির মধ্যে আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাবটা ঘোষদার শ্যেনচক্ষু এড়ায় নি। বিকেলে তিনি নাসের রোড মার্কেটে যাচ্ছি বলে শরদিন্দুকে একলা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হাজির হলেন তাবজ্জায়া বীচের একটা রেস্তোরাঁয়। লম্বা গ্লাস আঙুররসের অর্ডার দিয়ে আলতু ফালতু কথা কইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, তোমাদের মন কষাকষি চলেছে এটা আমরা দু'জনেই বুঝতে পারছি। আমার শুধু অনুরোধ, তোমার ক্লেশের জন্যে তুমি ঊর্মিকে দায়ী কারো না। সে শুধু একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, তুমি কলকাতায় একটা স্ক্যানডালে জড়িয়ে গেছ। তোমার অবিলম্বে কলকাতার বাইরে চলে আসা উচিত। আমি যেন নীডফুল কিছু একটা করি। বাকি যা প্ল্যানিং, যেমন ফেজান মরুভূমি, হ্যামন্ডকে দলে টানা, সমস্তই আমার মস্তিষ্ক প্রসূত। যা দায়ী করবার তুমি আমায় কর। আমরা সুখের/আমাদের মেয়ের/সুখের জন্যে করেছি।

শরদিন্দু কপালে বাঁ হাত ঠেকিয়ে রেখে বিরস মুখে বলল, ক্ষতি যা হয়েছে, সেটা কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না।

কেন, ঊর্মি এবারে এসে বলল, সেই ভদ্রমহিলা ভালো আছেন।

লেম্যানেরা অনেক সময় বাইরে থেকে বুঝতে পারে না, মনের ভেতরে ডিপ্রেসন কত ভয়াবহ হয়ে রয়ে থাকতে পারে। আই য়্যাম হোপিং হোল হারটেডলি যে ঊর্মি ভুল করে নি।

শত চেষ্টা করেও শরদিন্দু তার অসহ্য উদবেগ চেপে রেখে মুখের চেহারা সংহত রাখতে পারল না। ঘোষদা ভুল বুঝলেন। ভাবলেন, ওটা ঊর্মির ওপর রাগ।

ঘোষদা শরদিন্দুকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন, ঊর্মি আমাদের বলেছে, সেই মহিলা অত্যন্ত আদর ও সম্মানের যোগ্য। সেই পরিস্থিতিতে তুমি যা করেছ, তার মধ্যে ঊর্মি অন্যায়ের কিছু দেখে নি। কিন্তু তোমাদের বাড়ির আর পরিবেশের আর পাঁচজন ব্যাপারটা ওভাবে দেখে নি বা দেখবেও না। তারা তোমায় পাঁকে নামিয়ে পিটিয়ে খতম করার তালে ছিল। তখন স্ত্রী হিশেবে স্বামীকে রক্ষা করাই ঊর্মি তার প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেছিল।

শরদিন্দু ভূমধ্যসাগরের ঘন নীল জলের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল, ঊর্মির কি এত জোর আছে যে, আমায় রক্ষা করবে ?

ঘোষদা বিড়ম্বিত মুখ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর খুব মৃদু স্বরে বললেন, আমি অনধিকার চর্চা করতে চাই না। কিন্তু তোমার উন্নতি আর ঊর্মির সুখ আমি এত দরকারি বলে মনে করি যে, আমাকে জানতে চেষ্টা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

শরদিন্দু পাথুরে মুখ করে ঘোষদার দিকে তাকিয়ে বলল, কি জানতে চান বলুন।

ঘোষদা চিন্তিত মুখে বললেন, তোমার মতো এরকম একজন ঠাণ্ডা মাথা, সৎ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল কি করে ? ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়ও।

শরদিন্দু ঝিম মেরে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, সৎ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেই আমি জড়িয়েছি। আমি যতখানি মনোযোগ দিয়ে বাইরের কাজ করি ততখানি উৎকর্ণ হয়েই তাকিয়ে থাকি ভেতরের দিকে। বাইরে যেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার, ভেতরে সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। সেটা আকাশ বাতাস মাটি জল আগুনকে ছুঁয়ে রয়েছে।

স্ক্যানডালের মধ্যে আকাশ বাতাস চলে আসতে ঘোষদা বিমূঢ় হয়ে গেলেন। শরদিন্দু সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি আপনাকে কি বলে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। যা বলব তা গ্রীক ল্যাটিনের মতো শোনাবে কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই 'বিশ্রী' ব্যাপারটা, আমার পক্ষে মজা মারার ব্যাপার মোটেই হচ্ছে না। আমার পক্ষে খুব কঠিনই হচ্ছে। ভালবাসা বড় কঠিন। আর অন্যায়ের কথা ? আমি এত কষ্ট করে অন্যায় করতে চেষ্টা করব কেন ? আজকের ফ্লাইটে কায়রো গিয়ে রাত কাটিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে ফিরে আসতে পারি। আমার বাড়ির লোক ত দূরের কথা, আপনিও বুঝতে পারবেন না সেটা কত সোজা হতো আমার পক্ষে।

শেষ ব্যাপারটা ঘোষদা অনুধাবন করলেন। এবং তাতে শরদিন্দুর ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরও উদ্ভট লাগল। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আমি এটুকু বুঝলাম, তুমি আমাদের সেই ভদ্রলোক শরদিন্দুই আছ। তুমি ক্রিমিনাল নও। কিন্তু তার বাইরে আমি কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

শরদিন্দু তার সমস্ত বিশ্বাসকে একান্ত করে নিয়ে বলল, ঘোষদা, আপনি যদি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতেন, আপনিও বুঝতেন, ভালবাসা বড় কঠিন। কিন্তু ভালবাসতে পারলে, সেই গভীরতায় পৌঁছলে, আর নিয়ম-অনিয়ম ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় থাকে না। শুধু ভালবাসাই থাকে।

ঘোষদা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে গ্লাসটি শেষ করলেন। তারপর শরদিন্দুর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে একটু থেমে বললেন, নিয়ম না থাকলে চলবে কি করে ?

শরদিন্দু বলল, নিয়ম ভেতর থেকে আসে। আপনা আপনিই আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বাইরে থেকে বানাতে হয় না।

শরদিন্দু বলল, ব্যাপারটা এত গভীর আর বিস্তৃত যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সীমারেখা দিয়ে তাকে বাঁধতে যাওয়া বাতুলতা। এমন কি পাত্র পাত্রীও বুঝতে পারে না এটা কখন কিভাবে এল। অস্বীকার করারও সময় থাকে না।

তাই, শরদিন্দু ঘোষদাকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল, পাত্রপাত্রীরও উচিত নয় লোকের নাকের ওপর নাচানাচি করার। আর লোকেরও উচিত নয় অযথা নাক গোঁজা বা হেঁড়েপণা করা। যেমন আমার ভাইয়ের বউ করছে। বেলা চীনেমাটির বাসনের দোকানে ষাঁড়ের মতো ঢুকেছে।

শরদিন্দু হতাশভাবে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলল, কবে যে আমাদের বাড়ির লোকের মন একটু আলোকিত হবে ! আমার চিরটা কাল অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করেই কেটে গেল !

ঘোষদা আর কোনো কথা বললেন না এ বিষয়ে। ওয়েটারকে টাকা দিলেন। গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দিলেন। তারপর অফিসের কথা শুরু করলেন।

মহান ভ্রাতা কাধাফি অফিসে বিশ হাজার কপি তাঁর সবুজ বই পাঠিয়েছেন। সেগুলো কি এখনই ডিস্ট্রিবিউট করা উচিত ? না, তার ওপর চেপে বসে থাকা উচিত ? এ· এল· সি· সি-র বিখ্যাত ডিসিপ্লিন কি সবুজ বইয়ের চাপে ভেঙে পড়বে বলে শরদিন্দু মনে করে ? কাধাফি কি শীঘ্রই বিদেশীদের বিদেয় করে দেবেন ? ফেজানের ফরাসি কোম্পানিটির সম্বন্ধে শরদিন্দুর মত কি ? সে কি মনে করে অয়েল ষ্ট্রাইক করার সম্ভাবনা আছে ?

বিবি, ঊর্মি আর তার প্রসঙ্গ চলে যেতে শরদিন্দু স্বস্তি পেল।

সেদিন বিকেলে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। শরদিন্দুর অন্যমনস্কভাবে মনে হয়েছিল, চারপাশে একটা থমথমে ভাব। কিন্তু কাজের চাপে স্পষ্টভাবে খেয়াল করে নি। ওয়ার্কশপে যাবার সময়ে নজরে পড়ল। সারা আকাশ হালকা ছাই রঙের মেঘেতে ভরে গেছে। জুনের আকাশে মেঘই এক বিস্ময়ের ব্যাপার, তাও বছরের এই সময়।

বাড়ি ফেরার সময়ে একটু হাওয়া উঠল। আবহাওয়া ধোঁয়াটে হল বালিতে। টপ টপ করে দুএক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল।

বাইরের দরজায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। মানে, ঊর্মি নীচে ছিল। রান্নাঘরে বেসিনে অর্ধেক বাসন-কোসন আধোয়া পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ ঊর্মি হঠাৎ ওপরে উঠে গেছে।

দোতলায় শোবার ঘরের পেছনের বারান্দায় ঊর্মি রেলিঙে ঠেস দিয়ে মেঘলা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। শরদিন্দুর পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়াল। ঊর্মি একটা হাল্কা সোনালি রঙের কাফতান পরেছে। ভেসট্যাল ভারজিনের মতো দেখাচ্ছে।

হঠাৎ মেঘ এসে ঊর্মিকে সতেজ করে তুলেছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা বন্ধুত্বের ভাব। শরদিন্দু তার পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনে ঘুরে রেলিঙে ভর দিয়ে বিস্তৃত বালির ওপর মেঘের ছায়া দেখতে লাগল।

কতদিন পরে যে ঊর্মির মুখে সেই আদুরে ভাবটা ফিরে এসেছে। শরদিন্দু বড় হাল্কা বড় খুশি বোধ করল। বারান্দার এখানে ওখানে এলোমেলো দুচার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। ঊর্মি মুখ তুলে বলল, দেখ, আমার মুখে বৃষ্টি পড়েছে। শরদিন্দু দেখল, ঊর্মির কপালে নাকে দুফোঁটা জল হীরের মতো জ্বল-জ্বল করছে।

অনেকদিন পর শরদিন্দু সাহস করে উর্মির পিঠ বেড়ে তার কোমরে হাত দিল। ওই শরীর তার এত চেনা যে হাত দিয়েই শরদিন্দু বুঝতে পারল উর্মির স্নায়ুজালে তার মনের নানা কথার প্রতিধ্বনি আবর্তিত হয়ে বেড়াচ্ছে। সে খুব আস্তে আস্তে বলল, রিমি, তুমি কিছু বলবে ?

উর্মি একবার ঘাড় বেঁকিয়ে শরদিন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর খুব ধীর গলায় বলল, আমি তোমার ওপর রাগ করি নি। আমি শুধু সমস্যাটার মুখোমুখি হবার চেষ্টা করছি।

শরদিন্দু চুপ করে রইল। উর্মি খুব নিচু গলায় প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, গোড়ায় গোড়ায় আমার বড় লাগত। বিবিদিকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভীষণ ভালবাসি। তবু বিবিদিকে তোমার ভাগ দিতে বড় লাগত। কখনও কখনও যখন দেখতাম বিবিদির সঙ্গে কথা বলে তুমি বড় খুশি হয়ে ফিরছ, মনে হত কোথায় যেন আমার হার হল। অনেকদিন ভেবেছি। অনেকদিন ভেবেছি। আর শেষ পর্যন্ত তার বাইরে চলে এলাম।

শরদিন্দু চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের সুরে বেরিয়ে এল, কি করে ?

আমি আবিষ্কার করলাম, কোনো একজন মানুষ, তা তার যতই রূপগুণ থাকুক না কেন, আরেকজন মানুষের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমি তোমাকে তোমার পাওনার চাইতে অনেক বেশি দিয়েছি। তবু আমি দেখলাম, তোমার মনের গভীরের এক বিচিত্র অঞ্চলে আমি কিছুতেই পৌঁছতে পারছি না। আর বিবিদি কত সহজে সেইখানে গিয়ে বসে আছে।

শরদিন্দুর মুখ ছাই হয়ে গেল। সে কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না।

উর্মি সেটা লক্ষ্য করল না। সে নিজের মধ্যে ডুবে আছে। সে যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। বলল, আমি নিজেকে বোঝালাম, তোমার অধিকারবোধ এত স্থূল কেন উর্মি ? সামান্য একটা শীলমোহরের জোরে তুমি সেই জমিদারিতে শাসন চালাতে যাচ্ছ যেখানে কোনোদিন তুমি পৌঁছতেই পার নি ? মিথ্যে তোমার কালচার।

উর্মি শরদিন্দুর দিকে ঘুরে তাকাল। তার গলায় হঠাৎ একটু জোর লাগল। বলল, বিশ্বাস কর, শেষপর্যন্ত আমি অধিকারবোধ নামক প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটাকে বেঁধে ফেললাম। কিন্তু, উর্মির গলা আবার খাদে নেমে এল, জানোয়ারটার সম্বন্ধে [illegible]মি কোনোদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম না। খোঁচালে আবার রাগারাগি করে পাছে [illegible]ড়া ছিড়ে ফেলে তাই আমি সব সময়েই চেয়েছি, এই নিয়ে কথা বলাবলি ন[illegible] সত্যকে অস্বীকার করার দরকার নেই। কিন্তু অনেক সময় প্রচ্ছন্ন রাখার প্র[illegible]জন আছে। আমি দুঃখিত, রিমি। এই টানাপোড়েনের যন্ত্রণা থেকে আমাদের মু[illegible]তে হবে, শরদিন্দু তার মনের সমস্ত জোর জড়ো করে বলল, এসো আমরা আ[illegible]তুন জীবন শুরু করি। আমি আর কলকাতা যাব না।

[illegible]র গলায় প্রত্যয়ের সুর বাজল না। তার মুখটা মৃত মানুষের মুখের মতো হয়ে [illegible]। তার হাত পা এমন কঠিন হয়ে আসতে লাগল যেন রাইগর মর্টিস শুরু হয়েছে।

তার দিকে তাকিয়ে উর্মি বিষণ্ণ হাসল। বলল, মনকে স্বাধীনতা দিয়ে আমরা বিয়ের ওপর কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। স্বাধীনতার ঝোঁকে আমরা বিয়ের মানচিত্রের বাইরে চলে এসেছি।

মেঘলা সন্ধেতে চারপাশ বেশ অন্ধকার লাগছে। উর্মি হাত বাড়িয়ে যেন সেই অন্ধকার হাতড়াতে লাগল। বলল, এই নতুন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থানটা ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি আমাদের কাছে।

শরদিন্দু একটু বিস্ময়ের গলায় বলল, তুমি আমরা বলছ কেন, রিমি ? গলদ কাজ আমি করেছি। উপায় হাতড়াচ্ছি আমি।

উর্মি মুখ নিচু করে বলল, আমাদের দুজনের একই রোগ ইন্দু। শুধু তুমি করেছ আমি করি নি। আমি করি নি আমার সুযোগ হয় নি বলে।

সে কি, শরদিন্দু থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর খসখসে গলায় বলল তুমি কি কীর্তির কথা বলছ ?

না, কীর্তি ত পাসিং শো। এ হল আলি আশরফ, এর সমস্যা আরও অনেক গভীর।

শরদিন্দু একটু বিস্মিত একটু আহত গলায় বলল, কই এর কথা আমাকে কখনও বলনি ত ?

কারণ, কিছু ঘটে নি।

তাহলে এর এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন, শরদিন্দু স্বস্তির গলায় বলল।

কারণ, এটা ঘটতে যাচ্ছি[illegible], অনায়াসে ঘটে যেতে পারত।

কে এই আলি আশরফ[illegible]

লখনৌয়ের এক খানদানি পরিবারের ছেলে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের কনটেমপোরারি ছিল। ইসলামিক হিস্টরি পড়ত। পড়াশুনাটা ওর পাসটাইম ছিল। আসলে ফাংশন অরগানাইজ করাটাই তার আসল কাজ ছিল। গানের জলসার সূত্রেই তার সঙ্গে আমার আলাপ।

বিয়ের পরে তোমার অনেক বন্ধুর কথা আমাকে বলেছ। এর কথা ত বল নি।

কারণ সেই সময়ে আমার জীবনে আশরফের কোনো ভূমিকাই ছিল না। কখনও কখনও স্টেজে আমার গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছে। আর মাঝে মাঝে শুধু বলত, উর্মি মুঝে রবীন্দ্রসংগীতমে তালিম দেও। কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত শিখেও ছিল আমার কাছে।

আমাদের জীবনে তার ভূমিকা এল কি করে ?

আশরফ এসেছে অনেক পরে। তার আগে তোমার আমার মধ্যে মনে মনে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

কি ঘটেছে ?

বিয়ের কিছুদিন পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তোমার মত স্বামী পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু এক জায়গায় তুমি কোনোদিনই আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না। সেটা হল আমার গান। মনে আছে, ত্রিপোলিতে কতদিন এমন হয়েছে : তুমি ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে ফিরেছ। স্নানটান করে পাশে কফি নিয়ে সোফার মধ্যে ডুবে আরাম করে খবরের কাগজ পড়ছ। হঠাৎ আমি এসে বলেছি, গানের ফাংশান আছে, চল। তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে জামাকাপড় বদলাতে গেছ। কিন্তু তোমার মুখের চেহারা দেখলেই বোঝা যেত, ইউ উওড রাদার স্টে অ্যাট হোম। তুমি এটা করছ, এই দুটোর কোনো একটা কারণে। তুমি আমাকে ভালবাস, তাই তুমি আমাকে দুঃখ দিতে চাও না। অথবা তুমি আমাদের পারিবারিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চাও না। কলকাতায় কত জলসায় তোমাকে এমনভাবে রেসপনসড় করতে দেখেছি যাতে আমার সন্দেহ ছিল না, তোমার মতো তালকানা লোক দুর্লভ।

শরদিন্দু একটু বিড়ম্বিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। গান যে একটা জীবনমরণ ব্যাপার হতে পারে বিয়ের আগে এটা তার কখনই মনে হয় নি। উর্মিকে কাছ থেকে না দেখলে এটা সে বিশ্বাসও করত না। হেসে উড়িয়ে দিত।

উর্মি বলল, ছেলেবেলা থেকেই মা শিখিয়েছিল, বিয়েতে মেয়েদের অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয়। তুমি আমাকে এত দিয়েছ যে, মানিয়ে নিতে আমার কষ্ট হয় নি। বেশ চলছিল। কিন্তু সুরের নির্বাসনে আমাদের মধ্যে যে অশান্তি হল, তাতে আমার এই দুঃখটাই বড় করে বাজতে লাগল, তোমার জন্যে আমাদের বিয়ের জন্যে আমি আমার এত সাধের এত সুখের গানকে ভাসিয়ে দিয়েছি।

শরদিন্দু নিঃশব্দ হয়ে রইল। কিন্তু সে তার দুঃখ চেপে রাখতে পারল না। তার মুখের ওপর সেটা আছড়ে পড়তে লাগল। উর্মির সুখের জন্যে সে তার সাধ্যের মধ্যে যা ছিল সমস্ত করেছে।

উর্মি বলল, মনে আছে একবার রাগারাগি করে কলকাতায় আমরা আলাদা ছিলাম। তুমি শ্যামবাজারে আর আমি ঢাকুরিয়াতে। সেই সময়ে রবীন্দ্র সরোবরে একটি ক্লাসিকাল গানের জলসায় বহুবছর পরে আমার সঙ্গে আবার আলি আশরফের দেখা হল। গোলাপি আভার ফরসা সে চিরকালই ছিল। কিন্তু ল্যাক প্যাক সিং ছিল। তবলা হাতে ওস্তাদদের পেছনে দৌড়নই তার কাজ ছিল। কিন্তু এখন তাকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। লম্বা চওড়া চেহারা, দুধে আলতা রঙ, মাথায় বাবরি চুল। সিল্কের পাঞ্জাবি পাজামায় নবাবের ছেলের মতই দেখাচ্ছে। সে এখন রামপুরি ঘরানার সবচেয়ে নামকরা গাইয়ে। আমি, অন্ধকারেও উর্মির গালে অল্প রঙ চড়া শরদিন্দুর দৃষ্টি এড়াল না, হঠাৎ মজে গেলাম।

বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। উর্মি যন্ত্রচালিতের মত ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু সে তখনও আত্মস্থ হয়ে রয়েছে। অবগাহন করছে সেই ঘটনাটির মধ্যে। বলল, আমি সামনের সারিতে বসে ছিলাম। আশরফ আমাকে চিনতে পেরেছিল। ইনটারভালের সময় সে স্টেজ থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মাঝখানে হঠাৎ সে বলল, উর্মি তুমি আগের চেয়ে কত বেশি খুবসুরত হয়েছ। আমার বুকটা শিরশির করে উঠল।

আশরফের কথা শুনে মনে হল, ও ধরে নিয়েছে, আমি ভাল রবীন্দ্র সংগীত গাইয়ে হয়েছি। আমার লজ্জা করতে লাগল। সেই সময়ে আশরফের চ্যালাচামুণ্ডারা তাকে ধরে নিয়ে গেল। যাবার সময়ে আশরফ বলে গেল, উর্মি, তুমি আমার সঙ্গে সময় মত একটু কনট্যাক্ট করো। তোমাকে আমি ক্লাসিকাল গান শেখাব।

বিরতির পর আশরফ ঘুরে ফিরে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে রাগেশ্রী রাগে খেয়াল গাইল ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ধরে। আসর সুদ্ধ লোক সম্মোহিত হয়ে রইল। আমার মনে হল রাগেশ্রীর সমস্ত অভিমান আমাতেই অর্পিত। সেই সুরলহরীতে আমি ডুবে রইলাম।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

মোহিতলাল মজুমদারের পত্রাবলী

সাত / সম্পাদনা অলোক রায়

॥৩২ ॥

বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ২৩/৬/৫১

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার পত্র এবং প্রেরিত একাধিক মহাত্মার দর্শন পাইয়াছি। গত রবিবারে আসিতে না পারায় কিঞ্চিৎ আশাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু এ রবিবারেও আমি বাসায় থাকিব না, তাই মনে হইতেছে এ যেন একটা দৈব-বিপাক। আগামী সপ্তাহের সোম, বুধ এবং বৃহস্পতিবারে আমি বিকালের দিকে গৃহে থাকিব না অতএব আবার সেই রবিবার

শুনিলাম, মনোজ বসুর 'জন্মপঞ্চাশী'র আয়োজন হইতেছে—বেশ একটু ঘটা হইবে নিশ্চয় ; পুরোহিত কে ? এখন বৈশ্যযুগ চলিতেছে ; সরস্বতী 'বেনে-বৌ' হইয়াছেন, এখন আর তিনি সর্ব্বশুক্লা নহেন, রঙ্গীন শাড়ী ও সোনার কণ্ঠী পরিয়া ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের ধন ও মান বৃদ্ধি করিতেছেন। যাক্, আমি তো সমাজে পতিত, সরস্বতীর কুপুত্র অথবা, দুষ্ট-সরস্বতীর সেবা করি আমার এ সব অনধিকার-চর্চ্চা।

কিন্তু সজনী-তারাশঙ্করের রাজত্বে সাহিত্যের সমাজ-ধর্ম্ম কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে ? সাহিত্যের অজুহাতে আত্মপূজার এ কি সংক্রামক ব্যাধি !

আশা করি, আপনার সংবাদ কুশল। সাহিত্য-রাজধানীর খবর কি ? শুনিলাম প্রবাসীতে আমার সেই বক্তৃতার একটি প্রখর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। প্রবাসীর মাথাব্যথা হইল কেন ? যেখানে যত ডোমের কুকুর ছিল সকলে ঘেউ ঘেউ করিতেছে। প্রহারে কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন লইবেন।

আপনার
মোহিতলাল

॥ ৩৩ ॥

বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ৭/৭/৫১

সুহৃদ্বরেষু,

পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তারাচরণের বৌ দেখিতে আমি কাল সন্ধ্যায় উহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম ভালই হইয়াছে।

আপনি যে দুইটি সংবাদ দিয়াছেন তাহাতেও সুখী হইয়াছি। প্রথম—'মর্কট'-সংবাদ। যতদূর জানি আমি কখনো কোনো ব্যক্তির নাম ক্লাসে ছাত্রদের নিকটে করি না বহুদিন শিক্ষকতা করিতেছি, সে বিষয়ে একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তবে ছাত্রেরা যদি কোন প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 'মর্কট' শব্দের প্রয়োগ—ব্যক্তিবিশেষে যুক্ত করিয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার নয়। কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তির আমাকে দায়ী করিবারই বা কি ধর্ম্মসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ? আমি তাহার নাম মুখে উচ্চারণ করিতেও ঘৃণাবোধ করি—প্রকাশ্যে এত বড় সম্মান তাহাকে দিব না, উহা নিশ্চিত। যদি উহা সত্য হইত, তবে তাহা শিক্ষকতা-কর্ম্মের নীতিবিরুদ্ধ হইত—সম্ভবতঃ সেই নীতির উপরে দাঁড়াইয়া ঐ গান্ধীধর্ম্মী সত্যবান্ পুরুষ আমার বিরুদ্ধে একটা নূতন অভিযান সুরু করিয়াছেন। আপনি তাহাকে বলিবেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের তাহাতে একটি রোমও ছিন্ন হইবে না।

বনফুলের 'স্থাবর' সাহিত্যসমাজে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছে—এ সংবাদ আমাকে দিবার কারণ বুঝিলাম না, যদিও উহা একটি বড় সংবাদ এবং সুসংবাদও বটে। যাহারা বঙ্কিমকে উড়াইয়া দিয়াছে (সেদিন বঙ্কিমস্মৃতিবার্ষিকীতে সজনীকান্ত শুনিলাম তাহাই করিয়াছে) তাহাদের সমাজে বলাইচাঁদ যে একজন মহাসাহিত্যিক হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? আগামী বৎসরের 'রবীন্দ্রপ্রাইজ' তিনিই পাইবেন,—সিনেমাতেও উহা চিত্ররূপ পরিগ্রহ করিবে। উহার Publisher বড়ই সৌভাগ্যবান। অপর প্রাইজটি সজনীকান্ত কাহাকে দেওয়াইবেন ?

আশা করি ভাল আছেন। আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন।

ইতি

আপনার
মোহিতলাল

॥ ৩৪ ॥

বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ১৮/৭/৫১

ভাই কালিদাসবাবু,

চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি, 'সঞ্চয়িতা' লইয়া বড় ব্যস্ত আছি, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যেই, রটিয়াছে, আমি নাকি একখানা 'মহাভারত' লিখিতেছি—তাহা কে-ই বা পড়িবে।

বনফুলের 'স্থাবর' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সুখী হইলাম। লেখা ভালো হওয়া আশ্চর্য্য নহে—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—একটা বড় দল বা চক্রে " থাকিলে কোন ভালোরই 'ভালাই' নাই। সজনী-মণ্ডলে এখন তারাশঙ্কর অস্তপ্রায়—বনফুলের রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। লেখার জোর যতই থাক—মানুষ বড় না হইলে লেখক বড় হয় না। নগদ-বিদায় যথেষ্ট মিলিবে, কিন্তু সাহিত্যেও 'wages of sin is death'—উহারা কেহই বাঁচিবে না।

শ্রীকুমার যে সেই চিঠি দেখাইয়াছেন, তাহা আমি অনেক আগেই অনুমান করিয়াছি। ভদ্রলোক হইলে তাহা করিত না। কিন্তু ঐ চিঠির উত্তর আমার কাছে আছে—আমি তাহা দেখাইব না। ঐ চিঠিতে আমি শ্রীকুমারকে—ঐ পদে আপনাকে লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। 'শ্রীমর্কট'[১] নামে যে কবিতা লিখিয়াছে—তাহাতে ওর গায়ের ঝাল মিটিবে তো ? আমি আর কবিতা লিখিতে পারি না—গদ্যেই কিছু লিখিলাম, তাহাতে উহাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য 'অমর' করিয়াছি—আমার বইগুলা যারা পড়ে, এবং আশা করি, পরেও পড়িবে—তাহারা উহাকে স্মরণ না করিয়া পারিবে না। অত বড় ঘৃণ্য চরিত্র আমি ঐ সমাজেও দেখি নাই।

আশা করি ভালই আছেন। তারাচরণকে আর দেখি নাই—সে এখন কিছুকাল ভিন্ন জগতে বাস করিবে। ভালবাসা জানিবেন। ইতি

মোহিতলাল

১ প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা।

॥ ৩৫ ॥

বড়িশা
১৬/৮/৫১

সুহৃদ্বরেষু,

অতিশয় অসুস্থ হইয়াছি বলিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আজ আপনার আরেকখানি পত্র পাইলাম ; প্রাপ্তিমাত্রে উত্তর লিখিতেছি। তার কারণ—আপনার এইবার মস্তিষ্কের softening দেখা দিয়াছে—তাহাতে চিন্তিত হইয়াছি।

আমি 'কথাসাহিত্যে' প্রমথর সঙ্গে কবির লড়াই করিতে নামিব—অথবা উহার ঐসব গালাগালির কোনো notice লইব—উহা আপনি ভাবিতে পারিলেন কেমন করিয়া ? আমার পূর্ব পত্রের একটা কথার অর্থ আপনি বুঝিতে পারেন নাই—তারাচরণকে বলিয়াছিলাম, সে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া সাক্ষাতে আপনার ভ্রম সংশোধন করে। কিন্তু এ পর্যন্ত সে আপনার কাছে যাইতে পারে নাই।

আপনি এতকাল আমাকে দেখিতেছেন—আমি কখনো কোনকালে আমার পক্ষে ব্যক্তিগত যুদ্ধ কোথাও করিয়াছি ? তারপর, ঐ প্রমথটা—ওটাকে এবং 'কথাসাহিত্যে'র ঐ অতি নগণ্য দলকে আমি গ্রাহ্য বা গণ্য করিব ? প্রমথর কবিতা[১] আমি পড়িয়াছি—উহাতে একটা কথাও নাই যাহা আমাকে স্পর্শ করে গায়ের জ্বালা ও ইতরামী ছাড়া উহাতে আর কিছুই নাই ; যে পড়িবে সেই তাহা বুঝিবে এমন কি আমার শত্রুরাও খুশী হইবে না, কারণ, উহার একটা গালিও "যুতসই" হয় নাই। আমি ঐ কবিতার উত্তর লিখি নাই—কখনো ব্যক্তিগত কারণে আমি কাহাকেও গালি দিই নাই,—সবই, হয়, সাহিত্যের আদর্শ-রক্ষা, নয়, দেশের ও জাতির জন্য। আমি আমার একখানি পুস্তকের ভূমিকায় সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে ঐ পাপিষ্ঠকে যে কশাঘাত করিয়াছি[২]—তাহা হইতে উহার পরিত্রাণ নাই, নাম না থাকিলেও সকলেই বুঝিতে পারিবে। পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন তাহাতে

ব্যক্তিগত কিছু নাই। ও একটা কৃমি-কীট, উহার নাম করিতেও ঘৃণা বোধ করি। আপনি আমার সম্বন্ধে এ ধারণা করিলেন কেমন করিয়া? আমার সাহিত্যিক জীবনে—যাহা কিছু করিয়াছি তাহাতে ব্যক্তিগত কিছু নাই; একথা একদিন সকলে স্বীকার করিবে।

আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন।

আপনার
মোহিতলাল

১। পূর্বোদ্ধৃত রচনা।

২। মোহিতলাল 'বাংলা ও বাঙালি' (১৩৫৮) গ্রন্থে 'নিবেদন' অংশে অতি তীব্র ভাষায় প্রমথনাথ বিশীকে আক্রমণ করেছেন।

॥ ৩৬ ॥

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা—৮
ইং ৩/৯/৫১

ভাই কালিদাসবাবু,

আপনি একটু বে-কায়দায় পড়েছেন দেখছি, কিন্তু তার জন্যে আমার কাছে জবাবদিহির কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একটুও বিচলিত হই নি, তার কারণ, ওটা একেবারে বাঁদুরে কাণ্ড পিছনে সজনী আছে। ওতে আমায় কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু আপনার ঐ সাফাইগুলো আমাকে লজ্জিত করেছে। আপনি নিরুপায় তা জানি—আমি আপনাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি। আপনি যে একটু জড়িয়ে পড়েছেন তাও দেখতে পাচ্ছি—যেটার কারণ অনেক।

Secondary Board-এর ঐ কাজটার আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা খুব far-fetched নয় কি? তার চেয়ে সোজা ব্যাখ্যা তো পড়ে রয়েছে আপনি একটু ভুল করেছেন। দেখা হ'লে বুঝিয়ে দেবো আমার কোনখানে কোনো ছিদ্র নেই—তাই আমি এতো নির্ভীক সেটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত তা জানি—বিশেষত আজকের এই সমাজে

আমাদের এখন বয়স হয়েছে। তাই বুদ্ধিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। খুব সাবধান না হ'লে মানমর্যাদা বজায় রাখা কঠিন। আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

তারাচরণ কিছুতেই শুনবে না। সে তর্জ্জার লড়াই-এ মেতে উঠেছে। একটা সুখবর এই যে, বোধহয়, আবার একখানি পত্রিকার সম্পাদনা আমায় করতে হবে—নতুন পত্রিকা।[১] সবাই বড় চেপে ধরেছে কিন্তু আমি এখনও ঠিক করতে পারি নি—কারণ, উপস্থিত খুবই দায়গ্রস্ত হয়ে আছি

আমার শরীর খুব খারাপ। সম্প্রতি প্রায় শয্যাগত হয়েছিলাম। তারাচরণ কুশল সংবাদ দিয়েছে।

আশা করি আপনি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমার ভালোবাসা নেবেন

আপনার
মোহিতলাল

১। এখানে 'বঙ্গভারতী' পত্রিকার কথা বলা হয়েছে। মোহিতলালের সম্পাদনায় তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৫৯।

॥ ৩৭ ॥

৪/৯/৫১

ভাই কালিদাসবাবু,

পুনশ্চ লিখিতেছি। আপনার ঐ কবিতাটিও ভালো হয় নাই, কারণ, উহার তত্ত্বটা মিথ্যা, এবং উহাতে মনের দৈন্য, এমন কি ঈর্ষ্যাই প্রকাশ পায়। আপনি আপনারই মর্যাদাহানি করিয়াছেন উহার অর্থ এই "আচ্ছা, তোমরা আমাকে কবি বলিয়া মানিতে চাও না; আমি ছোট, আমার চেয়ে বড় অনেক রহিয়াছে? বেশ, কিন্তু আমি একটা সত্যের সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি—রবীন্দ্র-শরৎ ছাড়া কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না, তোমাদের ঐ ছোট-বড়-ভেদ একই নগণ্যতায় বিলীন হইবে।" কথাটা সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যসমালোচনা—দুই দিক দিয়াই অতিশয় মূল্যহীন। আপনার মত প্রকৃত শক্তিমান্ (যে শক্তির মাত্রা যেমনই হোক) একজন সারস্বত ব্যক্তির মুখে ঐ কথাটা শুনিতে যে বড় খারাপ হয়—উহার মূলে কোন্ মনোভাব রহিয়াছে তাহা বুঝিলে, কত অমর্য্যাদাকর হয়, তাহা আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই। উহা সজনীকান্তের মুখেই শোভা পায় আপনি কোন্ চিত্তকাতরতার বশে উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন? প্রতিভার ছোট-বড় থাকিবেই; কিন্তু খাঁটি বস্তুর এক কণাও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যত বড়ই হউন—কেবল ঐ দুইজনকে লইয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হয় না। এমনও ঘটিয়াছে

মোহিতলাল মজুমদার

যে, একটি মাত্র কবিতা লিখিয়া কোনো কবি অমরতা লাভ করিয়াছেন অতএব ঐরূপ উক্তি প্রাকৃতজনের উপভোগ্য বটে, তাহাদের সান্ত্বনা, এমন কি একপ্রকার গৌরবের কারণ বটে, কিন্তু উহা যেমন মিথ্যা, তেমনই অনিষ্টকর। আপনি সমসাময়িক সমাজের চাপে আত্মভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমি জানি কিছুমাত্র আত্মপ্রত্যয় নাই;—বড়ই দুঃখের কথা। তাছাড়া, ঐরূপ উক্তির অন্তরালে একটা কু-মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে। সজনী ঐরূপ কথা লিখিয়াছিল—আপনিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আপনার কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে একটা বিরোধ আছে—সেই বিরোধ সর্বপ্রকারে আপনাকে ছোট করিয়া ফেলিতেছে। আমি আপনাকে সত্যই শ্রদ্ধা করি—আপনার বিধিদত্ত শক্তিকে বিশ্বাস করি তাই দুঃখ পাই। অনেকদিন ধরিয়া বৈষয়িক কারণে অত্যন্ত ছোটদের সহিত সংসর্গ, এবং তাহাদের অসন্তোষের ভয়ে আপনি নিজ চিত্তের প্রসন্নতা হারাইয়াছেন। ঐ কবিতায় কোনো বিশেষ ব্যক্তির সম্বন্ধ যে নাই তাহা আমি জানি। সজনী যাহাই বলুক সেই তো এখন নাটের গুরু হইয়াছে

এই চিঠিতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা না অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে?

মোহিতলাল।

॥ ৩৮ ॥

বড়িশা,
ইং ১৩/১০/৫১

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার বিজয়ার সম্ভাষণ পাইয়াছি। আমি বড় অসুস্থ ছিলাম—এখনও আছি; তাই এই বিলম্ব হইল। আপনি আমার ঐ-দিবসীয় নমস্কার-আলিঙ্গন জানিবেন।

'বাংলা ও বাঙালি' আপনি একখণ্ড পাইয়াছেন জানি—এবং শুনিলাম, বইখানির মুখবন্ধ যেমনই হোক—ভিতরটা ভালো লাগিয়াছে।

'রবীন্দ্রনাথ' আপনি কয়েক পৃষ্ঠা (ছাপা ফাইল) দেখিয়াছেন, এবং প্রশংসাও করিয়াছেন—তজ্জন্য ধন্যবাদ। উহার প্রথম খণ্ড[১] শীঘ্র বাহির হইবে—আশা করি তাহাতে আরও 'নূতন' কিছু পাইবেন।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আপনার
মোহিতলাল

১। কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৯।

॥ ৩৯ ॥

বড়িশা
২১/১০/৫১

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার কার্ড পেলাম। পূর্ব্বপত্রের উত্তর দিই নি কারণ, আপনি বলেছিলেন, কলকাতায় থাকবেন না—ফিরে এসেছেন কিনা জানতাম না। আমার শরীর বড় খারাপ হয়েছে—বায়ু ও প্রেসার দুই-এরই সমান বৃদ্ধি হওয়ায় বড় কাবু হয়ে পড়েছি। কোনো রকমে হাতের কাজ দৈনিক কিছু কিছু করে যাচ্ছি।

আপনার নূতন কাব্যসংগ্রহ পেয়েছি। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, আপনার কবি-পরিচয় এ কবিতাগুলিতে নেই না ছাপালেই ভালো হত। আপনার ভূমিকা পড়েছি দেখা হ'লে বলব। আমার বোধহয়, আপনার কবিতা-লেখা বন্ধ করাই ভালো। কথাটা বড় রূঢ় হ'ল, কিন্তু আমি আপনার কবিতার অনুরাগী, এবং আপনার বন্ধু বলেই একথা বলছি। 'মধুসূদন' নামে যে কবিতাটি লিখেছেন—সেটা না ছাপাই উচিত ছিল।

আপনি যে বিষয়ে আমার মত জানতে চেয়েছেন, সে কি ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করবারও যোগ্য আমাকে অনেক আগে বহু পত্রাঘাত করেছিল যদি সাক্ষাতে এ প্রস্তাব করত তবে জুতা মারিয়া তাড়াইয়া দিতাম। আপনি লিখেছেন—বড় ছোট সব সাহিত্যিক—তারাশঙ্করও রাজি হয়েছে। এতে বুঝতে পারছেন, আমি কেন ওদের সঙ্গ ও সমাজ একেবারে ত্যাগ করেছি। বাংলা সাহিত্যের কি আর জাত আছে ওদের কুষ্ঠরোগ হয়েছে। ছি! ছি ওরা যে এতদূর উচ্ছন্ন গিয়েছে, তা আমিও জানতাম না। সংবাদটা সত্যি হ'লে আমি যেখানে হোক, ওদের ঐ কীর্ত্তি জাহির করে দেবো। কিন্তু দিল্লির ওই প্রকাশকেরা ব্যবসায়ের কি ফাঁদই পেতেছে। অনেক টাকা মারবে ওরা। এমন প্রস্তাব যারা করেছে—তারা জানে, এ দেশের সকল্ সমাজেই—মহাপুরুষ থেকে চোর-গাঁটকাটা পর্যান্ত সবাই এক জাতের মানুষ একটুকু ধর্ম্ম ও আত্মসম্মানবোধ কারো নেই।

'রবীন্দ্রকাব্য' নিয়ে বড় বিব্রত আছি। আপনাদের কাউকে মাঝে মাঝে শোনাতে পারলে ভালো হত। কিন্তু উপায় নেই।

ভালোবাসা জানবেন। ইতি

আপনার
মোহিতলাল

সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর ও বনফুল

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীল কুমার দে

॥ ৪০ ॥

বড়িশা পোঃ
ইং ১৪/১২/৫১

সুহৃদ্বরেষু,

ভাই কালিদাসবাবু, ছেলের হাতে আপনার ঐ পত্র পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। আপনার জীবনের একটা বড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তাহাতে মনে হয়, এখন জীবনের একটা fresh lease আপনি পাইয়াছেন। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন।

আরও কিছুদিন পরে সম্পূ- সুস্থ হইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আশা করি আমি [আপনি] ক্রমেই শরীরে বল পাইতেছেন। আপনার ঐ অসুখের আক্রমণটা আমার নিকটে এখনও দুর্জ্ঞেয় হইয়া আছে। উহার নাম কি ? সে সব কথা পরে শুনিব।

আপনি আমার নমস্কার ও স্নেহালিঙ্গন জানিবেন।

ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

॥ ৪১ ॥

বড়িশা
২৯/৩/৫২

সুহৃদ্বরেষু,

পত্র পাইয়া সুখী হইলাম আমারও শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়াছে—এমন করিয়া আর বেশিদিন চলিবে না, তাহা বুঝিতেছি।

আপনার পত্রে অনেক সংবাদ পাইলাম—আর কিছুতেই রুচি নাই। সকলেরই দর্প অভ্রভেদী হইয়াছে—লালসায় বহ্নিও ঘৃতাহুতি পাইতেছে সমস্ত বাংলা দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির কংগ্রেসী রূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে ঐ অধর্মের ভণ্ড আভিজাত্য, আরেক দিকে কম্যুনিষ্টের নগ্ন বস্তুবাদ। শেষ পর্য্যন্ত ঐ অঘোরপন্থীদেরই জয় হইবে। সবচেয়ে ঘৃণা—ঐ ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের পদাশ্রয় লাভ করিয়া এই দারুণ দুর্যোগে যাহারা রক্ষা পাইতে চায়—ইহারাই সাংঘাতিক। বড় থেকে ছোট সকলেই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কাজেই এই শয়তানী চক্রের গতিরোধ করা যাইবে না। এহেন সমাজে, এবং আমার এই মরণাপন্ন অবস্থায় নূতন করিয়া কোনো পত্রিকা প্রচার করা বাতুলতা নয় কি অনেকদিন হইতে ঐ প্রস্তাব চলিতেছিল, এক্ষণে আমাকে বড় ধরিয়া পড়িয়াছে। আমি এখনও দ্বিধাগ্রস্ত আছি—অথচ বৈশাখের মধ্যেই বাহির করা স্থির হইয়াছে। খুব ছোট পত্রিকা[১]—চালানো খুব দুরূহ নয় তবু—অনেক কারণে আমি ইতস্তত করিতেছি। যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে আপনাকে জানাইব।

কালীপদ ঘটক একজন সম্পূর্ণ নবীন লেখক—তাহার সহিত পূর্ব্বে পত্রে আমার পরিচয় হইয়াছিল। ঐ প্রাইজটা—একটা কংগ্রেসী-নীতির চাল, উহার সহিত বাংলা সাহিত্যের কোনো সম্পর্কই নাই।

আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন।

আপনার মোহিতলাল

পুঃ প্রমোদ চাটুয্যে[২] মহাশয়ের ঠিকানা কি ? কখন বাড়ি থাকেন দেখা হইতে পারে কি

১। 'বঙ্গভারতী' মাসিকপত্র।

২। 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'র লেখক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৭৯)।

॥ ৪২ ॥

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং /৪/৫২

ভাই কালিদাসবাবু,

পত্র পাইলাম আপনিও আমার নববর্ষের ভালোবাসা আলিঙ্গন জানিবেন।

কাগজের সংকল্প যাহাদের তাহারা এখনও আমাকে ত্যাগ করে নাই, বরং আয়োজন সুরু করিয়াছে আমি একটু ভাবনায় পড়িয়াছি মনে হইতেছে ইহা একটা দৈব নির্ব্বন্ধ যদি বাহির হয়, এখনও একটু বিলম্ব আছে—বৈশাখে হইবে না।

সংবাদটায় নাকি স্থানবিশেষে বড় উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে একজন ইতিমধ্যে ভাংচি দিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। মাছিগুলাকে বলিবেন—কোনো ভয় নাই তাহাদের বিষ্ঠাভাণ্ডের কোনো ক্ষতি হইবে না—ভরাইবার লোকেরও অভাব হইবে না তবে আমার কণ্ঠরোধ করিতে পারিল না বলিয়া যদি দুঃখিত হইয়া থাকে তবে একথা তাহারা যেন স্মরণ রাখে যে, আমার কণ্ঠরোধ করিতে তাহাদের পিতারাও পারিবে না। সে কণ্ঠের বাহন আরও বড়। কুকুর ঠেঙাইবার জন্য কোনো পত্রিকা সম্পাদন করিতে আমার আর কিছুমাত্র আগ্রহ নাই

আশা করি আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন এবং কাজকর্ম ভালই করিতেছেন।

আমার স্নেহালিঙ্গন শুভইচ্ছা জানিবেন

ইতি
আপনার
মোহিতলাল

শেষ

In every issue we cover from the Himalayan peaks to the Comorin cape with REPORTS from our correspondents; points of DISCUSSION are raised and research DOCUMENTATION in forms of essays with a different DIMENSION are projected; DIALOGUES with important personalities in art, literature and science are recorded; perceptive stories by Indian, black American and African writers are given priority in the pages for LITERATURE; the polity, economy and cultural events including new books are commented upon and analysed.

WE DON'T CATER TO A CHILD EVEN IF HE IS AN ADULT

সাহারার আগুনের ভিতরে

বিপ্লব দাশগুপ্ত

বাইশ

ডাকাতের হাত কেটে ফেল, চরিত্রহীনকে পাথর ছুঁড়ে খুন করো, অন্য অপরাধীদের চাবুক মারো—এসব বিধানই এখন বর্বর মনে হবে। কিন্তু সেই যুগে অন্য ধর্মাবলম্বী রাজ্যগুলোতেও এই ধরনের বর্বরতা কম ছিল না। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার এক কঠোর ব্যবস্থা।

শুধু শৃঙ্খলাবোধই ইসলামে বড় কথা ছিল না। তাই যদি হতো তাহলে ইসলাম এত ছড়িয়ে পড়তো না। পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই তখন নানা শ্রেণী-খণ্ড জাতিগত ভেদাভেদ। ইসলামই বললো, সমস্ত মুসলমান এক। বার্বার মুসলমান হয়ে আরবের সমান হলো, ভারতের অস্পৃশ্য পদদলিত হিন্দু মুসলমান হয়ে অনেকটা আত্মমর্যাদা পেল। এটাই ছিল ইসলামের এক বড় আকর্ষণ।

ইসলামের শৃঙ্খলা, ঐক্য, সর্বজনগৃহীত জীবন পদ্ধতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লো। একটা ধারণা আছে, ইসলামের জয়ের কারণ খোলা তলোয়ার। বহু ক্ষেত্রেই সেটা ঠিক নয়। ব্যবসা যত বেড়েছে, ইসলামের প্রভাবও বেড়েছে। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায়, সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকায় বা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে।

পরে, যেমন হয়, ইসলাম নানাভাগে ভাগ হয়েছে। শিয়া-সুন্নি দলের সঙ্গে, আহমফিয়া, ইসমাইলী, ড্রুজ, বাহাই—এইসব উপধর্ম এসেছে। ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে, খলিফত্বের উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ—শ্রেণীভেদ ঢুকেছে, বিলাস এসেছে। আক্রমণকারী জাতির শ্রেণী আলাদা, পরাজিত মুসলমান হলেন নীচু, সৈয়দ, পয়গম্বরের বংশধর, যেন ব্রাহ্মণ। সুরা সাকী, জাঁকজমক কখনও কখনও বড় হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ হয় নি এমন নয়। আলমোয়াত্তিক, খারিজিষ্টি এইসব প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল সাধারণ গরিব মুসলমান চাষী, যারা এই শ্রেণীভিত্তিক রাজসিক বিলাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থার গতিকে সনাতনী ধারণা দিয়ে অন্যমুখী করতে চেয়েছে। কিন্তু নতুন নেতৃত্বেও শেষ পর্যন্ত ঘুণ ধরেছে—শ্রেণীভেদ আর বিলাস এসেছে।

আজ ইসলামের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা, বিংশ শতাব্দীর সমাজের আলোকে সনাতনী ইসলামী চেতনার নতুন মূল্যায়ন। এই কাজ অনেকখানি এমনি এমনিই হচ্ছে। কখনো কখনো এর জন্য শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়েছে। তুরস্কের জন্য প্রয়োজন ছিল কামান আতাতুর্কের মতো এক বলিষ্ঠ, জনপ্রিয় নেতার—যিনি ধর্মীয় বিধান আর রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে আলাদা করেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা করেছেন, মেয়েদের বোর্খা তুলে দিয়েছেন। টিউনিশিয়ার ফরাসি প্রভাব পরবর্তীকালে বোরগিবার সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকরী করতে সাহায্য করেছে। সিরিয়া এবং ইজিপ্টে একইভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে সংস্কার করা হয়েছে যাতে তালাক বা বহুবিবাহ সহজ না হয়, তালাকের পর খোরপোষ মেয়েরা পায়, মেয়েদেরও তালাকের অধিকার থাকে, এবং একটা বয়সের পর নিজের মতো বিবাহের অধিকার থাকে। হাত-পা কাটা, পাথর ছোঁড়ার বিধান খুব অল্প ইসলামধর্মী দেশেই এখন আছে।

এইসব প্রশ্ন নিয়ে স্বভাবতই মুসলিম দার্শনিক-চিন্তাবিদদের মধ্যে নানা বিতর্ক। নানা মোল্লার নানা মত। শরিয়াতের নানা ব্যাখ্যা। এই যে চারটে বিয়ের বিধান, অনেকে বলেন এটা বহুবিবাহের পক্ষে নয় বিরুদ্ধে, তখনকার অভিজাতরা ভারতের কুলীনদের মতোই প্রচুর বিয়ে করত—মহম্মদের উদ্দেশ্য ছিল সেই সংখ্যাটা কমানো। তিনি চেয়েছেন এমন বেশি বিয়ে না হোক, যার ফলে কোনো বৌয়ের বিরুদ্ধে অন্যায় হবে, বা—তাদের ভালোভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখা যাবে না। অনেকেই বলেন, ধর্মবলে বা চলে তার অনেকখানিই একটা দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ—ধর্মীয় অনুশাসন নয়। কজন দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ে, 'জাকত' বা ধর্মীয় কর দেয়, বা মক্কা যায় হজ করতে? কজন গান শোনে না? সুরাসক্ত ইসলাম অনুরাগীর সংখ্যা কত? যে কোনো ধর্মের মতো যুগের তালে ইসলামও পাল্টাচ্ছে।

শাহিদা বলে, "আজকাল মধ্যপ্রাচ্যে তুমি অনেকগুলো আলাদা ঝোঁক দেখবে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মগত চেতনায় আর ব্যাখ্যার পরিবর্তন হলো একটা দিক। আবার পপুলিষ্ট একটা দিকও আছে। বলতে গেলে চিরকালই ছিল। লিবিয়ার সানুসী আন্দোলন গোঁড়াপন্থী এবং জঙ্গী। এরা লিবিয়ার ইটালী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে খুব ভালো লড়েছে। নাইজিরিয়ার ফুলানী জিহাদও ঠিক সেইরকমের। ওরা চায় পুরনো ইসলামী ধর্মবোধে ফিরে যেতে—যেখানে বিলাস কম, আদর্শবোধ আর শৃঙ্খলা বেশি। কিন্তু অন্যদিকে এই চিন্তার মধ্যে রক্ষণশীলতা আছে। মেয়েরা পিছনে থাকুক, বোরখায় মুখ ঢাকুক, কোনো দায়িত্বশীল পদে মেয়েকে রেখো না। মেয়েদের সাক্ষ্য কোর্ট হয় নেবে না, নয় দুজন মেয়ের সাক্ষ্যকে একজন ছেলের সাক্ষ্যের মর্যাদা দেবে। তালাক, বহুবিবাহ, এইসব থাকবে।"

এই দুই ঝোঁকের দোটানায় আজকের লিবিয়া। গদ্দাফি তাই এমন অনেক আইন করেছেন যা মেয়েদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে, চেয়েছেন মোল্লাদের রাষ্ট্রশাসনের কাঠামোর থেকে বাইরে থাকতে। একই সঙ্গে তাকে বারবার বলতে হচ্ছে কোরান-পাঠের কথা, সনাতনী ইসলামের কথা, একটার পর একটা ব্যাপার নিয়ে জেহাদের কথা। সাধারণ ধার্মিক মানুষের সমর্থন না হলে ক্ষমতায় থাকা চলবে না, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র চালাতে গেলে সপ্তম শতাব্দীর মরু-জীবনের অনুশাসন মেনে চলা অসম্ভব।

ইসলামের যত প্রসার হয়েছে তত অন্য ধর্ম বা আচারের প্রভাব পড়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ বা মহাভারতের উপ্যাখ্যান লোকের মুখে মুখে। বাংলাদেশের বহু মুসলমান মেয়ে কপালে সিঁদুর দেয়, ঘোমটা দেয়। সাহারা-দক্ষিণের বহু দেশে ইসলামী ব্যক্তিগত জমি মালিকানার বদলে এখনও সামাজিক মালিকানা রয়েছে। টিউনিশিয়া বা তুরস্কে সাধারণ ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব চোখে পড়বার মতো। এই প্রভাব লিবিয়াতেও বাড়ছে—তেলের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে। সেই ছোট্ট ত্রিপোলি আর নেই। সাত লাখ মানুষের মহানগরীর কর্মব্যস্ত জীবন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থসর্বস্ব চিন্তা, মরুভূমির বেদুইন আর তুয়ারেগের জীবনেও যার প্রভাব। সময়ের কাঁটাকে ঠেকিয়ে রাখাও সহজ নয়। সেই মরুভূমিও

আর নেই।

সনাতনী চিন্তা আর আধুনিকতার দোটানায় এখন মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশই। আধুনিকতারও নানা বিপদ আছে। কুয়াইৎ, বাহরিন, কাতার, আবু-ধাবি, লিবিয়া—এখন প্রচুর টাকা ঢালে শিক্ষার জন্য। তেল সেই সুযোগ করে দিয়েছে, পৃথিবীর বহু দেশে ওদের ছাত্ররা। সেই শিক্ষা যেন শাঁখের করাত।

ইরানের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিল, শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে সমস্যাটা কোথায় ? ইরানের শাহ চাইলেন তেলের টাকায় ওই অনুন্নত দেশকে ইউরোপীয় মানে তুলতে। যন্ত্র সভ্যতার জন্য দরকার শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা। যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে ইউরোপে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেল তারা অভিজাত গোষ্ঠীরই সন্তান। অনেকেরই দেহে রাজরক্ত। কিন্তু দেশের বাইরে এসে বুঝলো আধুনিকতা আর রাজতন্ত্র একখাতে বইতে পারে না। দেশকে আধুনিক করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টাতে হবে—রাজতন্ত্র ভেঙে গণতন্ত্র আনতে হবে। ওরা দেশের বাইরে বিদ্রোহের পতাকা তুললো। বিদেশের যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরানী ছাত্র সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে উঠলো।

অন্য দিকে, আধুনিকতার ঢেউ সনাতনী ইসলামী চেতনাকে আঘাত করলো। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিসর্বস্ব জীবন পদ্ধতি, বিলাসিতা, আলোকজ্জ্বল হোটেল, বিংখো—এসব গরিব পিছিয়ে পড়া মুসলমান জাত মেনে নিতে পারলো না—সে কি পেল ? যে সামান্য ভূমিসংস্কার হলো আধুনিকতার প্রয়োজনে তাতে প্রগতিশীলরা খুশি হলো না, কিন্তু কায়েমী স্বার্থের এক বড় অংশ ক্ষুব্ধ হলো। রাজতন্ত্র থাকবে, অথচ ভূমি সংস্কার হবে, দেশ আধুনিক হবে, সেটা তো হয় না ?

ইরানে দুটো একেবারে উল্টো ধারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। বামপন্থী আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ছাত্ররা, এবং ধার্মিক, গোঁড়াপন্থী, সনাতনী আয়াতোল্লারা যাদের পিছনে বৃহত্তর কৃষক সমাজ। ইরানের শাহ ময়ূর সিংহাসন কেড়ে ইতিহাসের পাতা থেকে সরে গেলেন। শুরু হলো আয়াতোল্লা খোমেইনির রাজত্ব।

বহু পরে লন্ডনে শাহিদাকে জিগ্যেস করেছিলাম খোমেইনি সম্পর্কে। শাহিদা বলে, "খোমেইনি হলো বলতে পারো একটা ড্যাস। রাজতন্ত্র ভাঙলো, ইরান আধুনিক হবে মাঝের সময়টা হচ্ছে এখন। শাহের সময়কার অনাচার উৎপীড়ন, বিলাসের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হলো খোমেইনি। যেটা ভালোর দিক, ব্যক্তিবাদ, আড়ম্বর, বিলাস এসব কমেছে। কিন্তু যা এখন চলছে তা চলতে পারে না। এ যেন মধ্যযুগীয় মোল্লাতন্ত্র। ধর্ম আর রাষ্ট্র এক হয়ে গিয়েছে। আইন আলাদা নয়। খোমেইনির কথাই আইন। তেলের উৎপাদন কমছে, শিল্প বাড়তে পারছে না। উচ্চ শিক্ষা মার খাচ্ছে। আমি তোমাকে বলে দিলাম, খোমেইনি আর বেশিদিন থাকবে না।"

"ওখানকার মেয়েদের অবস্থা কি ?"

শাহিদা হাসে। বিজয়ীর হাসি, বলে, "খোমেইনি চাইলো মেয়েরা 'চাদর'-এ মুখ ঢাকুক, গোড়ালি অবধি পা ঢাকুক, রান্নাঘরে ফিরে যাক। কিন্তু পারল ? কখনো পারবে ? যে মেয়ে একবার 'চাদর' ছেড়েছে, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তাকে অন্তঃপুরে ঢোকাতে পারবে ?"

লিবিয়ায়, খোমেইনির প্রায় দশ বছর আগে, রাজতন্ত্রকে সরিয়ে গদ্দাফির নেতৃত্ব এসেছে। কিন্তু প্রাক গদ্দাফির লিবিয়া ছিল তুলনায় অনেক বেশি পশ্চাদপদ এবং রক্ষণশীল। ইরানে তেলের ইতিহাস এই শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে। লিবিয়ায় তেল পাওয়া গেল এই সেদিন। তাই তুলনাটা সহজ নয়। তবে দুই দেশেই তেল সনাতনী সমাজ ও তার মূল্যবোধকে ভেঙেছে। দুই দেশেই আবার আধুনিকতার বিরুদ্ধে সনাতনী চেতনা আর মূল্যবোধ ফিরে আসবার ঝোঁক বাড়ছে।

লিবিয়ায় আমার কাজ একদিন শেষ হলো। এসেছিলাম ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিশিয়া হয়ে। ফিরলামও অনেক ঘোরানো পথে। ত্রিপোলি থেকে জাহাজে মাল্টা, সিরাকুজা হয়ে নেপলস, সেখান থেকে ট্রেনে লন্ডনে। দু রাত জাহাজে থাকলাম। এবার জাহাজে কোনো লিবিয়ান 'ইন্ডিয়া গুড' বলে জড়িয়ে ধরলো না। সত্যি বলতে, ওই ধরনের লিবিয়ানের সঙ্গে লিবিয়ায় সাক্ষাৎ হলো না। জাহাজ যাত্রায় বিশেষ কিছুই ঘটল না। সমুদ্রের ঢেউ গুনলাম, সী-গালের ভিড় দেখলাম। মাল্টার বন্দরে রণতরীর ভিড় হয়তো তার থেকেও বেশি।

সেই শেষ দেখা লিবিয়া। সমুদ্রে একটা দেশে যাওয়া বা আসার একটা অন্য আমেজ আছে। জাহাজে ওঠার সময়টায় একটা রূপ। চোখে পড়ে ডক, সমুদ্র সৈকত, পিছনের বড় বড় বাড়ি, তার অনেক পিছনের নাফুসা পাহাড় বা মরুভূমি চোখে আসে না। তারপর একটু একটু করে সবকিছু মিলিয়ে যায়। প্রথমে পিছনের বাড়িগুলো তারপর ডক। নির্দিষ্ট ছবিগুলো যত মিলিয়ে যায়, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ে। কিন্তু দূরত্বের সঙ্গে সেটাও কমে। শেষ অবধি দিগন্ত জুড়ে একটা বড় রেখার বেশি কিছু থাকে না, তারপর সেটাও থাকে না।

যে কোনো দেশ সম্বন্ধে স্মৃতিটাও সেইরকমেরই। যত নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো ভুলছি তত পরিপ্রেক্ষিতের পরিসর বাড়ছে, লিবিয়া বাসের বহু ঘটনাই মনে নেই, বহু মানুষই মন থেকে মুছে গিয়েছে—কিন্তু, এই মুহূর্তে অন্তত তার ফলে হয়তো ক্ষতি হয় নি। এখন হয়তো লিবিয়া তাই অনেক ভালো বুঝি। গদ্দাফির পূর্বাভাস তখন বুঝি নি, এখন চোখে পড়ে। কালি আর তেল মিশে আজকার লিবিয়া—সেই তাৎপর্যটাও হয়তো এখন আরো বেশি পরিষ্কার। কিন্তু কিছুদিন পর, অবস্থায়মান দিগন্তের রেখার মতো এই স্মৃতিটাও থাকবে না।

লন্ডনে ফিরে গিয়েও লিবিয়া ভুলি নি। কাজ তারপরও চলেছে। আমাদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বই প্রকাশ হয়েছে, মাঝে মধ্যে তারপরও লিবিয়া থেকে আসা মানুষের সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা হয়েছে। কিন্তু একজন ইজিপ্সিয়ান বা আলজিরিয়ানের সঙ্গে যত সহজে বন্ধুত্ব হয়েছে ততটা হয় নি, কারণ জানি না—হয়তো ব্যাপারটা সংস্কৃতিগত।

আলজিরিয়ার সঙ্গে তুলনাটা স্বভাবতই আসে। প্রায় পাশাপাশি দেশ, মাঝে অবশ্য টিউনিশিয়ার অংশ। দুটোই মাঘারা উত্তর আফ্রিকা—বার্বার এবং আরব। দুটো দেশেই প্রায় সবরকম আক্রমণকারী এসেছে—ফিনিশিয়, রোমান থেকে আরব, তুর্কমান, ফ্রেঞ্চ বা ইটালীয়ান, দুটো দেশের মানুষেরই ধর্ম ইসলাম—দুটো দেশেই প্রচুর তেল আছে। দুটো দেশেরই এক বড় অংশ সাহারা।

তবু লিবিয়া আর আলজিরিয়ার থেকে আলাদা দুটো দেশ ভাবা যায় না। পার্থক্য সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক ঐতিহ্যে, অর্থনীতির বিন্যাসে, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার ব্যবধানে।

লিবিয়া যাত্রার পরও মাঘারের আফ্রিকায় দুবার গিয়েছি। দুবারই আলজিরিয়ায়—১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে। লিবিয়া যাবার পথের অভিজ্ঞতা ধরে, এই কিন্তু আলজিরিয়ায় তিনবার গেলাম। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৬—এই সাত বছরে ওখানেও কম পরিবর্তন হয় নি।

সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী এখন লিখছি।

॥ বারো ॥ আবার আলজিরিয়ায়—১৯৭৪ ॥

আলজিয়ার্স এয়ারপোর্টে এক দঙ্গল লোক নিয়ে আমরা নেমে দেখি আমাদের অভ্যর্থনার কোনো ব্যবস্থা নেই। কেউ জানেও না আমরা আসব, বা আমরা কারা। কারো আমাদের নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই রোমিলি কোথায় ?

সাল ১৯৭৪। আমার লিবিয়া বাসের পাঁচ বছর পর। ততদিনে আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সাসেক্সে। সঙ্গে যারা তারা নানান দেশের। অধিকাংশই আফ্রিকান বা আরব। ইউরোপীয় কয়েকজন, মার্কিনি জনা তিনেক, এশিয়ানও আমাকে আর আরতিকে নিয়ে তিনজন—বাকিজন হংকং-এর, মার্কিনি জোনাথনের বৌ, চাইনীজ, নাম এ্যান, এই দলে আরো একজন এ্যান রয়েছে—প্রশাসনের কাজে।

আলজিরিয়ার এই দ্বিতীয় দফায় পাওয়া এক সেমিনার উপলক্ষে। ছয় সপ্তাহ ধরে সেমিনার—চার সপ্তাহ ব্রাইটনে, এবং বাকি দু সপ্তাহ আলজিয়ার্সে হবার কথা। বিষয় ধাতু রপ্তানিকারী দেশগুলোর সমস্যা। মূল জোরটা তেলের ওপর, কিন্তু অন্য ধাতুও রয়েছে। যেমন জাম্বিয়ার ক্ষেত্রে তামা, জাইরের ক্ষেত্রে হীরে। আমরা চেষ্টা করছি বুঝতে, নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই সব দেশগুলোর সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনো সাধারণ সূত্র রয়েছে কিনা ? এমন কোনো কোনো সত্য আছে কিনা যা সোনা, তামা, লোহা, হীরে, সবার ক্ষেত্রেই চলবে ? সেই সূত্র খুঁজতে চার সপ্তাহ ধরে নানা তর্ক আর আলোচনা, তর্ক আর ফুরোয় না। এখন আমরা ভাবছি, যা ব্রাইটনে হলো না, আলজিয়ার্সের দু সপ্তাহে কি সেই সমাধান পাব

সমাধানের সন্ধানে না হয় আরো দু সপ্তাহ দেয়া গেল, কিন্তু রোমিলির সন্ধান পাব কি

রোমিলি কে ? বা রোমিলি কি একটা আনুষ্ঠানিক পরিচয় হলো, এখানকার পরিকল্পনা দপ্তরের এক বড় কর্তা, কিন্তু আমার কাছে রোমিলি অনেক কিছু—বলা যায় উত্তর আফ্রিকার এনসাইক্লোপিডিয়া। মানুষটা পাগলাটে, খামখেয়ালি, কথার ঠিক নেই, সময় রাখে না, এ সবই সত্য, কিন্তু তর্কের আসরে অন্য মানুষ ঠাণ্ডা মাথা, ভারসাম্য রেখে কথা বলে, হৈহৈ বলতে হয় বলে কিছু বলবে না। এ যেন দুটো আলাদা মানুষ।

কিন্তু আপাতত আমার দরকার ভারি অফিসার রোমিলিকে। তার্কিক রোমিলিকে না হলেও হবে অথচ এয়ারপোর্ট তন্ন করে খুঁজেও ওকে পেলাম না, কয়েকবার লাউঞ্জ চষে বেড়ালাম, আনাচে কানাচে দেখলাম রেস্টুরেন্ট, টয়লেট ঘুরে এলাম এনকোয়ারিতে বলে ওর নাম ঘোষণা করালাম তবু ওকে পাওয়া গেল না। মানুষ খোঁজা এমনিই খুব শক্ত, বিশেষ করে এয়ারপোর্ট, যেখানে গলগল করে মানুষ ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

এক মুখ দাড়ি-গোঁফ আর গলায় ঝোলানো লকেট আর মালা, আর পাশে

মরুভূমিতে উটের জল খাওয়ার জায়গা

মেয়েকে নিয়ে ডাডলি বসে। ওর যেন কোনো মাথাব্যথা নেই অথচ এই সেমিনারের ডাডলি ডিরেক্টর, আমি ওর সহকারী ডিরেক্টর। এই সংকট, এতগুলো মানুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে, মানুষজন চিনি না, ভাষা বুঝি না, কোথায় যাব ঠিক নেই—কিন্তু এর মধ্যেও নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে ডাডলি বসে। ভাবখানা যেন শেষ অবধি কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু কে করবে সেই ব্যবস্থা!

এয়ারপোর্ট আর রেলের স্টেশন—দুটোই যাতায়াতের জন্য। কিন্তু কি বিরাট তফাৎ। যেন নিউ মার্কেট আর বৈঠকখানা বাজার। এখানে হৈ চৈ নেই; আন্তরিকতা নেই, ভীড়ও তুলনায় কম। সবকিছুই যেন নিক্তিতে মাপা সাজানো গোছানো। মানুষগুলো আলজিরিয়ার হোক, ফ্রান্সের হোক বা ভারতের হোক যেন একই ছাঁচের তৈরি। প্লেন থেকে নেমে হেলথ কার্ড দেখানো, ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলে পাশপোর্টে ছাপ মারানো তারপর মালের জন্য অপেক্ষা। মাল আর আসে না। এখন সুপার সনিক জেটে চোখের পাতা না পড়তেই তুমি বাতাস কেটে দূর দূরান্তরে পৌঁছে যাবে। যারা এই প্লেনে যায় তাদের প্রতিটি লহমার মূল্য অনেক! কিন্তু সেটা শুধু অন্তরীক্ষে। ডানা কাঁপিয়ে মাটি স্পর্শ করে প্লেন দাঁড়াবার পর সময়ের আর মূল্য নেই। অনেকে তাই বলবেন উড়ন্ত সময় গতি দিয়ে কমিয়ে লাভ কি, যদি না সঙ্গে মাটির ওপরের সময়টাও কমানো যায়! বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক শক্ত জিনিশ পারে, কিন্তু একেবারে সহজ ব্যাপারগুলো যেন ওদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান তাই যক্ষ্মা রোগের নিয়ামক কিন্তু সর্দি সারাতে পারে না। বিজ্ঞান তাই জলের তরঙ্গ ভেঙে বিদ্যুৎ বানায়, কিন্তু অফুরন্ত সূর্যের আলোকে কাজে লাগায় না। উড়ে যাবার সময় কমানো যায়, কিন্তু হাঁটাপথে সময় কমে না।

এত রকম চিন্তা করেও যখন রোমিলি এল না, এবং প্রায় ফিরতি প্লেনের খোঁজখবর করতে যাব, ঠিক তখনই রোমিলির উদয়। হন্তদন্ত, আলুথালু ভাব, সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ হাসি। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে দু গালে দুই চুমু—যেটা আরব পুরুষদের এক বিশ্রি অভ্যাস। তারপর এক বিরাট ব্যাখ্যা—কেন দেরি হলো, কোথায় আটকাল, কি বিরাট ঝামেলায় পড়েছিল, তবু কি করে কেটে বেড়িয়ে এল, না হলে আরো কত দেরি হতো—এই সব। আমি বললাম, "এমনিই অনেক দেরি করিয়েছ, দারুণ খিদে পেয়েছে, এখন এই সব বাজে কৈফিয়তে সময় নষ্ট কর না।"

সঙ্গে সঙ্গে এয়ারপোর্টের মধ্যেই চা আর স্ন্যাকস এল। ডাডলি ওর ধ্যান ভঙ্গ করে নড়ে চড়ে বসল। ওর মেয়ে 'কারণ' মুভি ক্যামেরা বের করে এয়ারপোর্টের মধ্যেই গ্রুপের ফটো নিল। পিটার বলল, "ফিল্ম আছে তো?"

কারণ বলল, "সাট আপ।"

হেলেন বলল, "ইস, আমার পারফিউমটা তো ফটো তোলার সময় লাগাতে ভুলে গেলাম।"

কারণ বলল, "সাট আপ।"

রোমিলি বলল, "তোমার ক্যামেরাটা দেখে বন্দুক মনে হতে পারে। সত্যিই ক্যামেরা তো?"

কারণ, "সা—" বলে রোমিলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল। সবাই হেসে উঠল।

মোট কথা রোমিলি আসতেই যেন আসর জমে উঠল। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের উপস্থিতিই যেন চারপাশে মুঠো মুঠো আনন্দ ছড়ায়।

আমার মনে পড়ে গেল পাঁচ বছর আগে স্থলপথে আলজিরিয়া ঢোকার অভিজ্ঞতা, এবং বর্ডার চেক পোস্টে অফিসারের মুখে নেহরু, দারা সিং-এর কথা, এবং কফিসহ আতিথেয়তা। রোমিলিকে দেখে যেন সেই আতিথেয়তার আমেজ আবার পেলাম।

আলজিয়ার্স থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, সেই হোটেল কমপ্লেক্স সরকারি টাকায় চলে। একপাশে যত দূর চোখ যায় আঙুরের ক্ষেত। মাপা উচ্চতা, সমান দূরত্ব, সাজানো গোছানো, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আরেক পাশে লেগুন, পাথর দিয়ে বাঁধানো বসবার জায়গা। বহু রাত পর্যন্ত সোপানে বসে লেগুনের জলে পা ডুবিয়ে গল্প করা যাবে। সবুজ ক্ষেত আর নীল জল, মাপে ধবধবে শাদা প্রাসাদোপম হোটেল। ওদের শাদা রঙটা খুব পছন্দ।

বাসে যেতে যেতে রোমিলি বলল, "খুব গণ্ডগোল।"

"কেন?"

ধারাবাহিক

বৈতরণীর খেয়া

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পুণ্যার্থীদের বৈতরণী পার করাচ্ছিল গৌরহরি ঠাকুর। আসলে মেদিনীপুরের গৌরহরি চক্কোত্তি। ফি বছর এ সময় ও সাগরে আসে। পুণ্যও হয়, রোজগারও হয়। এবারও এসেছে। কোত্থেকে একটা বকনা জোগাড় করে তাকে গুঁতিয়ে গাঁতিয়ে এক হাঁটু জলে নামিয়েছে। বকনার গলায় গ্যাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়েছে। কপালে জ্যাবজেবে করে সিঁদুর মাখিয়েছে। তারপর—

হ্যাঁ, লেজ ধরো দিদিমা। নানা, ওভাবে নয়, শক্ত করে ধরো। ধরে একটা ডুব দাও দেখি ; কোনো ভয় নেই, ডুব দাও না।

গৌরহরি এবারি তার দশ বছরের ছেলেটাকেও সঙ্গে এনেছে। খানিকটা দূরে বালির ঢিবির ওপর সে দাঁড়িয়ে জুল জুল করে মজা দেখছিল। দু' কাঁধে তার ব্যাগ ঝুলছে। একটায় বাপের জামাকাপড়, আর একটায় দানের সামগ্রী আর টাকাপয়সা।

এছাড়া প্রতিবারের মতো এবারও একটা দালাল লাগিয়েছে গৌরহরি। পুরনো জানাশোনা লোক, সারাক্ষণ মুখে যেন খই ফোটে। একবার পেছনে লাগলে আর ছাড়ান নেই।

ছোকরাটার নাম কালু। সেই সকাল থেকেই কালুরও ব্যস্তার শেষ নেই। আসুন মাসিমা, এদিকে আসুন, এখানে। মনে রাখবেন, গঙ্গাসাগর একবার। জীবনে বার বার এ তীর্থ হয় না মাসিমা। এসেছেন যখন স্নান করে যান, বৈতরণী পার হয়ে যান।

—বৈতরণী পার ? সে আবার কী ?

কালু গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো বুঝিয়ে চলে, জীবন কী, মৃত্যু কী ? মৃত্যুর পরই কী সব শেষ হয়ে যায়, না, মৃত্যুর পরও কিছু আছে ? আছে মাসিমা, আছে। স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম এসবের কথা নতুন করে কিইবা আর বলব। জীবনের পাপ কী এক জন্মেই শেষ হয় ? হয় না, জন্ম জন্মান্তর যাবে, তবে যদি মুক্তি আসে।

ওদিকে গৌরহরি এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে তখন বৈতরণী পার করাচ্ছিল। বৃদ্ধার একহাত বকনার লেজে, অন্য হাত গৌরহরির বাহুতে। দেখিস বাবা পার হতে গিয়ে জীবনটা যেন না যায়।

—না না দিদিমা। কোনো ভয় নেই। এই গৌরহরি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনি নির্ভয়। তাছাড়া কিইবা এমন বয়স হয়েছে আপনার ! সেবার একশ' দশ বছরের এক বুড়োকে পার করিয়েছিলাম। মহারাষ্ট্রের লোক, না বোঝে কথা, না কখনো এসেছে সাগরে। কি দিকদারি বলুন তো !

—একশ' দশ !

আজ্ঞে, তাই তো বলেছিল ওরা। গোটা একটা পরিবার নিয়ে সাগরে এসেছিল। বুড়োর এক মেয়েও সঙ্গে ছিল, তার বয়সও আপনার চেয়ে বেশি। অমন দীর্ঘজীবী লোক দেখে মন ভরে গিয়েছিল দিদিমা। দিদিমার চোখ চিকচিক করে ওঠে, না বাপু, অতদিন বাঁচা ভালো নয়। যত বাঁচা তত শোক পাওয়া।

গৌরহরি একবার দিদিমার চোখের দিকে তাকায়, শুকনো চোখ, নাকে আর কানের পাশে চশমার দাগ। জলে নামার আগে চশমাটা ওর মেয়ের কাছে রেখে এসেছিল। বৃদ্ধার সঙ্গে শুধু মেয়েই নয়, আরো কয়েকজন আছে। তারা পারে দাঁড়িয়ে কাণ্ড কারখানা দেখছিল ওদের।

গৌরহরি বলল, শোকতাপ তো থাকবেই দিদিমা। জীবন মানেই তো শোকতাপ। আর সে জন্যই তো কিছু পুণ্যের কাজ করে যেতে হয়। মৃত্যুর পর যখন বৈতরণী পার হয়ে বিষ্ণুলোকে যাবেন, তখনকার কথা ভাবুন।

—কী কথা ?

গৌরহরি এবার জ্ঞানী সর্বজ্ঞর মতো একটু হাসে। মৃত্যুর পর আত্মা তো আর স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। মনুষ্যলোক আর যমলোক, এই দুই লোকের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে ছিয়াশি হাজার যোজন। এই পথ অতিক্রম করে যমপুরীতে যেতে আত্মার সময় লাগে কতদিন জানেন ?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন দিদিমা। বিস্ময় ছাড়া কিছুই আর ধরা পড়ে না চোখে।

গৌরহরি বলে, তিন'শ আটচল্লিশ দিন, মানে একবছরই বলতে পারেন আর কি ! আর এই তিন'শ আটচল্লিশ দিনে ষোলোটি পুরী অতিক্রম করতে হয় আত্মাকে। সংসারে কেউ যদি সৎকর্ম না করে থাকে, তাকে অপার কষ্ট ভোগ করতে হয় এইসব পুরীতে। সে কষ্টের কথা পুরাণে লেখা আছে। পুরাণ পড়েন নি ?

দিদিমার বাকরহিত হয়ে গিয়েছিল। স্বর্গ নরক আত্মা অবিশ্বাস করার কথা নয়। রক্তের সঙ্গে যেন ওরা মিশে আছে। বললেন, তা বাপু সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এই গোরুর লেজ ধরে দুটো চারটে মন্ত্র বললেই কী সব পাপ খণ্ডন হবে ?

—তা কি কখনো হয় দিদিমা ! তবে বৈতরণী নদীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। দুর্গন্ধে ভরা, পুঁজ রক্তে টুবু টুবু ভয়াল নদীব পার হতে হয় যে আত্মাকে। আপনি যদি গোদান না করে থাকেন, ওই নদী পার হওয়ার সময় খেয়ায় উঠতে পারবেন না দিদিমা। ঠাট্টা নয়, পুরাণ পড়ে দেখুন।

বৃদ্ধা বলেন, কি জানি বাপু ! বলছ যখন, কী করতে হবে বল ?

দিদিমাকে বৈতরণী পার করায় গৌরহরি ! বকনার লেজ শক্ত মুঠিতে ধরে রেখে নোনা জলে ডুব দেন দিদিমা। তোতাপাখির মতো মন্ত্র পড়েন। তারপর ধীরে ধীরে ভেজা কাপড়ে জল থেকে উঠে পারের দিকে এগিয়ে যান।

গৌরহরি খুশিই হয়। দিদিমা তার পরনের ভেজা কাপড়টা অবধি দিয়ে যান গৌরহরিকে। গৌরহরির ছেলে বিশু কাপড়টা নিংড়ে তার ব্যাগে ঢোকায়। করকরে কুড়ি টাকার একটা নোট গোরুর মূল্য হিশেবে পাওয়াও কম কথা নয়। টাকাটা যত্ন করে পকেটে ঢোকায় বিশু।

বালিয়াড়ির ওপর মেলার চেহারাটা আরো খোলতাই হয়েছে ততক্ষণে। ভোরের দিকে বেশ কুয়াশা গড়াচ্ছিল। একে কুয়াশা তায় ঠাণ্ডা। গায়ে যেন আলপিন ফুটিয়ে দিচ্ছিল ঠাণ্ডায়। স্নানার্থীরা অবশ্য ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই শেষ রাত থেকে সাগরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওদিকে মাইকের ঘোষণারও কামাই নেই। অনর্গল বকবক করে কি সব বলে যাচ্ছে, কে খেয়াল রাখে। রাখার সময়ও ছিল না

ছবি সুব্রত চৌধুরী
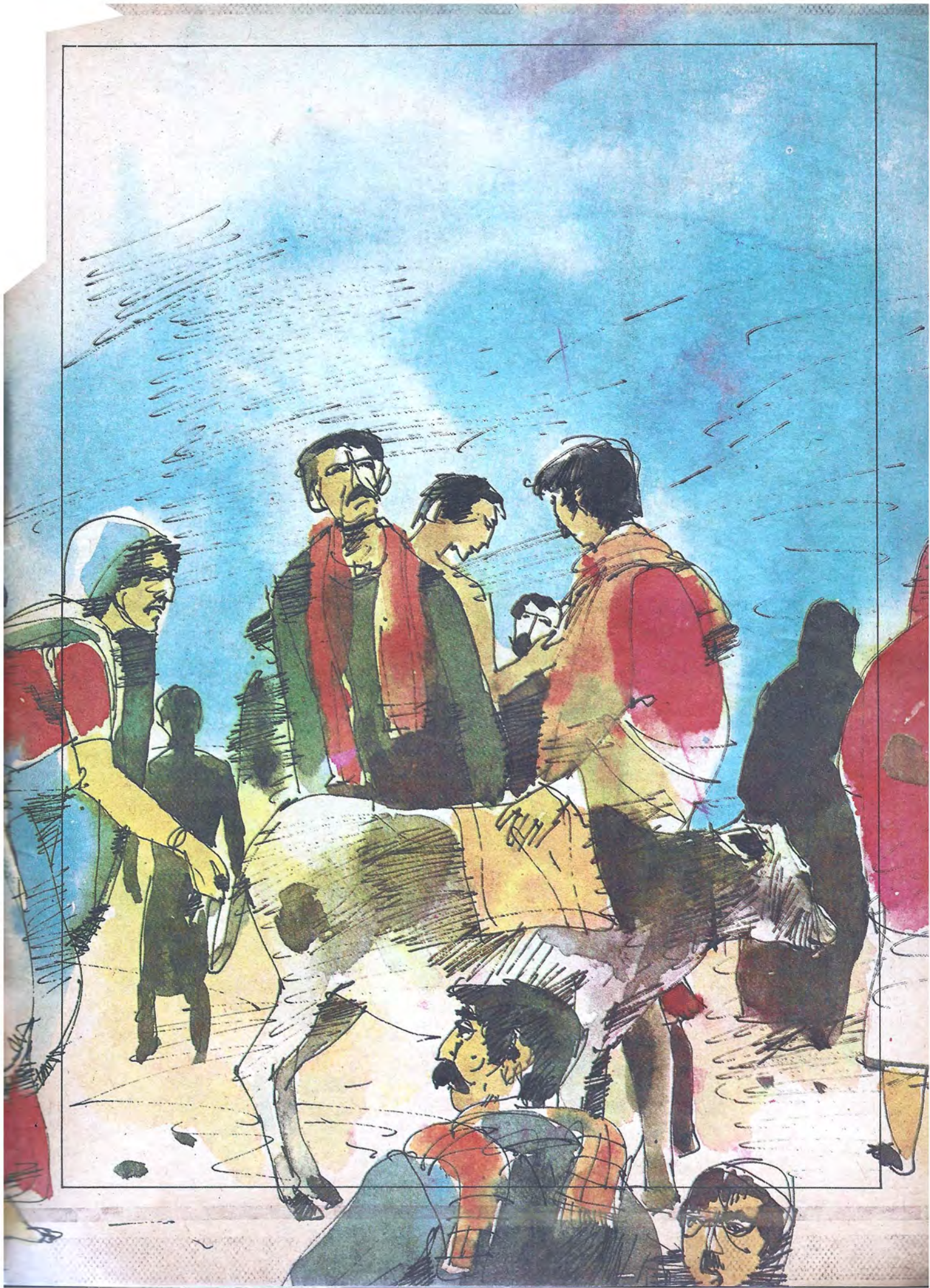
কারো। স্নানের জন্যই তো সাগরে আসা। এই ভিড়ের মধ্যে একটু আধটু জায়গা করে নিয়ে তিনটে ডুব মারতে পারলেই বাঁচা যায়।

গৌরহরি চারপাশে একবার তাকিয়ে নিল। এখন সূর্যের তাপে বালি তাততে শুরু করেছে। বালিয়াড়িতে চিটপিটে গরম শুরু হয়েছে, কিন্তু সাগরের জলে করাতের মতো ঠাণ্ডাটা যেন মরে নি। শেষ রাত থেকে এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৌরহরি যত কষ্টই পাক, সব যেন তার পুষিয়ে যাচ্ছিল। গতবারের তুলনায় রোজগার কি এবার কম হচ্ছে, আদৌ না। মনে মনে বেশ উৎসাহই পাচ্ছিল গৌরহরি।

ঢেউ পড়ল, আবার দু'জনকে নিয়ে বোঝাতে বোঝাতে এগিয়ে আসছে কালু। বাঙালি নয়। বাঙালি হলে বোঝাতে সুবিধে হয়। অবাঙালিদের অধিকাংশই এসেছে গাঁ গঞ্জ থেকে, একেবারে দেশওয়ালি মাল। শুকনো ছাতুরুটি খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারে ওরা। বেশ আছে। গৌরহরিদের দু'বেলা পেট বোঝাই ভাত হলে চলে না। আজও শেষ রাতে এক পেট খেয়ে তবে এ জলে নেমেছে বকনা নিয়ে। আর দু'তিনেক ঘণ্টা কাটাতে পারলেই যার বকনা তাকে ফেরত দিয়ে বাঁচে

কালু ওদের নিয়ে জলের ধার অবধি এগিয়ে এল। আধা হিন্দী আধা বাংলায় ও বউদুটোকে বলল, এই হামারা মহারাজ, গাইয়া লেকে খাড়া হায়, উধার যাইয়ে। বৈতরণী পার হোনেসে বহুৎ পুণ্যি। সটান বৈকুণ্ঠধামে চলে যেতে পারে গা মাজী।

গৌরহরি দু'এক পা এগিয়ে এসেছিল, আইয়ে মাজী। আস্নান কিজিয়ে! আইয়ে। ইধার আইয়ে।

কালু চোখ ইশারা করে গৌরহরিকে। সাউথ ইণ্ডিয়ান গো গৌরহরিদা, ওদের ভালো করে মন্ত্র পড়িয়ে বৈতরণী পার করাও দেখি। আমি আর এক পাক ঘুরে আসি।

বউদুটির একটার হাত ধরে গৌরহরি। আইয়ে মাজী, আইয়ে আইয়ে। কোই ডর নেহি, আইয়ে।

তারপর কালুর দিকে তাকায়, বেলা বেড়ে যাচ্ছে রে কেলো স্নানের লোক কমতে শুরু করবে এবার থেকে, মনে রাখিস

কালু বুঝতে পারে, কি বলতে চাইছে গৌরহরি। হাসে, সে আমি জানি গো গৌরহরিদা। তুমি ওদের পার করাও না, আমি আরো আনছি।

অনেকক্ষণ ধরে বিড়ি খাওয়া হয় নি কালুর পেটটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। দু পা এগিয়ে ও বিশুর কাছে এল, কীরে হাঁ করে কী দেখছিস? আই বাপ, এই শালটা কে, দিল রে

বিশুর কাঁধে একটা লেডিস শাল। সন্দেহ নেই, কেউ বৈতরণী পার হয়ে দান করে গেছে। দাতারও অভাব হয় না এ সব ক্ষেত্রে। আবার অনেক কিপটে হাড়গিলেকেও দেখেছে কালু। চার আনা পয়সা বার করতেই দম ফাটে।

শালটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে ভাঁজ করে আবার ওর কাঁধে পেতে দিল কালু

—এই, বিড়ি দেশলাইটা দে তো। একটা টান মেরে যাই

বিশু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। বাপ বলে রেখেছিল, কেউ কিছু চেলে দিবি না কিন্তু বিশু। সাগর মেলায় সবাই তো আর পুণ্য করতে আসে না। চোর ছ্যাচোর পকেটমার ঠগেরই বা অভাব কি এখানে বুঝলি, কেউ আসে ঠকতে, কেউ আসে ঠকাতে।

—কী হল রে, বিড়ি বার কর!

বিশু বলে, বাবা বকবে।

—ধুত তোর নিকুচি করেছে বাবার। আমি বিড়ি খেলে তোর বাবা বকবে এই বুঝেছিস বুঝি? দেখি, কোন পকেটে তোর বিড়ি

বিশু চারপাশের কাণ্ড কারখানা দেখে এমনিতেই থমকে গিয়েছিল। কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না। একবার বাপের দিকে তাকাল বটে, কিন্তু বাপ তখন ধুমসো মতো বউ দুটোকে নিয়ে কোমর জলে নেমে পড়েছে। ওদের নিয়েই ব্যস্ত। চেঁচিয়ে যে কিছু বলবে তারও উপায় রইল না।

পকেট থেকে বিড়ি বার করে নিল কালু। ফস করে দেশলাই ঠুকে ধরিয়ে নিয়ে পুরো ধোঁয়াটাই বিশুর মুখের ওপর ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে আবার ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

মেলায় যেন খই ফুটতে শুরু করেছে। যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। হোগলা দিয়ে, চট দিয়ে বানানো অজস্র মাথা গোঁজার ঠাঁই। ওদিকে কপিলমুনির মন্দিরের দিকে পুজো দেওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেছে সেই ভোর থেকেই। ওখানে গিয়ে কারো সঙ্গে যে বৈতরণী পার হওয়া নিয়ে কথা বলা যাবে তার উপায় নেই। কালু বাঁ দিকে এগোতে শুরু করল। পথের দুপাশে অজস্র ভিখিরি। অধিকাংশই ঠুঁটো জগন্নাথের দল। কুষ্ঠ আর বিষাক্ত ঘায়ে জর্জর হওয়া শরীর নিয়ে দল বেঁধে সাগরে এসেছে রোজগার করতে। সবাই কি আর কুষ্ঠরোগী, সন্দেহ হয় ওর। গায়ে রং তুলো সাঁটিয়েও অনেকে ভিখিরি হয়েছে। ভেক না দেখালে ভিখ মিলবে কেন!

কালুর কেমন মজা লাগে। পুণ্য অর্জনের জন্য এই মেলা, অথচ পুরোটাই যেন ভেলকি! সব শালা ধান্দায় ঘুরছে।

—এই যে দাদু, চান করেছেন?

বৃদ্ধ লোকটার হাতে একটা লাঠি, কালুর দিকে তাকাল, সারা রাত যা ঠাণ্ডায় কাটিয়েছি, আবার চান! নেহাত কোনো দিন আসা হয় নি এ মেলায়, তাই আসা। নাক-কান মুলছি বাবা, আর নয়। এ যে একটা গু গোবরের মেলা কে জানত! কি নোংরা চারদিকে!

কালু হাসে, ঠিকই বলেছেন দাদু! সারা দেশ থেকে এত লোক যে কেন এখানে ছুটতে ছুটতে আসে, আমিও বুঝি না।

বৃদ্ধ একটু দাঁড়ায়। কালু বুঝতে পারে না, বৃদ্ধ একাই, না সঙ্গে আরো কেউ রয়েছে! জিজ্ঞেস করল, আপনি একা এসেছেন?

—একা বলি কি করে। পাড়ার একদল লোক গঙ্গাসাগরে আসবে, আমিও ভিড়ে গেলাম।

—কোথায় উঠেছেন

—উঠেছি? বৃদ্ধ লাঠি তুলে দেখায় ওই দিকে, সারা রাত যেন বরফে জমে গিয়েছিলাম। এখন একটু রোদে ঘুরে ঘুরে দেখছি। কিন্তু তুমি কে হে?

কালু বলল, দাদু, আমি আপনার নাতির মতো। একটা কথা বলব দাদু

—কি কথা?

—সাগরে এলেন, চান করবেন না? চান না করলে সাগরে আসাই যে বৃথা।

—হোক বৃথা! চান করলে এ গঙ্গাসাগরেই আমাকে দাহ করতে হবে তোমাদের। বৃদ্ধ হাসে।

কালু বলল, সাগরে এলে কিন্তু বৈতরণী পার হয়ে কিছু পরজন্মের কাজ করে যেতে হয় দাদু। আর কী এখানে আসতে পারবেন?

—বটে? পরজন্ম শেখাচ্ছ?

—শেখাব কেন, এসব কী আপনাকে শেখাবার।

বৃদ্ধ একবার আপাদমস্তক দেখে নেয় কালুর। কোথায়, থাকা হয়?

কালু হাসে, এই কাছেই একটা গাঁয়ে। আমি গৌরহরি ঠাকুরের চেলা। ঠাকুর এখন যাত্রীদের বৈতরণী পার করাচ্ছেন। আসুন না দেখে যাবেন।

—কোথায়?

—আসুন না, চান না হয় নাই করলেন। মাথায় একটু জল ছোঁয়ালেও হবে। আসুন।

বৃদ্ধর কৌতূহল বাড়ে। বলল, বেশ তো, চলো দেখি তা বৈতরণী পার না কি বলছিলে, ব্যাপারটা কি হে?

কালু বোঝে, আর্ধেক সফল হয়েছে ও। গড়গড় করে বৈতরণী পারের ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করে। মৃত্যুর পর, বুঝলেন দাদু মানুষকে প্রেত জীবনযাপন করতে হয়। মর্তলোক থেকে অমর্তলোকের দিকে যাত্রা শুরু করে সেই প্রেত বা আত্মা।

বৃদ্ধ বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কান পেতে থাকে কালুর দিকে।

দীর্ঘ পথ। বুঝলেন দাদু, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে এগোতে হয় সেই আত্মাকে। ইহজন্মে যদি পুণ্য কাজ কিছু করে থাকেন, যন্ত্রণাও কমে যায়।

—বটে।

বিশ্বাস করুন দাদু। এসব তো আর আমার আপনার কথা নয়, পুরাণের কথা। যাঁরা পুরাণ পাঠ করেছেন তাঁরা তা জানেন। তা, যে কথা বলছিলাম। বৈতরণী। ভয়ানক নদী। পুঁজ রক্ত বিষ্ঠায় ভরা। সেখানে খেয়া আছে, মাঝিও আছে। আপনি যদি এ জন্মে গোদান করে থাকেন, তাহলে সেই খেয়ায় উঠে পার হয়ে যেতে পারবেন। আর যদি না করে থাকেন, তাহলে তো বুঝতেই পারছেন।

—কি বুঝতে পারছি?

—আপনাকে বিনা খেয়াতে সেই নদীতে নেমে সাঁতরে পার হতে হবে। আর তখন শকুনি গৃধিনীরা আপনাকে ঠুকরে ঠুকরে রক্তাক্ত করে দেবে। ভীষণ কষ্ট দাদু। সে নদী পার হওয়া ভীষণ কষ্টের।

—বটে। মরার পর কি হল কে আর তা দেখতে যাচ্ছে। আবার হাসে বৃদ্ধ।

—তাই কখনো হয় নাকি। মানুষ মরলে তাহলে আর শ্রাদ্ধশান্তি কেন! মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান কেন! জীবিতদের পিণ্ড জল না পেলে আত্মাকে অভুক্ত থেকেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এসব আর আপনাকে কি বোঝাব দাদু!

সাগরের প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল ওরা। এখনো অসংখ্য লোক জলে, অসংখ্য লোক ভেজা কাপড়ে পারে। ধু ধু করছে জলরাশি। বহু দূরে জল আর আকাশ একাকার। বহু দূরে একটা জাহাজ মন্থর গতিতে যেতে দেখা যাচ্ছে। ওটা বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, না কলকাতার দিকে যাচ্ছে, কে জানে।

—আসুন দাদু, এদিকে। ওই যে গৌরহরি ঠাকুর। ওই যে দেখছেন না, গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার করাচ্ছেন উনি।

বৃদ্ধ দেখে, সত্যি সত্যি বকনার লেজ ধরে জলে ডুব দিচ্ছে একজন।

—আপনিও ডুব দিয়ে বৈতরণী পার হয়ে যান দাদু! বৃদ্ধ একটু রসিয়ে রসিয়ে বলার চেষ্টা করে যম দুয়ারের দিকে এক পা তো তুলেই রেখেছি, এ বয়সে আর প্যারাপার করে কি করব বল, ও যারা করছে করুক।

—জলে না নামতে চান, গোদান করুন; মাথায় একটু জল ছেটান। ঠাকুর আপনাকে মন্ত্র পড়িয়ে দেবে। ব্যস, তা হলেই হবে।

বৃদ্ধ একটু এপাশ ওপাশ তাকায়. একটু যে লোভ না হচ্ছিল এমন নয়। জিজ্ঞেস করল, কত খরচ ?

—খরচ আবার কি ! আপনার যেমন ইচ্ছে আমরা কখনো কারো গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করি না দাদু আসুন না।

গৌরহরির দিকে একবার একটু চোখাচোখি হয়ে যায় কালুর। বৃদ্ধকে শুনিয়ে শুনিয়ে কালু বলে, ও গৌরহরিঠাকুর, দাদুও পার হতে চান তোমার কত দেরি হবে গো ?

—না না, আমি পার হতে চাইলাম কোথায়, তুমিই তো আমাকে ধরে নিয়ে এলে। বৃদ্ধ খানিকটা কেমন ককিয়ে ওঠে, ও যারা পার হচ্ছে, তারাই হোক, এই ঠাণ্ডায় বৈতরণী পার হতে গিয়ে প্রাণ দেই আর কি

উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল বৃদ্ধ। কালু সঙ্গে সঙ্গে পথ আগলে দাঁড়াল, আহা জলে নামবেন কেন ! জলে নামতে হবে না, দেখুন না

ততক্ষণে গৌরহরিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, দাদুকে একটু দাঁড়াতে বল কেলো। এঁদের হয়ে এসেছে, এখনি হাত খালি হবে আমার।

কালু দাদুর একটা হাত চেপে ধরে দু'মিনিট দাঁড়ান দাদু। এখনি হয়ে যাবে। দেখছেন তো কি অবস্থা। সকালে যদি আসতেন, দেখতে পেতেন লাইন লেগে গেছে।

বৃদ্ধ কি ভেবে একটু দাঁড়াল, ঠিক আছে জলে না নামিয়ে যদি পার করাতে পারো করাও। না হয় একটু অপেক্ষাই করলাম।

প্রায় হাত ফস্কে বেরিয়ে যাওয়া দাদুকে বৈতরণী পার করালো ওরা। বকনার লেজে একটু হাত ছুঁইয়ে, মাথায় একটু জল ছিটিয়ে, মন্ত্র পড়িয়ে বৈতরণী পার করানো হল দাদুকে। দক্ষিণা নিয়ে কিছু কচকচিও হল। তারপর পাঁচটাকাতেই একটা ফয়সলা ঘটিয়ে দাদুকে ছাড়া হল।

সূর্য এখন মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে। সাগর মেলার বালিয়াড়িতে লাখ লাখ মানুষ। গিস গিস করছে। আর খানিকক্ষণ পর থেকেই মেলা ভাঙার আয়োজন শুরু হয়ে যাবে। গঙ্গাসাগরের মজাই এই, কোনোরকমে একবার এসে পড়তে পারলেই হলো, ডুব দিয়ে ফেরার জন্য তৈরি হও

কালু বুঝতে পারছিল, যাত্রীদের ফেরার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরো মেলা সাফ হতে অবশ্য দু'তিন দিনের ধাক্কা কিন্তু বৈতরণী যা পার হওয়ার তা বোধহয় শেষই হয়ে গেল এবারের মতো। অর্থাৎ যা রোজগারপাতি হওয়ার তারও শেষ।

গৌরহরি আবার তাড়া লাগাল, কি রে, সেই থেকে বিড়ি খেয়ে যাচ্ছিস, যা না বাপু, আর দু এক জনকে আনতে পারিস কিনা দেখ না।

কালু হাসে, দাঁড়াও বাপু, অত হাঁকপাক করলে হয়। বকে বকে মুখে আমার গ্যাজলা উঠে আসছে।

—আর এদিকে যে আমি জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা হেজে ফেললাম, সেটা বুঝি কিছু না। হিশেবের সময় তো এক কানাকড়িও কম নিবি না।

কালু বিড়িটা টোকা দিয়ে ফেলে দিল, ঠিক আছে দেখছি। আর দাঁড়াল না, আবার মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা এগোতেই, এই যে দিদিমা, বৈতরণী পার হবেন না ?

দিদিমা বলে যে মহিলাকে কালু ডেকে বসল, তার বয়স বড় জোর তিরিশ পঁয়ত্রিশ। ফলে যা হবার তাই হল। ভদ্রমহিলা গাঁক গাঁক করে উঠলেন, আমি দিদিমা ? মাগো—

কালু কেমন থতমত খেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল, সরি, ভুল হয়ে গেছে। বৈতরণী পার হয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম। অপরাধীর মতো হাসল কালু।

মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, কী হয়েছে

—দেখ না কি বলছে ! আমাকে কিনা দিদিমা ডাকে

কালু আবার করুণ গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে বাবু, ঠিক বুঝতে পারি নি।

—হুম ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক দেখে নিল কালুর। কী চাই তোমার

—আজ্ঞে, বৈতরণী পার হয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম। গঙ্গাসাগরে এলে বৈতরণী পার হতে হয়।

—বৈতরণী পার, তার মানে গরুর লেজ ধরে স্বর্গে যাওয়া।

—আজ্ঞে, মৃত্যুর পর মানুষকে প্রেত জীবনযাপন করতে হয়। তাই তীর্থে এসে কিছু দানধ্যান জপতপ করলে যন্ত্রণা কমে। আসুন না, একবার দেখে যাবেন।

ভদ্রলোক এবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, জানো আমি কে ? এখনি তোমাকে আমি লক আপে পুরতে পারি।

কালু খানিকটা আমতা আমতা করে। আজ্ঞে অপরাধ নেবেন না বাবু বৈতরণী পার হওয়া না হওয়া যার যার ব্যাপার। আমি শুধু বললাম, যদি পার হতে চান, গৌরহরি ঠাকুরের কাছে আপনাদের আমি নিয়ে যেতে পারি।

—তুমি কাটবে ! না আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে

কালু বুঝল, বড় ভুল জায়গায় এসে পড়েছে ও। সরে পড়াই ভালো। বলল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলাই আবার ডাকলেন, এই যে শুনুন ?

থমকে দাঁড়াল কালু, আমায় ডাকছেন

ভদ্রলোক বললেন, আবার ওকে কেন, কী চাই তোমার ? কেমন একটা বিরক্তি ঝরে পড়ে ভদ্রলোকের চোখে মুখে।

—আহা, একটু দেখে আসি না, কীভাবে ওরা পার করাচ্ছে সবাইকে

—এতো দেখছ, তবু সাধ মেটে না তোমার

কালু বলল, আসুন না। আসুন। দেখতে তো আর মানা নেই, আসুন। শেষ পর্যন্ত এই দম্পতিকেও পার করাল গৌরহরি। বৈতরণী পারের মাহাত্ম্য বোঝাল। জীবন মৃত্যুর রহস্য বোঝাল। ইহলোক পরলোক, স্বর্গনরক, আত্মা পরমাত্মা অনেক তত্ত্বই গড় গড় করে তোতাপাখির মতো বলে গেল।

তারপর ওরা বিদায় হলে কালু বলল, লোকটা মনে হয় পুলিশে চাকরি করে। তা করুক গৌরহরিদা, এ এমন এক কল, পুলিশেও পয়সা দিতে বাধ্য হয়, তাই না ?

গৌরহরিও হাসে, পরলোক বলে কথা।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সাগর মেলার ভিন্ন চেহারা। সব কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে। সারাদিনের তপ্ত বালি ঠাণ্ডায় জমে কনকনে হয়ে ওঠে। চারপাশে আলো, আরো আলো, কপিল মুনির মন্দিরের দিকে সন্ধ্যারতির আয়োজন। যাত্রী অনেক কমে গেলেও এখনো যা আছে তাও গুণে শেষ করা যাবে না।

গৌরহরি কালু আর বিশু একটা হোগলার ঘরে ঢুকে খিচুড়ির থালা নিয়ে বসেছিল। খেয়েদেয়ে হিশেবপত্র সেরে একটা ঘুম লাগাতে হবে। ভোরবেলা তল্পিতল্পা গুটিয়ে কাটতে হবে। এবারকার মতো তাহলে চুকল, আবার আগামীবার।

—আগামীবার আবার আসছ তো গৌরহরিদা ? জিজ্ঞেস করে কালু।

গৌরহরি হাসে, আগে বেঁচে থাকি তো যা দিনকাল পড়েছে, বেঁচে থাকাটাই তো সমস্যার।

—কি এমন বয়স তোমার, এখনো পনের কুড়ি বছর তুমি চালাতে পারবে।

—দেখা যাক। গৌরহরি তারিয়ে তারিয়ে খিচুড়ি খায়।

কালু বলে, আগামীবার আমাকে এক মাস আগে জানাবে কিন্তু, বকনা পেতে বড় ঝামেলা হয়। আগে পাঁচ-দশ টাকা দিলেই পাওয়া যেত, এখন পঞ্চাশের নীচে কেউ কথা বলে না।

—বলিস কি রে এক বেলার ভাড়া পঞ্চাশ। পঞ্চাশ টাকায় তো একটা বকনাই কিনে ফেলা যায়।

যাও না, কিনতে যাও না। সে দিন আর আছে বুঝি !

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গৌরহরি।

কালু বলে, আমি অবশ্য অল্প টাকাতেই জোগাড় করেছি। পনের টাকাতেই কথা হয়েছে, তবে ব্যাটাকে আরো দু তিনটে টাকা বেশি দিতে হবে। লোকটা অনেকবার এসে আমার পেছনে ঘ্যান ঘ্যান করে গেছে।

—কে লোকটা ? তোদের গাঁয়ের ?

—পাশের গাঁয়ের। লোকটা তোমার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।

—যাহ্ বাবা ! বারণ করার কি ছিল ! নিয়ে আসলেই পারতিস।

—হুঁ নিয়ে আসি, আর দশ জনে দেখুক। আমাদের পিঠের চামড়া তুলুক !

গৌরহরির কেমন দুর্বোদ্ধ লাগে ব্যাপারটা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েই থাকে।

—তুমি যদি রাগ না কর গৌরহরিদা, তা হলে বলতে পারি।

অহেতুক গৌরহরির বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ শুরু হয়। কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে। বলল, রাগ করার কি আছে, বল না ?

—বাড়ি বাড়ি আমি বকনা চেয়ে দেখেছি, কেউ পঞ্চাশ ষাট টাকার কমে রাজি হয় না, শেষটায়—

একটু থামে কালু।

গৌরহরি কথা কেড়ে নেয়, শেষটায় ?

—শেষটায় আমারই এক জানাশোনা লোক নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে অল্প টাকায় এটাকে জোগাড় করেছি। নাসিরুদ্দিন শেখ লোকটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো গো।

একটু ককিয়ে ওঠে গৌরহরি, মোসলমানের গরু। মানে মোসলমানের ?

হেঁ হেঁ করে হেসে ওঠে কালু, গরু আবার হিন্দু মুসলমান হয় নাকি ! তুমি গৌরহরিদা এখনো সেই সেকেলেই রয়ে গেলে।

গৌরহরি কি বলবে ভেবে পায় না। গরু হিন্দু মুসলমান হয় না ঠিক, কিন্তু—

কালু ঢক ঢক করে জল খেল। মুসলমানের গরুও দুধ দেয় গৌরহরিদা। আর সে দুধের রঙও সাদা, তাই না !

গৌরহরি ফিস ফিস করে বলল, আর কেউ জানে না তো ? দেখিস বাবা, শেষটায় আমাদের দুজনকে ধরেই বৈতরণী পার করিয়ে ছাড়বে।

কালু হাসে, না না, কেউ জানে না, কেউ জানবে না। □

প্রসঙ্গ এইডস

বিখ্যাত অভিনেতা রক হাডসনের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্যের কারণ হল তাঁর মৃত্যু ঘটেছে AIDS অর্থাৎ Acquired Immune Deficiency Syndrome অসুখে। আমেরিকায় এখন পর্যন্ত এই অসুখের শিকার হয়েছে প্রায় ১২/১৩ হাজার মানুষ। এই অসুখে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্যান্সারও হতে পারে। সমকামী পুরুষ, রক্তে নিষিদ্ধ মাদকের ইঞ্জেকশন নেয় এমন সব মানুষ, হিমোফিলিয়্যাক রোগী এই অসুখের শিকার। হিমোফিলিয়্যাক রোগে জন্মগত একটি বিশেষ প্রোটিনের জন্য অন্যজনের রক্ত নেবার প্রয়োজন হয়। তা থেকে AIDS-এর সংক্রমণ ঘটে। অসুখটি যে কোনো ভাইরাস থেকে ঘটে তাতে সন্দেহ নাই। হাডসন ডাক্তারদের পরামর্শে HPA 23 জাতীয় ওষুধের জন্য প্যারিতে উড়ে এসেছিলেন। আমেরিকায় এ ধরনের ওষুধ যে পাওয়া যায় তা তিনি জানতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর আমেরিকায় ডাক্তারেরা প্রেস কনফারেন্স ডেকে cyclosterim A যে AIDS চিকিৎসায় সহায়ক তা ঘোষণা করেন অবশ্য এই ঔষধের বৈজ্ঞানিক কার্যকারিতার স্বরূপ নিয়ে তাঁরা কিছু বলেন নি। এই কথাগুলি বলেছেন লন্ডনের ইনস্টিট্যুট অব ক্যান্সার রিসার্চের ফেলো ডঃ জোনাথান ওয়েবার। তিনি এইডসের চিকিৎসার আধুনিক পরিস্থিতির বিবরণও দিয়েছেন। AIDS ভাইরাসের সংক্রমণে চিকিৎসার উপায়গুলি হলো

১। এইডস ভাইরাস আক্রান্ত কোষের অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা।

২। প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন কোষগুলিকে পরিবর্তিত করে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।

৩। ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডির সাহায্যে এইডস ভাইরাসকে কোষে ঢুকতে না দেওয়া।

এইডস ভাইরাস-এর বিভিন্ন নাম HLTV-III, LAV ARV—তবে এদের সাধারণভাবে এইডস ভাইরাস বলা যায়। এই ভাইরাস শরীরের এক ধরনের টিলিম্ফোসাটিকে (T-lymphocytes) আক্রমণ করে। ফলে লিম্ফোসাটি আর সক্রিয় থাকে না ও অকালে নষ্ট হয়। তাতে কোষের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়—যা এইডসের লক্ষণ। তাছাড়া
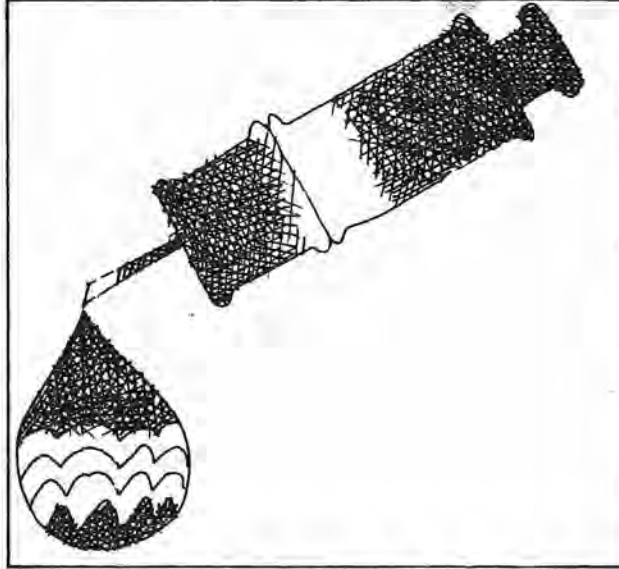
কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের কোষও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। সম্ভবত দুরকম কোষে আক্রমণ এক সঙ্গে হয়ে থাকে। তাই এইডস চিকিৎসায় শোণিত ও মস্তিষ্ক এ-দুয়ের মধ্যবর্তী বাধা এড়িয়ে সব ওষুধ ভাইরাসকে প্রতিহত করতে পারে না। জার্মানির বেয়ার সুরামিন ওষুধটি তৈরি করেছিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। আফ্রিকায় ঘুম অসুখের জন্য ওষুধটি ব্যবহার করা হয়েছে। মেরিল্যান্ডে বেথেসডা ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিট্যুটের স্যামুয়েল ব্রডার অন্তত দশটি এইডস রুগীর চিকিৎসায় সুরামিন প্রয়োগ করে দেখেছেন এতে ভাইরাসের বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে কিন্তু রুগীর প্রতিরোধ ক্ষমতার বিশেষ উন্নতি হয় না। প্যারিসে ওয়ালি রোজেন বাউম এন্যান্টিসনি ও টাংস্টেন ভিত্তিক HPA-23 দিয়ে চিকিৎসায় অন্তত একটি রুগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন। সুরামিন ও HAP-23 দুটি ওষুধই টক্সিক ও এদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষতিকর।

ফসকনোফরমেট আর একটি ওষুধ যা দিয়ে এইডস রুগীর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এছাড়া আরও কিছু কিছু ওষুধ দিয়ে রুগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।

আক্রান্ত লিম্ফোসাইট বা অস্থিমজ্জা পরিবর্তন করা এইডস নিরাময়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি হতে পারে অথবা লিম্ফোসাইটের যে প্রোটিন লিম্ফোকিন কোষগুলির সংযোজক তার পরিবর্তন করা। ক্লিফলেন এ হেনরি মাসুর একটি রুগীর দেহে লিম্ফোসাইট ঢুকিয়ে ও অস্থিমজ্জা সংযোগ করে সাময়িক ফল পেয়েছেন। সেই সঙ্গে অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসায় সুফল হয় কি না তা নিয়ে গবেষণা চলেছে। গামা ইন্টারফেরন ও ইন্টারলিউকিন ২ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তৈরি করে তা রুগীর আক্রান্ত লিম্ফোসাইট কমাতে সাহায্য করে দেখা গেছে। সঙ্গে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা হয়ত এই পদ্ধতির সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।

এইডসের প্রতিরোধে কোনো ভ্যাকসিন এখনো তৈরি সম্ভব হয় নি। এরকম ভ্যাকসিন তৈরিতে ভাইরাসের যে অংশটুকু অ্যান্টিজেন হিসেবে শরীর গ্রহণ করতে পারে তা প্রথমেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা এরকম প্রোটিন কী চরিত্রের হবে তা জেনে কোষের কোন জিন তা উৎপন্ন করতে পারে তা বলতে পারেন। পরে ঐ প্রোটিন কৃত্রিমভাবে তৈরি করে তা ইস্ট, ব্যাক্টেরিয়া বা কোষে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। জিনটি আলাদা করা সম্ভব হলে প্রচুর এরকম নিরাপদ ও সক্রিয় প্রোটিন তৈরি করা যায়—যা দিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি হতে পারে। এই পদ্ধতিতে তৈরি ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি রোগের জন্য শীঘ্রই ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডি. এন. এ প্রযুক্তিতে ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাসে জিন কোড চাপিয়ে দিয়ে তা অনেক রোগের প্রতিরোধে লাগানো যায়। এই ভাইরাস প্রায় ২৫ হাজারের মত বাইরের ডি. এন. এ-র বেসের জুড়ি ধরে রাখতে পারে ফলে ভ্যাকসিনিয়াতে একসঙ্গে অনেক অসুখের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে। এর যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে তা শরীরের পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকর বটে।

এখনও গবেষণার স্তরে আছে এমন কয়েকটি পদ্ধতির কথাও বলেছেন ওয়েবার। একটি হলো—৮ থেকে ১৫টি অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খল দিয়ে কৃত্রিম পেপটাইড তৈরি করা যায়, যা ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহার করে

সুস্বাস্থ্য লাভ করুন, তবেই জয়লাভ নিশ্চিত

গত ৭ এপ্রিল সারাবিশ্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে এবছর এই উপলক্ষে স্বাস্থ্য সমস্যার যে বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছেন বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা তা হলো সুস্বাস্থ্য লাভ করলে তবেই জয়ী হওয়া যাবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র, সংস্থা, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের আবেদন এ বছরটি যেন তাঁর স্বাস্থ্য সমস্যার এই দিকটির প্রতি সচেতন হন

জীবন সংগ্রামে মানুষ তার নিজস্ব পরিধির ভেতর যে সব কারণে পিছিয়ে পড়ে তার অন্যতম হলো স্বাস্থ্যহীনতা। সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলাই হবে এ বছরের লক্ষ্য। আগামী ২০০০ খ্রিঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিকল্পনা হলো যাতে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ সুস্বাস্থ্য অর্জন করে। বর্তমান বছরের আবেদন সেই পরিকল্পনার পরিপূরক। বর্তমান আবেদনের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্বাস্থ্য অর্জনে খেলাধুলার চর্চার প্রসার, পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান, নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা। সুস্থ দেহই সুস্থ মনের উৎস—সুস্থ মন থেকেই প্রগতির সূচনা হয়। এই লক্ষ্য নিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে উদ্দেশ্যগুলি রূপায়িত করা প্রয়োজন।

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ সেখানে সরকার, বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি কীভাবে ও কতটুকু এই আবেদন সফল করতে পারবেন জানা নেই, তবে সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই এই আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসবেন। □

কোষের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়। অবশ্য পেপটাইডটি এইডস ভাইরাসের অ্যান্টিজেন অংশ হতে হবে।

এ ছাড়া ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তাতে শুধু এইডস নয়, আরও অনেক রোগের প্রতিকার পাওয়া যাবে।

গত ফেব্রুয়ারিতে বৃটেনের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার এ্যাচিসন বলেছেন যে, সেখানে এখন পর্যন্ত ২৮৭ জন এইডসের রুগী পাওয়া গেছে, তাঁদের ১৪৪ জন মারা গেছেন। বৃটেনে হিমোফিলিয়াক রুগীদের যে বাইরের রক্ত দেওয়া হচ্ছে, সেই রক্ত তাপশোধিত করেও এইডস ভাইরাস এড়ানো যাচ্ছে না। বাইরের এই রক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে factor VIII নামে। তাদের রক্তশোধন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ৬৮° সেঃ উষ্ণতায় ৭২ ঘন্টার মত শোধন করেও এইডস ভাইরাস থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না। মিডলসেক্স হাসপাতালের ভিরোলজিস্ট টেডার অবশ্য বলেছেন যে এত উষ্ণতায় এইডস ভাইরাস টিকতে পারে না। এ নিয়ে সন্দেহের নিরসন না হলেও দেখা যাচ্ছে বৃটেনে হিমোফিলিয়াক রুগীরা এইডসের বেশি শিকার হচ্ছে।

বৃটেনের প্রায় ৫০০০ হিমোফিলিয়াক রুগীর ২০০০ জন factor VIII ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের শতকরা ৪৪ জনের এইডস সংক্রমণ নিশ্চিত ধরা পড়েছে। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের বাচ্চাদের এই সংক্রমণ বেশি প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ।

এইডস সংক্রমণের পর রক্তে তার চিহ্ন ধরা পড়া ও রোগটি মারাত্মক হওয়ার মধ্যে যে সময় সীমা তা হিমোফিলিয়াক রুগীদের বেলায় এমন কি চার বছর হতে পারে। সমকামীদের ক্ষেত্রে এই সময় সীমা ১২ থেকে ১৮ মাস। রক্তে যারা নিষিদ্ধ মাদকের ইঞ্জেকশন নেয় তাদের পক্ষে এই সময় সীমা আরোও কম। এ্যাচিসন বলেছেন যে, স্কটল্যান্ডে এই মাদকসেবীরা রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পরিচ্ছন্ন ছুঁচ সরবরাহ করে এদের ভেতর এইডস সংক্রমণ কিছুটা এড়ানো যায়। এই উপায় অবলম্বন করে আমস্টার্ডমে ইউরোপের অন্য শহরের তুলনায় মাদকসেবীদের ভেতর এইডস সংক্রমণ অনেক কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। ইতালিতে এখন শতকরা ৭৫ জন মাদকসেবীই এইডসের শিকার।

রাস্তায় রাস্তায় যেখানে হেরোইন মাদকের ছড়াছড়ি, পরিচ্ছন্ন ছুঁচ দিয়ে কি সেখানে সমস্যার সমাধান হবে এই একান্ত সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ওয়েবারের আশার বাণীতে—এইডস প্রতিরোধের ভ্যাকসিন ও নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বস্তুত তা দিয়ে এই বছরের মধ্যেই এইডস রোগটিকে জয় করা যাবে।

আমেরিকায় সংক্রমণের চিত্র আরও ভয়াবহ। আটলান্টার রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ জোনাথান ই কাপলান বলেছেন ১৯৮৫ পর্যন্ত আমেরিকায় প্রায় ১০০০০ রুগী AIDS -এর শিকার হয়েছে। তাদের শতকরা ৭৫ জনকে বাঁচানো যায় নি। তাঁর মতে ধরা পড়ে নি এরকম ১০ লক্ষ রুগী এই অসুখে সংক্রামিত হয়েছে। তাঁদের কেন্দ্রে যে সব রুগী এসেছে তাদের শতকরা ৭৩ জন সমকামী ও ১৭ জন মাদকসেবী অথবা হিমোফিলিয়াক। বাকি ১০ জনের সংক্রমণের কারণ নির্দিষ্ট নয়। AIDS -এর সংক্রমণের কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও আমেরিকার জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ এখনই সংক্রমণের শিকার, AIDS নিরাময়ের নিশ্চিত ওষুধ আবিষ্কার না হলে তারাই এখন অন্তত পাঁচবছর ধরে রোগের বিস্তার ঘটাতে পারবে। তিনি ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়ে ওয়েবার-এর মত এতটা আশাবাদী নন।

১৯১৮-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা আমেরিকায় প্রায় মহামারীর আকার নিয়েছিল—এর সুবিধা ছিল রুগীর দেহে একবার অ্যান্টিবডি তৈরি হলে তা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই রুগ্ণ মানুষকে ছেড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে শূকর, ঘোড়া বা পাখির ঘাড়ে চাপতে হয়। পীতজ্বরের ভাইরাসের বাহক হলো Aedas acgypti জাতীয় মশা। আবহাওয়া পরিবর্তনে প্রায় সেপ্টেম্বরের দিকে এসব মশা চলে গেলে রোগও নির্মূল হয়। ১৯৮০-তে বসন্ত ভ্যাকসিনের সাহায্যে প্রায় নির্মূল হয়েছে। পোলিও এবং হামের বেলায়ও তাই।

কিন্তু aids প্রতিরোধ এসবের কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। aids ভ্যাকসিন গবেষণা অনেক ব্যাপক, তার সাফল্য অল্প সময় সীমায় সম্ভব নাও হতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা থেমে নেই— AIDS -এর প্রতিরোধ ও নিরাময়ে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে, কাপলানের মতে, aids যুদ্ধ বা প্লেগের মত আকস্মিক মৃত্যুর দূত। কীভাবে আমরা এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারব ও কত কম সময়ে সেটাই শুধু লক্ষ্য করার বিষয়। □

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

নানাপ্রসঙ্গ

মহাজাগতিক রশ্মি ও অনুরাধা

মহাজাগতিক রশ্মি হল প্রায় আলোর বেগসম্পন্ন পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রের সমষ্টি। সবরকমের পরমাণু কেন্দ্র মহাজাগতিক রশ্মিতে এসে আমাদের পৃথিবী ও সৌরজগতকে অনবরত আঘাত হানছে। নামে রশ্মি হলেও এর উপাদান প্রধানত এইসব কণা। মহাজগতের জটিল পথে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে গিয়ে এরা কোন উৎস থেকে কোন সময় উৎপন্ন হয়েছে তা প্রায় অজানা থেকে যায়। এই কারণে মহাজাগতিক রশ্মিকে ভাল করে জানা যেমন জটিল তেমনি কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। এই রশ্মিতে অবশ্যই তার উৎসের কিছু চিহ্ন থাকে, তাছাড়া তার পরিক্রমার পথের খুঁটিনাটি তথ্যও রশ্মিতে ধরা পড়ে। বেলুন, কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ সন্ধানী যন্ত্র দিয়ে প্রায় গত তিরিশ বছর ধরে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা চলেছে। তবু তার উৎস ও কণাগুলির ত্বরণরহস্য এখনও অজানা রয়েছে। ১৯৭৪ খৃঃ পাইওনীয়ার কিছু অনিয়ত মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান পায়। প্রথম স্কাইল্যাব মিশনে এমন কিছু মৌলিক পদার্থ ও আংশিক আয়নিত পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেল যা থেকে তাদের উৎস যে ছায়াপথ থেকে নয় তা সন্দেহ করা হয়। মহাজাগতিক রশ্মির এই অনিয়ত অংশের উৎস জানতে ভারি আয়নের প্রাচুর্য ও আয়নন অবস্থা ৫-১০০ মিইভো শক্তির রশ্মিতে মাপা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে ভারতের তিনটি বড় গবেষণাগার যুক্তভাবে একটি মহাজাগতিক রশ্মি সন্ধানী যন্ত্র 'অনুরাধা' নাসার মহাকাশ ফেরি চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে ৩৫০ কি মি উর্ধ্বে গত ২৬ এপ্রিল—৬মে অনুরাধা মহাকাশ ফেরিতে ২১৬ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসেছে। সঙ্গে এনেছে প্রায় ২৫০০ তথ্য। সেগুলি এখন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে—যাতে মহাজাগতিক রশ্মির অনিয়ত অংশের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে জানা যাবে এই উৎস নক্ষত্র মধ্যবর্তী মহাকাশে অথবা কোন ধূমকেতুতে বর্তমান। অনুরাধা প্রকল্পের মুখ্য গবেষক ডঃ সুকুমার বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীদের ধারণা হল এই উৎস নক্ষত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে। অনুরাধার তথ্য দিয়ে অবশ্যই ডঃ বিশ্বাসের তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই হতে পারবে। তাছাড়া এইসব আয়নের সৌর চুম্বক স্তরে গতিবিধিও অনুরাধার আনীত তথ্য থেকে কিছুটা পরিষ্কার হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের তৈরি এই যন্ত্রের ওজন ৫০ কিগ্রা, ব্যাস ৫৫ সেমি, উচ্চতা ৫৫ সেমি। এই যন্ত্রের কণা সন্ধানী প্লাস্টিকের পাতলা আবরণগুলি CR-39 নামে পরিচিত। কণা সন্ধানী হিসেবে সুদক্ষ ও সুবেদী এই আবরণের গুচ্ছগুলি নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তনের ব্যবস্থা ছিল যাতে মহাকাশে প্রতি মুহূর্তের আয়নের গতিবিধির ঘটনা ধরা পড়ে। এমনকি পরমাণু থেকে একটি অথবা একাধিক কয়টি ইলেকট্রন মুক্ত ছিল তাদের চিহ্ন ও প্রাচুর্য এই যন্ত্রে রেকর্ড করে রেখেছে।

শ্যাওলা দিয়ে সোনা

নিউ মেক্সিকো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন যে শ্যাওলা প্রজাতির কিছু অ্যাল্‌গী সোনা শুষে নিতে পারে, অন্য কিছু অ্যাল্‌গী ইউরেনিয়াম কারখানার ময়লা জল থেকে ইউরেনিয়াম শোষণ করতে সক্ষম। আগেই জানা ছিল যে সবুজ বা নীল সবুজ অ্যালগী সীসা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, তামা, পারদ এবং প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর আয়ন শোষণ করে। বেঞ্জামিন গ্রীন ও তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে ক্লোরেলা জাতীয় অ্যালগী অন্য ধাতুর চেয়ে সোনা শোষণ করতে পারে বেশি। উপযুক্ত অ্যাসিড ও সল্টের ব্যবহারে ঐসব অ্যাল্‌গী শোষিত সোনা মুক্ত করে। গ্রীনের ধারণা সোনা সংগ্রহে এই অ্যালগী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। অ্যাল্‌গীর পৃষ্ঠদেশে যে পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ সোনার আয়ন শোষণ করে তা হল জৈব শোষণ বা biosorption। সায়ানাইড এবং থায়োইউরিয়ার মতো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে এই সোনা টেনে বের করা যায়। যদি বা কিছু আয়ন অ্যাল্‌গীতে থেকে যায় তার আয়ন পরমাণুতে পরিণত হয়। স্বাভাবিক সোনার খনি সৃষ্টিতে এই অ্যাল্‌গীর ভূমিকা থাকতে পারে। বিশেষ অবস্থাতে কোনো কোনো অ্যাল্‌গী দিয়ে ইউরেনিয়ামও সংগ্রহ করা যায়। □

কপিল কি শেষ পর্যন্ত জিততে পারবেন ?

শেষ বলে প্রয়োজন ছিল চারটি রানের কিন্তু মিয়াঁদাদ জানতেন বাউন্ডারির ধারে ছড়িয়ে থাকা ফিল্ডিং-এর বেষ্টনী ভেদ করে চার রান পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ জেতার জন্য ছয় মারা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই এবং অত্যন্ত ধীর, স্থির, শান্ত ভঙ্গিতে শিকারীর মত অপেক্ষা করছিলেন চেতনের শেষ বলটির জন্য। একটি নিরীহ ইনসুইং-ইয়র্কারকে ফুলটসে পরিণত করতে তার লেগেছিল একটি বাড়ানো পা এবং চকিতেই বলটিকে স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর থেকে প্রথম ট্রফিটি জিতে নিয়ে গেল পাকিস্তান। আর একটি স্বপ্নের ইনিংস খেলার জন্য মিয়াঁদাদ পরিণত হলেন পাকিস্তানের লোকগাথার নায়ক যতদিন ক্রিকেট বেঁচে থাকবে, ততদিন মানুষ মিয়াঁদাদের এই ইনিংসটিকে স্মরণ করবে শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সঙ্গে। পাকিস্তান তথা একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে মিয়াঁদাদের ইনিংসটি বেঁচে থাকবে স্মৃতি এবং সত্তায়

ক্রিকেট এমন একটি খেলা যার রং প্রতি মুহূর্তে বদলায়। সেদিনের অস্ট্রেলেশিয়া কাপ ফাইনালের সকাল বেলাটা নিশ্চিতভাবেই ছিল ভারতীয়দের। আব্দুল কাদির, ওয়াসিম আক্রাম এবং ইমরান খানের তথাকথিত ভয়ঙ্কর বোলিংকে নির্বিষ করতে গাভাস্কার এবং শ্রীকান্তের ব্যাট সাপুড়ের বাঁশির মত কাজ করেছিল নিজেদের খেয়াল খুশিমত রান নিয়েছেন শ্রীকান্ত এবং গাভাস্কার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এই মুহূর্তের সেরা স্পিনার কাদিরকে এক ওভারে দুটি ছয় মেরে শ্রীকান্ত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দিনে যে কোনো বোলারকে তাঁর পদলেহন করানোতেই তাঁর আনন্দ এবং গাভাস্কার শ্রীকান্তের নির্দয় প্রহারে পাকিস্তান বোলার এবং ফিল্ডাররা এতই দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন যে কম করে তিনটে খুব সহজ ক্যাচ তাদের হাত ফসকে যায়। শ্রীকান্তের ব্যাটে যদি ঝড়ের তাণ্ডব বয়, তাহলে গাভাস্কারের ব্যাটিংয়ে ছিল শ্রাবণের বারিধারার মোহময় রূপ! একদিনের আসরে গাভাস্কারকে এত ভাল খেলতে আমরা আর কবে দেখেছি? কাঁধের ওপরের বল যেগুলো গাভাস্কার সারাজীবন ছেড়ে দিয়েছেন সেগুলোও সেদিন তার চাবুকের আঘাতে বাউন্ডারির ধারে পালাতে ব্যস্ত থেকেছে।

গাভাস্কার-শ্রীকান্তের ব্যাটের এই ধারাটি পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের ওপর বজায় থাকলে ভারতকে সেদিন ম্যাচ বাঁচাবার জন্য মরণপণ লড়তে হতো না। বস্তুত উভয় পক্ষের শেষ পাঁচ ওভারের বৈসাদৃশ্য চোখে পড়লেই ম্যাচের গতি কোন দিকে গেছে তা বোঝা যায়। শেষ পাঁচ ওভারে যখন বলে বলে রান ওঠার কথা সেখানে ভারতীয়রা সংগ্রহ করেছে রান আর পাকিস্তানীরা ৫৩ রান।

শুধু তাই নয়, ভারতের এই গৌরবজনক পরাজয়ের জন্য ভারতের বোলিং দীনতা এবং বিপক্ষকে একটু খাটো করে দেখার মানসিকতাও দায়ী শেষ দিকে দরকার ছিল একটু কল্পনাপ্রসূত

জাভেদ মিয়াঁদাদ অস্ট্রেলেশিয়া কাপ জয়ের নায়ক

এবং লেনথ লাইন ঠিক রেখে বোলিং করা কিন্তু ১০৪ রানের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম চারজন ব্যাটসম্যানকে উপড়ে ফেলে দিয়েও ভারত যে ম্যাচ বার করতে পারল না, তার জন্য ভারতীয় বোলারদেরই দায়ী করা যায়। এবং, হ্যাঁ এবং এর জন্য অধিনায়ক কপিলদেবকেও সমালোচনার দায় থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না।

প্রায় পঁচাত্তরটি একদিনের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কপিলের উচিত ছিল শেষ ওভারটিতে বল করা এবং তার জন্য ৪১তম ওভারে না এসে তাঁর উচিত ছিল দ্বিতীয় স্পেলে ৪২তম ওভারে আসা। তাহলে শেষ ওভারে চেতন শর্মাকে 'কোথায় বল ফেলব' এর জন্য মাথা কুটে মরতে হতো না। শুধু তাই নয় কপিল কীর্তি আজাদকে দিয়ে বলই করান নি। কীর্তি একজন স্বীকৃত অলরাউন্ডার এবং দলে তাকে নেওয়া হয়েছে বোলার হিশেবে বল করার জন্য। কিন্তু দেখা গেল অধিনায়কের বোলার কীর্তির ওপর কোনো আস্থাই নেই। তাহলে শুধু ব্যাটসম্যান হিশেবেই কি তিনি দলে এসেছিলেন আমাদের মনে হয় ব্যাটসম্যান কীর্তির চেয়ে এই মুহূর্তে রমন লাম্বা অনেক বেশি ফর্মে আছেন। আর একজনকে দিয়ে বল না করিয়েই কিভাবে বলা যায় সে সাফল্য পেত

না

শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলেশিয়া কাপে কপিল ব্যাটে বলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দ্বিতীয় স্পেলে এসে অন্য ম্যাচে তিনি যদিও বা ভাল বল করেছেন, ফাইনালে চাপের মুখে তার মত বৃষস্কন্ধ ক্রিকেটারকেও দিশেহারা মনে হয়েছে। ভারতের দুর্ভাগ্য কপিলকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করার জন্য মাঠে গাভাস্কার ছিলেন না। থাকলে মনে হয় বোলিং এবং ফিল্ডিং পরিবর্তনে খানিকটা বৈচিত্র্য আসত এবং ভারতকে শেষ বল অবধি লড়াই চালাতে হতো না

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে পাকিস্তানের জয় খুব সহজে হয়েছে ছোট ছোট রান চুরি করতে করতে এবং মহসীন সেলিম মালিক এবং আব্দুল কাদিরকে নিয়ে জাভেদ মিয়াঁদাদ যে কখন পাকিস্তানকে নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়ে জয়ের তীরে তরী ভিড়িয়েছেন তার হদিশ পায় নি ভারতীয়রা আর এক একদিন যায় যখন এক একজনকে কোনো কিছু দিয়েই পরাস্ত করা যায় না ঐ দিনটি ছিল জাভেদের ওঁর ওপর সেদিন কোনো ঐশ্বরিক শক্তি ভর করেছিল কি না জানি না তবে এটুকু জানি মানুষ কখনও কখনও নিজের কীর্তিতে স্বয়ং ঈশ্বরকেও ছাপিয়ে যায়, সেদিন জাভেদ সেই অসীম আকাশে তাঁর ক্রিকেটকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জাভেদের ঐ ইনিংসটিকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন নেভিল কার্ডাসের ভাষায় মদমত্ততা, রবার্টসন-গ্লাসগোর কল্পনাশক্তি, ফিঙ্গলটনের অননুকরণীয় বর্ণনাভঙ্গি কি নিদেনপক্ষে রে রবিনসনের বিশ্লেষণী ক্ষমতা। আসলে রাজ প্রশস্তি কবি-রাজদেরই মানায়।

অস্ট্রেলেশিয়া কাপের পরাজয় ভুলতে ভারতের খুব বেশি সময় লাগবে না। কারণ সেদিন ভারত যথেষ্ট ভাল ক্রিকেট খেলেছিল। আপসোস একটাই, শেষ দিকে জাভেদের স্বপ্নের ক্রিকেট আর পাকিস্তানের অবিস্মরণীয় জয়ের তলায় চাপা পড়ে গেল গাভাস্কার-শ্রীকান্তের অসাধারণ ইনিংস, মনিন্দার সিং-এর ধারাল বোলিং এবং আজহারউদ্দিন এবং রজার বিনির অসাধারণ ফিল্ডিং এত সবকে ছাপিয়ে গেল শুধু একটি ক্রিকেটার যাঁর নাম জাভেদ মিয়াঁদাদ।

এখন প্রশ্ন এই দল নিয়ে ভারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কিরকম ফল করবে? সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কচুকাটা হয়ে যাওয়া ডেভিড গাওয়ার অ্যান্ড কোংকে যাঁরা ছোট করে দেখছেন আমি তাঁদের দলে নেই। ১৯৮৪তে ভারতে আসার আগে গাওয়ার ঠিক এই ভাবেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ০-৫ এ হেরে গিয়েছিলেন। তবু ভারতের মাটিতে আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল দল নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ভারতকে ২-১ ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ জিততে তার অসুবিধে হয় নি। এবারে সেই ইংল্যান্ড দলে যুক্ত হচ্ছে গ্রাহাম গুচ, জন এমব্যুরি, পিটার উইলি এবং একম্ অদ্বিতীয়ম্ ইয়ান বথামের নাম। এদের যোগদানে ইংল্যান্ড যে নিজের দেশে অনুকূল আবহাওয়ায় ভারতকে ছিঁড়ে খাবে সে ব্যাপারে আর সন্দেহ কি? উল্লিখিত চারজন ছাড়া অধিনায়ক গাওয়ার, সহ অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং, অ্যালান ল্যাম্ব এবং রিচার্ড এলিসন ভারতকে যথেষ্ট বেগ দেবে। বিশেষ করে ইংলিশ ক্রিকেট মরশুমের প্রথম দিকে বৃষ্টি এবং স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে বথাম এবং এলিসনের সুইং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

এই ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা কতটুকু? ক্রিকেটের মহান অনিশ্চয়তাকে মাথায় রেখেও বলছি খুব কম। কেন? কারণ ক্রিকেটে ম্যাচ জিততে হলে

গাভাস্কার ফাইনালেও দুর্দান্ত

রবি শাস্ত্রী : অতুলনীয় ফিল্ডিং

অস্ট্রেলেশিয়া কাপে কপিল ব্যাটে বলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ফাইনালে চাপের মুখে তার মত বৃষস্কন্ধ ক্রিকেটারকেও দিশেহারা মনে হয়েছে।

মনিন্দর সিং   ভারতীয় স্পিন আক্রমণের উৎসমুখ

বিপক্ষকে দুবার আউট করতে হয়। আর ভারতের বর্তমান বোলিং ক্ষমতা ইংল্যান্ডকে দুবার আউট করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রজার বিনি কোনোদিন একা কর্নাটককে জেতান নি, শিবলাল যাদব জেতাতে পারেন নি হায়দ্রাবাদকে, হরিয়ানাকে পারেন নি চেতন শর্মা। আমরা কি করে আশা করি এরা ইংল্যান্ড বা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে পারবে। তবু যে ভারত খানিকটা আশাবাদী হতে পারে তার জন্য

জুন-জুলাই-এ টেস্ট খেলে ইংল্যাণ্ডকে হারানো খুব দুরূহ। আজ অবধি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছাড়া কেউ পারে নি।

কপিলদেবের দুর্দান্ত বোলিং খানিকটা দায়ী। সামনে বথাম থাকেন বলে কিনা জানি না, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কপিল চিরকালই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। এবারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকছেন রবি শাস্ত্রী এবং মনিন্দার সিং। যত দিন যাচ্ছে শাস্ত্রী তত নিজেকে পরিশীলিত করে দলের সম্পদে পরিণত হচ্ছেন। একদিনের আসরে তার বোলিং ভারতের প্রধানতম ভরসা। বোলিংএ সামান্য ভেদশক্তি জুড়তে পারলে শাস্ত্রী বিশ্বের প্রথম সারির স্পিনারদের সমগোত্রীয় হবেন। অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় ফিরে এসে বেদীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা মনিন্দার সিং বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহিত না হয়ে নিজেকে আরও পরিশ্রমী এবং মার্জিত করেছেন।

এই সফরের আগে ভারত ইংল্যান্ডে ৩২টি টেস্ট খেলেছিল। তার মধ্যে জয় মাত্র একটিতে। আজ থেকে পনের বছর আগে সেই ঐতিহাসিক জয়লাভের অন্যতম সৈনিক সুনীল গাভাস্কার সেদিনের মত আজও ভারতীয় ব্যাটিংএর পরম ভরসা। ইংল্যান্ডে এটি তার ষষ্ঠ সফর। তাছাড়া এক মরশুম সানি সমারসেটের হয়ে কাউন্টিও খেলেছেন। এ সফরে ভারতের সাফল্যের পেছনে সানির অভিজ্ঞতা ভীষণ কাজে লাগবে। শ্রীকান্ত রানের বৃষ্টিতে ডুবছেন ব্যাপারটা যেমন আনন্দের তেমন আশংকার। কারণ কখন যে বন্যা বন্ধ হয়ে খরা আসবে কেউ জানে না। যে ব্যাটটি দিয়ে আজহারউদ্দিন জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন তাঁর সেই ব্যাটটি যদি তিনি খুঁজে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান তবে তাঁর এবং ভারতের পক্ষে স্বস্তির কথা।

আজহারের মত ইংল্যান্ডে এটি প্রথম সফর মনোজ প্রভাকর এবং রমন লাম্বারও। মনোজের সুইং বল ভারতের পক্ষে কাজে আসতে পারে। লাম্বা কতটা সুযোগ পাবেন জানি না তবে ওঁর ব্যাটে এখন রান আছে। সময় এসেছে যখন ভেঙ্গসরকার এবং মহীন্দার অমরনাথদের প্রমাণ করতে হবে কেন তাদের ভারতীয় দলে এখনও দরকার। কথাটা সন্দীপ পাতিলের জন্য বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু পাতিলকে দলে নেওয়া মানে একজন তরুণ খেলোয়াড়কে বঞ্চিত করা। ভারতীয় মিডল অর্ডারে প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য আনার জন্য পাতিলের বদলে বোম্বেরই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান অ্যালান সিপ্পিকে নিলে ভাল হত। রজার বিনিকে আর কতকাল ভারতীয় ক্রিকেটের দরকার কে জানে?

জুন-জুলাই-এ টেস্ট খেলে ইংল্যান্ডকে হারান খুবই দুরূহ। আজ অবধি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া কেউই পারে নি। কুড়িটি টেস্টে অধিনায়কত্ব করে কপিলদেব আজও ভারতকে জয় এনে দিতে পারেন নি। প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দুটি দলের খেলায় বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্ব কিন্তু ম্যাচ এবং সিরিজের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। কপিল কি পারবেন এ ব্যাপারে গাওয়ারকে টেক্কা দিতে? □

মানস চক্রবর্তী

ফটো জয়ন্ত শেঠ

এ পক্ষে কলকাতায়

ফিল্ম

ম্যাক্সমুলার ভবনে ১৫ মে এম. এম. বি স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রায়িত কাহিনীগুলি নিয়ে উদাহরণসহযোগে আলোচনা করবেন কিরণময় রাহা।
নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইন্ডিয়ার প্রদর্শন সন্ধ্যা ৭ এবং ১৪ মে। যথাক্রমে প্রদর্শিত হবে ১৯৪০-এর শাদাকালো আমেরিকান ছবি 'গো ওয়েস্ট' (নির্দেশনা এডোয়ার্ড বাজিল এবং মার্কস ব্রাদার্স) ও মধু বসু নির্দেশিত ১৯৩৭-এ নির্মিত শাদাকালো ছবি 'আলিবাবা'।
সেখানেই রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ছবিগুলি নিয়ে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উপলক্ষ : কবিপক্ষ। সঠিক দিনক্ষণ এখনও জানা যায় নি।
ম্যাক্সমুলার ভবনে গত পক্ষে শুরু হয়েছে এম এম বি এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার যুগ্ম উদ্যোগের এক চলচ্চিত্র উৎসব। পিটার লিলিয়েনট্যাল নির্মিত তেরোটি ফিচার ফিল্ম-এর এই প্রদর্শনীর শেষ কদিনে দেখা যাবে 'হেড টিচার হফার' (২ মে), 'দি কানট্রি ইস কাম' (৩ মে), 'ডেভিড' (৪ মে), 'দি আপরাইজিং' (৫ মে), 'ডিয়ার মিস্টার ওয়ানডারফুল' (৬ মে), 'দি অটোগ্রাফ' (৭ মে)। রোজ পাঁচটায় এবং সাতটায় দুটি করে শো।
৫ মে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে অসুস্থ অভিনেতা শ্যামল সেনের সাহায্যার্থে 'পথের পাঁচালী' এবং 'পার' ছবির দুটি প্রদর্শনী।

নাটক

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর মঞ্চে বহুরূপী তাঁদের ৩৮ বর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছেন মে মাসের গোড়ায়। ২, ৩ এবং ৪ মে অভিনীত হবে যথাক্রমে 'রাজদর্শন', 'আগুনের পাখি' এবং 'মালিনী'। সংগীত পরিচালনা : অর্ঘ্য সেন, রূপসজ্জা শক্তি সেন, আলো : দিলীপ ঘোষ এবং নির্দেশনা : কুমার রায়।
ম্যাক্সমুলার ভবনে ১৬ মে 'টেগোর অ্যান্ড জার্মান কালচার' শীর্ষক আলোচনা-সন্ধ্যায় সংবর্ত নাট্যগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে একটি অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন। নির্দেশনা সুনীল দাস।
ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাগৃহে ৭ মে দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবে শ্রুতিনাট্য সন্ধ্যা 'শেষের কবিতা'। অংশগ্রহণে : বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু, শ্রীলা মজুমদার প্রমুখ।
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর মঞ্চে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ (সকাল), ১১ (সন্ধ্যা), ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ মে যথাক্রমে চার্বাক, চেতনা, প্রতিকৃতি, নান্দীকার, সায়ক, পি-এল-টি, সংস্তব, পি-এল-টি, পঞ্চম বৈদিক, থিয়েটার কমিউন, ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার, থিয়েটার ফ্রন্ট, নান্দীকার এবং সমকালীন শিল্পীদল-এর নাট্যনিবেদন।
নান্দীকার-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা ইবসেন অনুপ্রাণিত বার্গমানের 'নোরা' অবলম্বনে 'নীরা'। নির্দেশনা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সায়ক প্রযোজনা করবেন 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল'। পি-এল-টি এবং পঞ্চম বৈদিক অভিনয় করবেন যথাক্রমে 'মহাবিদ্রোহ' এবং 'নাথবতী অনাথবৎ'।
রবীন্দ্রসদনে ৫ এবং ৮ মে যথাক্রমে বক্তব্য ও ঋত্বিক সংস্থার অভিনয় সন্ধ্যা।
ম্যাক্সমুলার ভবনে ৬ মে ইউনিটি থিয়েটার-এর প্রযোজনা 'এতটুকু বাসা'। নির্দেশনা শেখর চট্টোপাধ্যায়।

গান

ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাঘরে দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবের প্রথম তিনদিনে থাকছে সংগীতানুষ্ঠান। ৫ মে পালিত হবে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা : সুদেব গুহঠাকুরতা। ৬ এবং ৭ মে রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়ভিত্তিক অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তন থেকে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকছেন তড়িৎ চৌধুরী, ঋতু গুহ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ সেন প্রমুখ।
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আয়োজনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব শুরু হচ্ছে ১ মে প্রভাতফেরির মাধ্যমে। চলবে ৯ মে পর্যন্ত। ৯ মের প্রভাতী অধিবেশন ছাড়াও প্রতিদিনের সান্ধ্য আসরে পরিবেশিত হবে একক এবং সমবেত সংগীত। দিনগুলিকে 'সংস্কারমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
৯ মে (২৫ বৈশাখ) প্রভাতী সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান পত্রিকা রিক্রিয়েশান ক্লাব, রবীন্দ্রসদন এবং মহাজাতি সদন কর্তৃপক্ষ। ঐদিনকার অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি নিবেদন করবেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।
৯, ১০ এবং ১১ মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন এবং মহাজাতি সদন অছি পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত এবং আবৃত্তির অনুষ্ঠান, মহাজাতি সদনে।
১০ এবং ১১ মে মিলন মন্দির (ফেডারেশান হল সোসাইটি) নিবেদন করবেন আলোচনা এবং সংগীতের অনুষ্ঠান, তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে।
৩ মে উত্তর কলকাতার মার্বেল প্যালেসে (মল্লিকবাড়ি) সারারাত রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক : সারথী। অংশগ্রহণে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ
রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসব ৯ মে শুরু হয়ে চলবে একমাসেরও বেশি সময় ধরে। ১১ (সকাল), ১২, ১৫ এবং ১৬ মে রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়ভিত্তিক আসর।
ম্যাক্সমুলার ভবনে ১০ মে ফ্রানজ লিজট স্মরণে পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিকাল সংগীতের অনুষ্ঠান, হ্যানস নাগেল-এর পরিচালনায়।
সেখানেই ১৪ মে নবীন শিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীত। থাকছে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পাঠের একটি অনুষ্ঠানও।
শিশির মঞ্চে মে মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, গান, আলোচনা এবং আবৃত্তির মাধ্যমে।

প্রদর্শনী

ম্যাক্সমুলার ভবনে ৬ মে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বিষয়টি নিয়ে শুরু হবে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সেন্টার ফর পিপলস ফটোগ্রাফির সহযোগিতায়। রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রী শম্ভু সাহার সঞ্চয় থেকে এই ছবিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। চলবে বর্তমান পক্ষ পার করে।
সেখানেই ১৩ মে 'রবীন্দ্রনাথ দি পেইন্টার' শীর্ষক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখবেন অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯ মে থেকে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রজীবনীর ওপর প্রদর্শনী শুরু হবে। চলবে আগামী পক্ষেও।
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর নর্থ গ্যালারিতে ২ মে বলাই পাল ও রীতা পালের চিত্রকলা ও জলরং মাধ্যম প্রদর্শনীর সূচনা। ৮ মে পর্যন্ত।
সেখানেই ২ মে নিউ সাউথ গ্যালারিতে শুরু হবে 'ট্রয়ি' আয়োজিত প্রদর্শনী। চলবে ৮ মে পর্যন্ত।
অ্যাকাডেমির সাউথ এবং নিউ গ্যালারিতে ৩ মে শুরু হবে যথাক্রমে প্রদীপ রক্ষিত ও তরুণ চক্রবর্তী এবং সংগীত শ্যামলার ছাত্রছাত্রীদের চিত্রকলার প্রদর্শনী। ৭ মে পর্যন্ত।
সেখানেই ৮ মে ওয়েস্ট গ্যালারিতে রবীন্দ্রবিষয়ক চিত্রকলা প্রদর্শনীর সূচনা। ১৫ মে পর্যন্ত।
অ্যাকাডেমির নিউ গ্যালারিতে ৮ মে আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার নিয়ে একটি প্রদর্শনী শুরু হবে। চলবে ১৪ মে পর্যন্ত।
সেখানেই ৯ মে নর্থ, নিউ সাউথ এবং সাউথ গ্যালারিতে যথাক্রমে গীতশ্রী রাহা, জয়ন্ত মুখার্জী ও তড়িৎ চৌধুরী এবং প্রদীপ রক্ষিতের চিত্রকলা প্রদর্শনীর সূচনা সন্ধ্যা। তিনটিই ১৫ মে পর্যন্ত।
সেখানেই সাউথ গ্যালারিতে ১০ মে থেকে থাকবে অসিত মণ্ডল-এর চিত্রকলার সম্ভার। চলবে ১৬ মে পর্যন্ত।
অ্যাকাডেমির নিউ গ্যালারিতে ১০ মে সোহিনী বসাক এবং শ্রেয়সী মিত্রর চিত্রকলা এবং ড্রয়িং প্রদর্শনীর সূচনা। চলবে বর্তমান পক্ষ পার করে।
ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান কার্টুন নিয়ে এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গত পক্ষে। ১৮৮৭ থেকে ১৯৮৫-র মধ্যে আঁকা এইসব কার্টুন দেখা যাবে এ পক্ষের ৩ মে পর্যন্ত।

বিবিধ

দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবের শেষ দিনে (৯ মে) ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হবে নৃত্যনাট্য 'ফাল্গুনী'। নাট্য পরিচালনা দেবাশিস রায়চৌধুরী, সংগীত পরিচালনা : রনো গুহঠাকুরতা।
রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবে ১০, ১১, ১৩, ১৪ এবং ১৫ মে পরিবেশিত হবে যথাক্রমে 'তাসের দেশ' (প্রযোজনা রবীন্দ্রভারতী), 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা' (প্রযোজনা : মণিপুরী নর্তনালয়), 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং 'সামান্য ক্ষতি'।
সেখানেই ২ মে মডার্ন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয় উৎসব।
রবীন্দ্রসদনে ৩, ৪ (সকাল), ৪ (সন্ধ্যা), ৬ এবং ৮ মে অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন যথাক্রমে ছন্দনীড় আবৃত্তি সংস্থা, সন্দেশ পত্রিকা, সঞ্চিতা (বীরেন বসুর পরিচালনায় নজরুলগীতির অনুষ্ঠান), প্রগ্রেসিভ কালচারাল সেন্টার (সুসিতবরণের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য) এবং মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দির (নৃত্যনাট্য)।

যে যেখানে

জয়কৃষ্ণ সান্যাল

ধ্রুপদ সংগীত জগতে এক ডাকে যে মানুষটিকে সংগীতরসিক মাত্রই চেনেন তিনি হলেন সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল। পিতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ সান্যাল ধ্রুপদ সংগীতের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজবল্লভ পাড়ার বর্তমান বাড়ির বৈঠকখানাতেই বিশ্বনাথবাবুর উদ্যোগে নামী-অনামী বহু গায়ক-বাদকরা ধ্রুপদ সংগীতের মজলিশে প্রায়ই সমবেত হতেন। এই সাংগীতিক পরিবেশে আবাল্য মানুষ বলে মার্গীয় সংগীতের ওপর জয়কৃষ্ণবাবুর খুব ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড আগ্রহ। জয়কৃষ্ণবাবু পিতার জীবিতাবস্থাতেই 'ধ্রুপদ-প্রচারণী সভা' নামে একটি সভারও আয়োজন করেছিলেন। সেটা ১৯৬০ সালের কথা।

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মাত্র ২১ বছর বয়সেই জয়কৃষ্ণবাবুর রাগসংগীতের হাতেখড়ি। পরে ১২ বছর তিনি রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁর কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে তিনি গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পীদের নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সাধনার গুণে অনেক কঠিন ধাপ পার হয়ে আজ তিনি ধ্রুপদ-ধামারে শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বীই নন, বিশিষ্টও। বেলঘরিয়া 'রাগচক্র', খড়দায় 'সঙ্গীতায়ন', বারাসতে 'ললিতছন্দম' নৈহাটিতে 'ক্রান্তি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'—এমন অসংখ্য সংগঠনের শীর্ষপদে তিনি বৃত। সদা হাস্যময়, নিরলস, আত্মভোলা সুরের সাধক জয়কৃষ্ণবাবু আত্মপ্রচারে বিমুখ তো বটেই, সংগীত পরিবেশনের বিনিময়ে সম্মান দক্ষিণাটুকুর ব্যাপারেও তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আজ ৭৪ বছর বয়সে স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়লেও মনে তাঁর এখনো রয়েছে তারুণ্যের সজীবতা □

রেণু রাই

পইঅঙ বস্তিতেই বড় হয়েছেন রেণু রাই। কালিম্পঙ শহর থেকে অনেকটা দূরে এই বস্তি। ২৩ বছরের রেণু দেবী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। তাঁর বাবাও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১৯৫২ সালে থেকে। বাবা ছিলেন কৃষক। রেণু রাই ছোটবেলা থেকেই মহিলা সমিতি করেছেন। রাজনীতির পাশাপাশি নাচকেও জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছেন রেণু রাই। নাচকে ভালোবেসে লালন করেছেন এবং সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। রঞ্জি স্টেডিয়ামে যুব উৎসবে তিনি নেচে গেছেন। তাঁর মা-ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। রেণু আধুনিক নেপালী সংগীত গাইতে খুব ভালোবাসেন। তাঁর উদ্দেশ্য পার্টির কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাচ ও গানকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যা চিরকাল বিস্ময়ের বস্তু হিশেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। লোলে এবং পইঅঙ বস্তিতে মহিলা সংগঠনের কাজ করেন রেণু রাই। দুটি বস্তি মিলিয়ে মহিলার সংখ্যা ২০০-র মতো। শ্রমসাধ্য পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে যেতে সময় লাগে ২ ঘন্টা। এ সবকিছুই হাসিমুখে করেন রেণু রাই। তাঁর বিশ্বাস এবং আদর্শ শ্রম লাঘব করে, নতুন করে বাঁচার পথ দেখায়।

আমাদের কাছের চেনা জগতের বাইরে, চোখের আড়ালে, যাঁরা জীবনের লড়াই এবং শিল্পকে এইভাবে মিলিয়ে চলেছেন প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতায়, শুধু ব্যক্তিগত নয় সামাজিক জীবনকেও সমৃদ্ধ করছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যে রেণু রাই-ও নিশ্চয়ই একজন। □

অনীশ দেব

১৯৫১ সালে কলকাতায় জন্মেছিলেন অনীশ দেব। ৮৩ সাল থেকে কলকাতার সায়ান্স কলেজে অ্যাপলায়েড ফিজিক্সের লেকচারার। তার আগে ছিলেন ডি সি পি এল-এর ইনস্ট্রুমেন্টেশন সেল-এ। ৮৫-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর অনীশবাবু ঘুরে এলেন জাটিঙায়। পাখিদের দলবেঁধে এসে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে। ১৯০৫ থেকে মোটামুটি রেকর্ড করা আছে পাখিদের এই আত্মহত্যার ব্যাপার। অনীশবাবু গিয়েছিলেন বিশিষ্ট পক্ষীবিদ ডঃ সুধীন সেনগুপ্তর সঙ্গে। সুধীনবাবুর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ব্যাপারটার ফিজিকাল ডাটা সংগ্রহ করা। ফিরে এসে অনীশবাবু জাটিঙার এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকটি কাগজে লেখালেখি করেছেন। রহস্য-রোমাঞ্চধর্মী লেখা দিয়ে লেখা শুরু করলেও প্রায় সব ধরনের লেখাই লিখে থাকেন অনীশ দেব। অনুবাদ করেছেন হাওয়ার্ড ফাস্টের 'পিক স্কিল' সমেত আরও অনেক লেখা। 'সবজান্তা মজারু' নামে ছোটদের একটি কাগজ সম্পাদনা করেছেন ছমাস। তারপর এক বছর 'কিশোর বিস্ময়' নামে একটি পত্রিকা। ছোটদের জন্যে লেখালেখি করেছেন অনেক রকম। এখনও করছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক গল্প-প্রবন্ধের পাশাপাশি জীবনধর্মী সাহিত্য রচনায় অনীশবাবুর সমান ঝোঁক। সম্প্রতি একটি বিশাল কাজ করছেন কমপিউটার আর বায়ুদূষণ নিয়ে লেখালেখি ছাড়াও শখের ফোটোগ্রাফির হবি অনীশবাবুর তাছাড়া গৌরিবাড়ি অঞ্চলে মস্তান প্রতিরোধে যে নাগরিক কমিটি তারও একজন সক্রিয় সদস্য তিনি। অনীশবাবুর এই বহুমুখী জ্ঞান ও উদ্যোগ আমাদের সমাজে যে বিরল তাই শুধু নয়, আমাদের আত্মমুখী জীবনযাপনে অনেকের কাছেই প্রেরণাস্থল □

হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

পোশাকি নাম হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। কিন্তু সে নাম এখন প্রায় লুপ্ত। দমদম অঞ্চলের ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সকলেরই তিনি 'শঙ্করদা'। জন্ম ১৯৩৫ সালে। ওপার বাংলায়, তবু এ বাংলার সঙ্গেই গড়ে উঠেছে আশৈশব সম্প্রীতি।

যাদবপুর থেকে ড্রাফটম্যানশিপে নিজেকে শিক্ষিত করেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে চোখের অসুখে সূক্ষ্ম কাজকর্ম থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হন। অবশ্য ব্যাধি তাঁকে শাসনে বেঁধে রাখতে পারে নি। আদর্শবোধ এবং সৃজনের নেশায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশেষ সক্রিয়। গড়ার নেশাতেই তিনি শিক্ষকতার জীবন বেছে নেন। দমদমের 'কিশোর ভারতী' প্রাথমিক বিভাগে কর্মসূত্রে যুক্ত। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক মিহির সেনগুপ্তের অন্যান্য সঙ্গীদের মতো শঙ্করবাবুও তাঁর একজন সক্রিয় সহযোগী।

শঙ্করবাবুর পরিচয় শুধু শিক্ষক হিশেবেই নয়, পাশাপাশি সংগীত রচনা তাঁর অন্যতম সৃজন কর্মের অন্তর্গত। প্রচার বিমুখ মানুষটি এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রায় তিনশ গান রচনা করেছেন। শ্যামা সংগীত, আগমনীর মতো ধর্মীয় বিষয় যেমন আছে, তেমনি তাঁর গানে আছে প্রকৃতিপ্রেমের আন্তরিক নিবিড় উপস্থিতি। শঙ্করবাবুর গানের ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব সারল্য এবং বিষয়ের আন্তরিকতা বর্তমান সংগীত রচনার জগতে যথার্থ অন্যতর সংযোজন। অথচ নির্লিপ্ত প্রচারবিমুখতার কারণে এইসব রচনা খুব বেশি পরিচিতি লাভ করে নি, সামান্য কিছু সুহৃদজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। নিজের মনের আনন্দে, সৃজনের আন্তরিক প্রেরণায় আত্মমুগ্ধ। অবিবাহিত নিঃসঙ্গ অবসরে এই গানগুলিই তাঁর অন্যতম সময় ভরানোর সঙ্গী। আর আছে অগণিত বন্ধুজনের অকৃত্রিম ভালোবাসার অনুপম উপহার □

বিনী ব্লেণ্ডের ফ্যাশন প্যারেডে অংশ গ্রহণ করুন

বাকিংহাম অ্যাণ্ড কর্ণাটিক মিল্স, মাদ্রাজ

Regd No R.N. 41096/83 PRATIKSHAN,
VOL III No 21, 2-16 May '86 Rs.3
FORTNIGHTLY Postal
Regd No W//CC404

গ্রীষ্মের দিনগুলিতে বোরো ক্যালেনডুলার সাহায্যে সম্পুর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে আপনার ত্বককে ঘামাচি থেকে সুরক্ষিত রাখুন। প্রাকৃতিক উপাদান ক্যালেনডুলা ও হাইড্রাসটিস্ ভেষজের নির্য্যাসে তৈরী এই প্রিক্‌লি হিট পাউডার আপনার শরীরকে দুর্গন্ধমুক্ত করে, আপনাকে তরতাজা রাখে সারাদিন।

বোরো ক্যালেনডুলা ঘামাচি ও ত্বকের দুর্গন্ধি সৃষ্টিকারী জীবাণু নাশে অদ্বিতীয়।

বোরো ক্যালেনডুলা*

প্রিক্‌লি হিট পাউডার

Boro calendula*
PRICKLY HEAT POWDER

সারাদিন আপনাকে দুর্গন্ধমুক্ত
আর তরতাজা রাখে

* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12

anjan chakraborty, Cal-74